প্রথম সংস্করণ এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রকাশক : শ্রীঅখিলচন্দ্র নন্দী, পপুলার লাইব্রেরী ১৯৫/১বি, বিধান সরনী
কলিকাতা-৬। মুদ্রাকর : শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানসী প্রেস।
৭৩, মানিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

এক

গ্রীষ্মের দিন। গ্রাচি গ্রামের মাঝারি গোছের বিষয়-সম্পত্তির মালিক আনা পাভ্‌লোভনা আতুয়েভার পরিবারের স্বয়ং গৃহকর্ত্রী থেকে মায় পাহারাদার কুকুর বারবোস-অবধি সকলেই আজ খুব ভোরে উঠেছে।

কিন্তু আনা পাভ্‌লোভনার একমাত্র বিংশতিবর্ষীয় পুত্র আলেকজান্দার ফিওদরোভিচ এখনো যৌবনের গাঢ় ঘুমে বিভোর। গৃহে ব্যস্ততা। তরুণ মনিবকে যাতে জাগিয়ে না দেয় তাই সবাই চলছে সন্তর্পণে, ফিসফিসিয়ে কইছে কথা। কেউ টু শব্দটি বা জোরে কথা বললে, কুপিতা সিংহীর মতো সেখানে তখনি এসে দেখা দিচ্ছেন আনা পাভ্‌লোভনা, কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটিকে তীব্র ভর্ৎসনা আর কটু-কাটব্য করছেন। এমন কি কখনো-কখনো রাগে ও অতি আবেগে কিল-ঘুষিও প্রয়োগ করছেন।

মালিক পরিবারে যদিও আনা পাভ্‌লোভনা আর আলেকজান্দার কিয়োদরেভিচ—এই দুটি মাত্র প্রাণী—তবু রন্ধনশালায় যেন এক মহাযজ্ঞের তোড়জোড় চলছে। আস্তাবলে গাড়িখানির ঘসা-মাজা ও চাকায় তেল দেওয়া হচ্ছে। সবাই ব্যস্ত, সবাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করছে। শুধু বারবোস-এর কোনো কাজ নেই। কিন্তু এই সর্বব্যাপী হৈ-হট্টগোলে সেও নিজের মতো অংশ নিচ্ছে। যখনি কোন পরিচারক বা সহিস তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, বা কোন দাসী উঠোন পেরিয়ে ছুটছে, সে লেজ নেড়ে পথচারীকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। তার চোখ দুটি যেন বলছে: এত হৈ-চৈ কেন—কেউ আমাকে বলে দাও!

ব্যস্ততার কারণ এই। আনা পাভলোভ্‌না তাঁর ছেলেকে বিদায় দিচ্ছেন—সেণ্ট পিটার্সবুর্গে সরকারী দপ্তরে সে কাজ করতে যাবে। অথবা তাঁর নিজের কথায়—সে যাবে দুনিয়াকে দেখতে, দুনিয়াও তাকে দেখুক। এটি তাঁর দুঃখেরই দিন! তাই তো তিনি এমন বিষণ্ণ আর খিটখিটে মেজাজী।

এই উদ্বেগের মধ্যেও মাঝে মাঝে তিনি হুকুম দেবার জন্ত মুখ খুলছেন, কিন্তু কথার মাঝখানে থেমে পড়ছেন, স্বর রুদ্ধ হয়ে আসছে। চোখের জল মোছার জন্ত হয় মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন, নয়তো দেরী হয়ে গেলে শাসেন্দার পোশাক-আশাক যে তোরঙ্গে গুছিয়ে রাখছেন, তারই ভিতরে পড়ছে চোখের জল। বহুক্ষণ থেকেই বুকে উথলে উঠছে কান্না, বুকে ভার হয়ে চেপে বসেছে, গলা অবধি ঠেলে আসছে, এবার ধারায় নামল বলে। কিন্তু বিদায়ের শেষ মুহূর্তটির জন্ত যেন তা সঞ্চয় করে রাখছেন, এখন শুধু মাঝে মাঝে দু-এক ফোঁটা মাত্র ঝরছে।

আসন্ন বিচ্ছেদে তিনিই একমাত্র কাঁদছেন না, শাসেন্দার খাস খানসামা ইভেসিও দুঃখে মুহ্যমান। পিটার্স'বুর্গে মনিবের সঙ্গে সে চলেছে। আনা পাভ্‌লোভনার মন্ত্রীসভার প্রধানা আগ্রাফেনার ঘরখানির চুল্লীর আড়াল বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণ, আরামদায়ক। সেই উষ্ণ গৃহকোণ ছেড়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে। ইভেসির পক্ষে আরো গুরুত্বপূর্ণ কথা হল—মনিবের গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধানও সেই করে।

চুল্লীর পেছনে দুখানি মাত্র চেয়ার আর একখানি টেবিল পাতার ঠাঁই। সেখানে বসে চা, কাফি বা সামান্ত কিছু খাওয়া যেতে পারে। ইভেসি এখানে একখানি চেয়ারে আর আগ্রাফেনার হৃদয়ে পাকাপোক্ত হয়ে বসেছে। দ্বিতীয় চেয়ারখানি শুধু আগ্রাফেনার নিজেরই জন্ত।

আগ্রাফেনা-ইভেসি সংবাদ বাড়িতে অতি মামুলি কাহিনী। এসব ব্যাপারে যা হয়, বা হয়ে থাকে তাই-ই হয়েছে। ওদের সম্পর্কে কুৎসা রটেছে, আলোচনা চলেছে, তারপরে এসব ব্যাপারে যা হয়—থেমে গেছে। ওদের জোড়ে দেখা মালিকানীর চোখসওয়া হয়ে গেছে। ওরা দশ বছর ধরে উপভোগ করছে সুখ। সারা জীবনে দশটি বছরের সুখ ক'জন পায়? কিন্তু এখন দুঃখের প্রহর এল! বিদায়, উষ্ণ গৃহকোণ, বিদায় আগ্রাফেনা ইভানোভনা—বিদায়! বিদায় দুরাকি—(এক ধরনের তাস খেলা), কাফি, ভোদকা, উত্তেজক সুগন্ধী পানীয়—সবকিছুই, বিদায়!

ইভেসি তার অভ্যস্ত কোণটিতে বসে সজোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লে। আগ্রাফেনার মুখে সেই চিরভ্রূকুটি—সে গৃহকাজে ব্যস্ত। নিজের ধরনে সে দুঃখ প্রকাশ করছে। আজ সে হুড়হুড় করে চা ঢালছে। পয়লা পেয়ালা চা বেশ

কড়া করেই সে রোজ মনিবকে দেয় কিন্তু আজ সেই চা ঢেলে ফেলে দিলে। যেন বলতে চায়—কেউ এ চা পাবে না। কর্ত্রীর ভৎ'সনায় সে নীরব—দৃঢ়তায় সয়ে যাচ্ছে। কাফি অনেকক্ষণ ধরে ফুটল, সর 'ধরে' গেল, পেয়ালা-গুলো আঙুল গলিয়ে খসে পড়ছে। ট্রেখানা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখছে না, দুম্ করে ফেলে দিচ্ছে। আলমারীগুলো যেন খুলছে না, পাল্লাগুলো মুচড়ে ভাঙছে। কিন্তু চোখের জল ফেলছে না, শুধু সকলের আর সবকিছুর উপরে রাগের ঝাল ঝাড়ছে। এ তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় বটে! কখনো সে তুষ্ট নয়, কিছুই তার পছন্দ হয় না, সবসময়েই বকাবকি আর নালিশ করে। কিন্তু জীবনের এই সংকট মুহূর্তে তার চরিত্র বেশ ভাল করেই ফুটে উঠল। মনে হল ইভেসির মতো তাকে আর কেউ বুঝি বিরক্ত করেনি।

ওগো আগ্রাফেনা ইভানোভনা! সে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, কোমল সে স্বর। তার দীর্ঘ, জোয়ান দেহের সঙ্গে সে স্বর খাপ খায় না।

এই কুঁড়ে, আর কোথাও গিয়ে বসতে পার না? সে জবাব দিলে। যেন সে আর কখনো সেখানে বসে নি। আমাকে যেতে দাও—আমি তোয়ালে নেব!

ওগো আগ্রাফেনা ইভানোভনা! অলস তার স্বর, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সে উঠে পড়ল, আগ্রাফেনা তোয়ালেখানা নিতেই আবার বসে পড়ল।

ঘ্যানঘ্যানানি বই তো কিছু জানে না! জোঁকের মতো আমার গায়ে লেপটে আছে দেখ না! আপদ আর কি! হা ঈশ্বর!

জঞ্জাল রাখার গামলার ভিতরে সশব্দে একখানা চামচে ফেলে দিলে।

এই আগ্রাফেনা! পাশের ঘর থেকে হঠাৎ ভেসে এল ডাক। তুমি কি ক্ষেপে গেছ? জানলা—শাসেঙ্কা এখনো ঘুমে? করছ কি—তোমার পেয়ারের মানুষের সঙ্গে বিদায় নেবার অছিলায় বুঝি লড়াই করছ?

আমি না উঠলেই তোমার ভাল—মড়ার মত বসে থাক! আগ্রাফেনা ফোঁস ফোঁস করে উঠল তীব্রস্বরে, সে দুহাত দিয়ে একটা পেয়ালা মুছছে—যেন টুকরো-টুকরো করে ভেঙে ফেলতে চায় আর কি!

বিদায়! বিদায়! ইভেসি এক জোর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আগ্রাফেনা ইভানোভনা—আজই তো শেষ দিন!

ঈশ্বর বাঁচালেন! যত জঞ্জাল সাফাই হল। এখন তবু ঠাঁই মিলবে, পথ ছাড়, আমি নড়তে-চড়তে পারছিনে। ঢ্যাঙা পা দুখানা তো ছড়িয়ে বসে আছ!

ওর কাঁধ ছুঁতে চেষ্টা করলে ইভেসি—ও কি দেবে না! আবার দীর্ঘশ্বাস, কিন্তু নড়বার চেষ্টাও করছে না। ঠিকই করেছে, আগ্রাফেনা ওসব চায় না। ইভেসি তা জানে, আর জানে বলেই বিব্রত হয় নি।

আমার জায়গায় কে বসবে? আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড়বিড় করে সে বললে।

এক পরী, সে খেঁকিয়ে ওঠল।

ঈশ্বর তাই করুন! প্রশকা না হলেই হ'ল! তোমার সঙ্গে দুরাকি খেলবে কে?

বেশ, যদি প্রশকাই হয় তো কি হবে? সে তীব্রস্বরে শুধালে?

ইভেসি উঠে দাঁড়াল।

প্রশকার সঙ্গে খেলো না, শুধু ঐটি করো না! উদ্বিগ্ন তার স্বর, প্রায় যেন শাসানির মত!

শুধাই গা, আমাকে কে বাধা দেবে? তোমার মত মানুষ?

ওগো আগ্রাফেনা ইভানোভনা! সে অনুনয় করছে, হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে তার কোমরখানা, হয় তো এক সময়ে কোমরই তাকে বলা হত। যদি অবশ্য তার দেহে কোমর বলে কোন-কিছুর আভাস মাত্র কখনো থেকে থাকে।

সে কনুই দিয়ে বুকে গুঁতো মেরে আলিঙ্গনের জবাব দিলে।

ওগো আগ্রাফেনা ইভানোভনা, সে আবার বললে, আমি যেমন ভালবাসি ঐ প্রশকাটা কি তোমাকে ততখানি ভালবাসতে পারবে? জান তো কি পাজি ও! যে মেয়ে দেখে, তারই পেছনে ছোটে। আর আমি—তুমি তো আমার চোখের মণি। যদি ঠাকরুণের ইচ্ছে না হোত—ও-হো-হো!

সে গোঙিয়ে উঠল, হতাশার অঙ্গভঙ্গি করলে। আগ্রাফেনা আর সইতে পারলে না—শেষে দুঃখে তারও চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

ওরে হতভাগা মিনসে, আমাকে কি তুই একটু একা থাকতেও দিবি নে? কাঁদতে-কাঁদতে সে বললে। কি শুরু করে দিয়েছ! যেন প্রশকার সঙ্গে

নটঘটি করছি আর কি। দেখতে পাও না, ওর একটুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। ও খালি শুধু আমার গায়ে হাত চালাচালির কথাই ভাবে।

তাহলে ও তোমার পেছু লেগেছে। পাজি কোথাকার! আর তুমি আমাকে একটা কথাও বলনি! আমি তো……

আমাকে ছুঁয়ে দেখুক তো! আমিই যেন সারা বাড়িতে শুধু একটা মেয়েমানুষ! প্রশকার সঙ্গে পিরীত করব! ভাবছি এর পরে আরো কত শুনব! ওর পাশে বসতেও আমার গা গুলোয়—নোংরা শুয়োর! একটু নজর না রাখলেই ও কাউকে মারধর করে বসে, চোখের সামনে ঠাকরুণের খাবার খেয়ে নেয়—কেউ যেন তা দেখে না গো!

আগ্রাফেনা ইভানোভনা—যদি দরকার বোঝ—ঐ বদমাসটা ভারি চালাক—বরং গ্রিসকাকে আমার জায়গায় বসিয়ো। গোবেচারী. ভারি কাজের মানুষ—তোমার মোসায়েবদের মত নয়।

আবার! আগ্রাফেনা চেঁচিয়ে উঠল, তোমার কি হল—যত মানুষকে আমার গায়ে এনে ঠেলে ফেলছ। আমি যেন একটা—যাও বেরোও বলছি! তোমাদের মত মানুষ ঢের ঢের মিলবে। যে আসবে তার গায়েই ঢলে পড়ব এমন মেয়েমানুষ আমি নই। তুমিই একমাত্র মানুষ যার সঙ্গে আমার মাখামাখি হয়েছে—শয়তান আমাকে সেই পাপে বুঝি মুঠোয় পুরলো! আমার আপশোস হচ্ছে আর তুমি আমাকে খালি জ্বালাচ্ছ!

তুমি ভাল মানুষ। ঈশ্বর তোমাকে বকশিস দেবেন। আমার কাঁধ থেকে বোঝা নেমে গেল। ইভেসি চেঁচিয়ে উঠল।

এইবার লোকটা খুশি হল। জোরে খেঁকিয়ে উঠল আগ্রাফেনা। যদি এতেই খুশি হও তো আপত্তি নেই, তার ঠোঁট রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই চুপচাপ।

আগ্রাফেনা ইভানোভনা, ইভেসি এবার ভয়ে ভয়ে বললে।

আবার কি?

আমি তো ভুলেই গেছি—সকাল থেকে কিছু খাইনি।

এই কথা?

এর কারণ তো দুঃখ।

তাকের সবচেয়ে নিচের তাকে চুড়া-করা চিনির তালের আড়ালে সে হাত বাড়িয়ে দিলে। সেখানে আছে এক গেলাস ভোদকা, দুখানা রুটির বড় বড় টুকরো আর শুয়োরের মাংস। ওর জন্ত অনেকক্ষণ থেকেই সেগুলি তার সেবা-ব্যগ্র হাতে তৈরি করা আছে। এবার সে ছুঁড়ে দিলে সেই খাগু আর পানীয় তার সুমুখে। কুকুরকেও বুঝি এমন হেলা-ফেলায় কেউ খাবার দেয়না। একটা টুকরা মেঝেয় পড়ে গেল।

এই নাও—গেলো! শয়তানে নিক তোমাকে! এবার ঠাণ্ডা হও তো—বাড়িশুদ্ধু তোমার চিবুনির শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

বিরক্তির ভান করে আগ্রাফেনা পেছন ফিরল। সে আস্তে আস্তে খাচ্ছে, ভ্রুর আড়াল থেকে দেখছে আগ্রাফেনাকে। মুক্ত হাতখানা দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে।

এরই মধ্যে তিনঘোড়ার গাড়ি ফটকে এসে পৌছল। খুদে ঘণ্টাটি ঝুলছে তার সঙ্গে—এপাশে ওপাশে হেলে দুলে কাঁপা শব্দ তুলছে—যেন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা মাতাল মানুষকে ডিগরীতে রাখা হয়েছে। গাড়োয়ান ঘোড়াগুলিকে লাগোয়া চালার নিচে বেঁধে রাখল। এবার সে টুপি খুলে সেখান থেকে টেনে বার করলে তেলচিটচিটে একখানা তোয়ালে। তোয়ালে দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগল। জানালা থেকে তাকে দেখে আনা পাভ্‌লোভনার মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। হাঁটু কাঁপছে, হাত অসাড় হয়ে ঝুলে আছে দুপাশে—যদিও তিনিই গাড়ির খোঁজ করছিলেন। আবেগ দমন করে তিনি আগ্রাফেনাকে ডাকলেন, বললেন, পা টিপে টিপে, খুব আস্তে আস্তে যাবে, গিয়ে দেখ, শাসেঙ্কা এখনো ঘুমোচ্ছে কিনা। আহা বাছা, শেষ দিনটা ঘুমিয়েই কাটাবে, আমি ভাল করে দেখতেও পাব না। না, না, তুমি পারবেনা। তুমি গোরুর মত ধীরে ধীরে যাবে। তার চেয়ে নিজেই যাব।

তিনি চলে গেলেন।

নিজের কোঠায় ফিরতে-ফিরতে আগ্রাফেনা বিড় বিড়িয়ে বললে, যাওনা মা, তুমি তো গোরু নও। আমি গোরু—তাই না কি? ওগো, আমার মত গোরু তোমার বেশি নেই। আছে নাকি?

আনা পাভ্‌লোভনার সঙ্গে স্বয়ং আলেকজান্ডারের দেখা হয়ে গেল।

জোয়ান, স্বাস্থ্যবান হৃদয়ে—কটা চুল—একেবারে যৌবনোজ্জ্বল পুরুষ। যাকে সানন্দে সম্ভাষণ জানালে ছেলে। কিন্তু তোরঙ্গ আর পোটলা পুঁটলি দেখে একটু বিরক্ত হয়ে নিঃশব্দে জানালা দিয়ে তাকাল, আঙুল দিয়ে শার্সির উপর কি যেন আঁকছে। এক মুহূর্ত পরে আবার মার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলে। এমন কি স্বচ্ছন্দেই বলে গেল যাত্রার তোড়জোড়ের কথা, বেশ উপভোগই বুঝি করছে।

আনা পাভ্‌লোভনা বললেন, বাছা, এত বেলা অবধি তোমার ঘুমানো ঠিক হয়নি। মুখখানা তো ফুলে গেছে। এস, গোলাপ জলে চোখ আর গাল ধুয়ে দিই।

না, মা, ঐটি করবে না।

ছোট হাজিরিতে কি খাবে—চা না কাফি দিয়ে শুরু করবে? আমি টক সর দিয়ে কিমা ভাজতে বলেছি। একটু খাবে না কি?

মা, তোমার যা-খুশি।

আনা পাভ্‌লোভনা জামা-কাপড় তুলতে লাগলেন। একটিবার থেমে তাকালেন ছেলের দিকে। কামনায় ভরা তাঁর দৃষ্টি।

সাশা! একটু থেমে বললেন।

কি মা?

একটু দ্বিধা করলেন, যেন এক অনিশ্চিত ভয়ে অধীর।

বাছা, কোথায় যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ?—অবশেষে মৃদুস্বরে ব্যক্ত করলেন তাঁর কথা।

কোথায় যাচ্ছি মা? কেন—যাচ্ছি পিটার্স্‌বুর্গে—যাচ্ছি…

সাশা শোন, বিচলিত স্বরে বলে উঠলেন। তার কাঁধে হাত রেখেছেন শেষ চেষ্টা করবেন এই তাঁর স্পষ্ট ইচ্ছা। এখনো সময় আছে—ভেবে দেখ। যেয়ো না।

যাব না? অসম্ভব, তাছাড়া—পোশাক-আশাক তো সব বাঁধা ছাঁদা সারা—দিশেহারা হয়ে সে বললে।

তোমার পোশাক—আশাক! এই তো, এই তো—দেখ! এগুলো এখনো তো তোলা হয় নি।

তিনি তিনবার হাতভরে তুললেন, ট্রাঙ্ক উজাড় করে দিলেন।

কি বলছ? আমি একেবারে তৈরি হয়ে আছি, আর তুমি এখন বলছ কি না থেকে যেতে। লোকে কি ভাববে? অপ্রসন্ন হয়ে উঠল সে।

আমার জন্যে নয়—তোমার জন্যেই বলছি। কেন যাচ্ছ! সুখ খুঁজতে? এখানে কি তুমি সুখী নও? তোমার সামান্য খেয়াল-খুশি পূরণ করবার জন্য তোমার মা কি সারাদিন ভাবেন না? অবশ্য, তোমার এখন যা বয়েস তখন মার খুশি করার চেষ্টাই তোমার খুশি হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আমি তা আশাও করি না। কিন্তু তোমার আশেপাশে চেয়ে দেখ—সবাই তোমাকে খুশি করতে চায়। এমনকি মারিয়া কার্পোভনার মেয়ে সনিউস্কাও চায়। ওঃ লজ্জায় লাল হয়ে উঠছ? কি যে তোমাকে ও ভালবাসে! ঈশ্বর তাকে ভাল রাখুন—আহা বাছারে! ওরা বলে—তিনরাত নাকি তার ঘুম নেই।

মা, কি বলছ! সে তো শুধু—

আমি যেন দেখতে পাইনা! আহা—আমি কি ভুলতে পারি! তোমার জন্যে খানকয়েক রুমাল সেলাই করে দেবে বলেছিল। বললে, আমি নিজেই সবগুলো করে দেব। অন্য কাউকে করতে দেবনা। চিহ্ন-অবধি দিয়ে দেব। আর কি চাও? যেয়োনা।

সে চুপ করে শুনছে, মাথা নীচু, ড্রেসিংগাউনের ঝুল্‌মিগুলো নিয়ে খেলা করছে।

তিনি বলে চললেন, পিটার্সবুর্গে কি পাবে? এখানে যেমন সবাই যত্ন করছে—তেমনি যত্ন পাবে? আহা, বাছারে। ঈশ্বর জানেন, কি তোকে সইতে হবে—ঠাণ্ডা, খিদে আর অভাব—সবই সইতে হবে। সব জায়গায়ই বহু মন্দ মানুষ আছে, কিন্তু ভাল মানুষ সহজে মেলে না। আর শহর আর গ্রামে তফাৎটা কি? পিটার্সবুর্গের কথা যখন জানতে না, তখন ভাবতে তুমিই পৃথিবীর প্রথম মানুষ এখানে বাস করছ। তুইই সেরা মানুষ। বাছা, সব জায়গাই সমান! তুই চালাক-চতুর, দেখতে সুশ্রী, ভদ্র। আমার মত বুড়ো মানুষের তোর দিকে তাকিয়ে থেকেই একমাত্র সুখ। বিয়েও তুই করতে পারিস—ঈশ্বর তোকে ছেলেপুলে দেবেন—আমি তাদের পালন করব। তোর কোন দুঃখ, কোন ভাবনা থাকবেনা—সুখে শান্তিতে থাকতে পারবি—কাউকে হিংসে করতে হবে না। হয়তো, ওখানে এমনটি হবে না, হয়তো তখন আমার কথা মনে হবে। শাসেঙ্কা, থাক, থেকে যা!

সে গলা সাফ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, কিন্তু কিছু বললে না।

শেষ, তিনি কুল-বারান্দার দরজা খুলে দিয়ে বললেন, এমন সুন্দর জায়গাটি ছেড়ে যেতে তোর ইচ্ছে হয়?

সুগন্ধ শীতল সুবাস ভেসে এল খোলা দরজা দিয়ে ঘরে। বুড়ো নেবু গাছে ভরা বাগান, এখানে ওখানে বুনো গোলাপের ঘনঝাড়, বুনো চেরী গাছ আর লাইলাকের ঝাড় বাড়ি থেকে অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে আছে। গাছপালার মাঝে মাঝে উজ্জ্বল রঙের ফুলের কেয়ারীগুলি। পথের সার চারিদিকে, তারপরে আছে হ্রদ—মৃদু উচ্ছলতায় ভেঙে পড়ছে তীরে। অর্ধেক তার আরশীর মতই মসৃন, প্রভাতসূর্যের সোনালী আলোর ছায়া পড়েছে, বাকি অর্ধেকের বুকে সাড়া জেগেছে। সেখানকার রং উপরের আকাশের মতই ঘন নীল। আরো দূরে বহুবর্ণী শস্য ক্ষেত যেন এক অর্ধবৃত্ত প্রেক্ষাগৃহের মত দাঁড়িয়ে আছে, হেলছে দুলছে—পটভূমির ঘন অরণ্যে মিশে গেছে।

আনা পাভ্‌লোভনা সূর্যের আলো থেকে চোখ আড়াল করলেন এক হাত দিয়ে, অন্য হাতখানা দিয়ে এইগুলি দেখাতে লাগলেন। বললেন, ছাখ—ঈশ্বর কি সুন্দরভাবেই না আমাদের খেতগুলি সাজিয়ে দিয়েছে। এই খেতগুলি থেকে শুধু রাই-ই পাব বারশ পুড। আবার ওপাশে আছে গম আর ঘোড়ার দানা। গত বছরের মত ঘোড়ার দানা এবার ভাল হয়নি, হয়তো খুব কমই ফসল হবে। কিন্তু বন দেখ—কি তেজী হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের কত বুদ্ধি দেখ! আমরা ঐ বন থেকে খুব কম করেও এক হাজার রুবল পাব। আর আছে শীকার। বাছা, সবই তো তোর, আমি তো শুধু দেখাশুনা করি, ঐ হ্রদের দিকে তাকিয়ে দেখ—কি রকম ঝলমল করছে। সত্যিই স্বর্গীয়। আর ওখানে আছে কত মাছ! শুধু স্টারজিয়ন ছাড়া আর কিছু আমাদের কিনতে হয় না—হ্রদ তো রাফ্ মাছে কিলবিল করছে, সার্চ আর ক্রুসিয়াণও আমাদের আর আমাদের চাকর-বাকরদের পক্ষে যথেষ্ট। ঐ যে ওখানে চরে বেড়াচ্ছে তোর গোরু আর ঘোড়াগুলি—ওদের ছাখ্! তুই তো সব কিছুর কর্তা এখানে—আর সেখানে—কে জানে সবাই হয়তো তোর উপর কর্তৃত্ব করবে। আর তুই চাস এই সুখ ছেড়ে পালাতে—কোথায় যাবি, নিজেকেই তো তুই ঠিক চিনিস

নে! হয়তো ঈশ্বর না করুন—হয়তো পাঁকে গিয়ে পড়বি, তার চেয়ে এখানে থাক।

সে কিছু বললে না।

তুই শুনছিস না, তিনি বললেন। কিসের দিকে তাকিয়ে আছিস?

নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে সে দূরে দেখিয়ে দিলে। আনা পাভ্‌লোভনা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলেন, মুখের চেহারা বদলে গেল। ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে পথ, বনের ভিতর মিলিয়ে গেছে, আবার দেখা যাচ্ছে বনের ও পাশে—ঐ পথ আকাঙ্ক্ষিত দেশে যাবার পথ, পিটার্সবুর্গের পথ। কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন আনা পাভ্‌লোভনা, নিজের আবেগ দমন করতে চাইছেন।

তাহলে এই চাস্, শোকে অধীর হয়ে অবশেষে বললেন, বেশ তো। বাছা, যখন এ জায়গা ছেড়ে যাওয়াই তোর সাধ, আমি তো বাধা দেবো না। তুই কখনো বলতে পারবিনে, মা তোর যৌবন, তোর সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে।

হায় অমুগী মা! এই তো তোমার এত ভালবাসার পুরস্কার! এই কি আশা করেছিলে? হায়, মায়েরা তো পুরস্কারের আশা রাখেন না। মা কিছু না ভেবেই ভালবাসেন, নিঃস্বার্থ তাঁর ভালবাসা, তুমি যদি বড় হও, বিখ্যাত হও, যদি সুশ্রী আর গর্বোন্নত হও, সকলের মুখে মুখে যদি তোমার নাম প্রচারিত হয়, তোমার কাজের জন্য যদি পৃথিবীখ্যাত হও—বৃদ্ধা তো আনন্দে শিউরে উঠবেন, কাঁদবেন, হাসবেন, ব্যগ্র হয়ে করবেন দীর্ঘ প্রার্থনা। আর পুত্র তো মার সঙ্গে মিলে খ্যাতি উপভোগ করার কথা একবারও ভাববে না। যদি তুমি উদ্দীপনাহীন, বুদ্ধিবৃত্তিহীন হও, যদি তোমার মন আর দেহ দুই-ই হীন হয়, প্রকৃতি যদি তোমার উপরে কুশ্রীতা দেগে দেন, তুমি যদি শরীর আর মনের দিক দিয়ে অসুস্থ হও, যদি লোকের কাছে তাড়া খেয়ে তুমি তাদের মধ্যে ঠাঁই করে না নিতে পার, মার হৃদয়ে তো ঠাঁই তুমি পাবেই, বেশি করেই পাবে। ভাগ্যহত, জারজ সন্তানকে মা তো আরো বেশি আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরেন, তার জন্যে করেন আরো দীর্ঘ, আরো উদগ্র প্রার্থনা।

মার সঙ্গে সে বিচ্ছেদ চাইছে, এর জন্যে কি আলেকজান্দার উদাসীন বলে বিবেচিত হবে? তার বয়েস বিশ বছর। মাতৃক্রোড় থেকেই জীবন তার উপরে সুপ্রসন্ন।

একমাত্র সন্তানকে মায়েরা যেমন সব সময়েই নষ্ট করে থাকেন তেমনি আদর দিয়ে তার মাও তাকে মাটি করেছেন। যখন সে দোলনায় দোদুল শিশু, তখন থেকেই তার দাই তাকে গান গেয়ে শুনিয়েছে, সে হবে ধনী, দুঃখ কাকে বলে জানবে না। তার মাষ্টার মশাইরা ঘোষণা করেছেন, পড়াশুনোয় বহুদূর সে যাবে। পড়াশুনো করে যখন বাড়ি ফিরে এসেছে, প্রতিবেশীর মেয়েটি তার দিকে চেয়ে হেসেছে। এমন কি বুড়ো হুলো বেড়াল ভাসকাও তাকে বাড়ির আর সকলের চেয়ে বেশি পছন্দ করে।

দুঃখ, অশ্রু আর সর্বনাশের কথা সে শুধু শোনা কথায় জানে—যেমন যে রোগ তার কখনো হয়নি তার কথা মানুষ জানে, আর এও জানে এই রোগ কখনো কখনো তার চেয়ে কম ভাগ্যবানদের ভিতরেই দেখা দেয়। তাই ভবিষ্যৎ তার কাছে রামধনু রঙে রঞ্জিত। কি যেন তাকে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, যদিও সেটি কি তা সে সঠিক জানে না। সুখ-মিশ্রিত স্বপ্নের তাৎপর্য খুঁজে পাবার আগেই তারা মিলিয়ে যায়। কানে বাজে মিশ্রিত শব্দ—মহিমার খবর, প্রেমের খবর, আর সব মিলে তাকে আনন্দ-চঞ্চল করে তোলে।

তার গৃহ শীঘ্রই তার কাছে বড় সংকীর্ণ হয়ে দেখা দিল। প্রবৃত্তি. মাতৃস্নেহ, দাই-মা আর সমস্ত বাড়ির শ্রদ্ধা, তার কোমল শয্যা, সুখাদ্য আর ভাস্কার মিউমিউ—এই সব আশীর্বাদ যেগুলিকে জীবনে চলার পথে বহু তারিফ করা যায়—সেগুলি সে এক অজ্ঞাত জীবনের জন্য সানন্দে বিসর্জন দিলে। সে অজ্ঞাত তো এক দুর্নিবার রহস্যময় মোহে ভরা। এমন কি সোফিয়ার ভালবাসাও তাকে আটকে রাখতে পারলে না—অথচ সে তো প্রথম প্রেম, কত গোলাপের সুষমাময়। সে তা গ্রাহ্য করবে কেন? তার স্বপ্ন এক মহা আবেগের, যার সীমা নেই—যা মহা নিনাদে বেজে উঠতে পারে। ইতিমধ্যে সে সোফিয়াকে ভালবেসেছিল—সেও মামুলি ভালবাসা—সে অপেক্ষায় ছিল তার জীবনের পথে আসবে এক মহা আবেগ। স্বপ্নও সে দেখত—সে দেশের সেবা করবে। সে অধ্যয়নে পরিশ্রমী, বহু পড়েছে। উপাধি-সম্মান পত্র তার ডজন-খানেক বিষয়ে জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়, আর দেয় আধ-ডজন ভাষা জ্ঞানের পরিচয়, পুরানো আর আধুনিক দুই ভাষারই। তার সবচেয়ে প্রিয়

সাধ, সে লেখক হবে। তার কবিতাগুলি বন্ধু-বান্ধবদের বিস্মিত করেছে। সম্মুখে তার অসংখ্য পথ। একটার চেয়ে আর একটা বেশি প্রলুব্ধ করে। সে জানে না, কোন পথে পা দেবে। শুধু সোজা সড়কটাই তার চোখের আড়ালে লুকিয়ে আছে—যদি সে দেখতে পেত, তাহলে বোধহয় চলে যেত না।

কিন্তু বাড়িতে থাকবে কি করে? মার তো তাই ছিল সাধ, আর তাই তো স্বাভাবিক; মার বুকে পুত্রের প্রতি ভালবাসাই একমাত্র অনুভূতি, আর এই শেষ অবলম্বনটিকেই তিনি ব্যগ্র হয়ে আঁকড়ে ধরে আছেন। তা না হলে, তিনি আর কি করতেন? তিনি তো মৃতের সামিল হয়ে থাকতেন। বহু যুগ থেকেই একথা বার বার বলা হয়েছে যে, নারীর হৃদয় ভালবাসা ছাড়া বাঁচতে পারে না।

গৃহের জীবন আলেকজান্দারকে মাটি করে দিয়েছে, কিন্তু তার মনকে দূষিত করতে পারেনি। প্রকৃতি তাকে এমন দান করেছেন, যাতে মার ভালবাসা এবং পরিবেশের শ্রদ্ধা শুধু তার চরিত্রের ভাল দিকটাকেই প্রভাবিত করেছে, তার ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর উপ্ত হয়েছে অতি সত্যনিষ্ঠা। হয়তো গর্বের প্রথম স্পন্দন তারই দান; কিন্তু গর্ব তো একখানা ছাঁচ মাত্র, সেখানে কোন জিনিস ঢালব সেইটের উপরই সব কিছু নির্ভর করছে।

তার মা তাঁর শত স্নেহ সত্ত্বেও তার ভিতরে জীবনের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী যে এনে দিতে পারেননি, সেইটেই তার পক্ষে অনেকখানি দুঃখের কারণ হয়ে উঠেছে। যে-সংগ্রাম তার এবং সবার জন্যে ওত পেতে আছে, তার জন্যে প্রস্তুত করতে পারেননি তাকে। কিন্তু তার জন্যে চাই দক্ষতা, চাই সূক্ষ্ম মানসিকবৃত্তি আর ভূয়োদর্শনের বিরাট ভাণ্ডার, গ্রাম্য জীবনের অবরুদ্ধ দিগন্তে তো তা সীমাবদ্ধ হতে পারে না। তা করতে হলে মায়ের তাকে অনেক কম ভালবাসা উচিত ছিল, দিনে প্রতিটি মুহূর্ত তার কথা ভাবাও ঠিক হয়নি, যে কোন উদ্বেগ বা অস্বস্তি থেকে আড়াল করে রাখাও বিধেয় হয়নি—যখন সে শিশু, তখন তার দুঃখ নিজে সওয়া বা তার কান্নায় নিজে কাঁদাটাও ঠিক হয়নি, তাকে তিনি এমনি করে আসন্ন ঝড় থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর উচিত ছিল তাকে নিজেকে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে দেওয়া—নিজের ভাগ্যের কথাও ভাবতে দেওয়া—এক কথায় তাকে বুঝতে

দেওয়া উচিত ছিল যে সে পুরুষ। কিন্তু এই চাহিদাগুলো পূরণ করা তো দূরের কথা। আনা পাভ্‌লোভনা কি করেএসব বুঝবেন? পাঠক তো দেখেছেন তিনি কি ধরণের মানুষ। পাঠক কি আর একবার দেখতে চান?

তিনি এরই মধ্যে ছেলের স্বার্থপরতার কথা ভুলে গেলেন। আলেক-জান্দার দেখলে তিনি তার পোশাক-আশাক আবার গোছাচ্ছেন, রওনা হবার তাড়াহুড়ো আর উদ্বেগে দুঃখ বুঝি তিনি একেবারে ভুলে গেছেন।

শাসেঙ্কা, লিখে রাখত কোথায় কি রাখছি, তিনি বললেন। বাক্সের একেবারে তলায় রইল চাদরগুলি—এক ডজন রইল। দেখ্ তো, লিস্টিটা ঠিক আছে কি না।

ঠিক আছে মা!

সবগুলোতেই তোর নামের আদি অক্ষর লেখা দেখ্! 'এ-এ' আর সবগুলো করেছে লক্ষী মেয়ে সোনিয়া, ও না হলে আমাদের এই মূর্খেরা এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই করতে পারত না। তারপর? ও হাঁ—বালিশের ওয়াড়। এক-দুই-তিন-চার—সবশুদ্ধ এক ডজন—ঠিক আছে। এইযে শার্টগুলো—তিন ডজন আছে। দেখ না! একেবারে খাঁটি লিনেন—আমি নিজে ভ্যাসিলি ভ্যাসিলিয়েভিচ-এর কারখানায় গিয়েছিলাম, তিনি বেছে-বেছে সবচেয়ে সেরা আর লম্বা তিন প্রস্থ দিয়েছেন। যখন ধুয়ে আসবে তখন লিস্ট দেখে মিলিয়ে নিস—সবগুলোই নতুন। ওখানে এমন শার্ট আর পাবে না। ওরা হয়তো ওগুলো একেবারে বদলেই দেবে। কতগুলো ধোপা যা বেহায়া আর অপদার্থ হয়। বাইশ জোড়া আছে মোজা। আমি কি বলি শোন, একটা মোজার ভিতরে ব্যাগটা পুরে রেখে দাও। পিটার্সবুর্গে না পৌছনো পর্যন্ত তোমার টাকাকড়ির আর দরকার হবে না। আর ঈশ্বর না করুন, কেউ যদি তোমার জিনিসপত্র তল্লাস করে সে টাকার থলে খুঁজেও পাবে না। তোমার কাকার কাছে লেখা চিঠিটাও ওখানে রেখে দেব। তোমাকে দেখে কি সে খুশী হবে না? সতেরোটি বছর এক ছত্র কেউ কাউকে লেখেনি—ব্যাপারটা তো হাসি-তামাসা নয়। এই যে স্কার্ফ আর ওখানে আছে রুমালগুলো। সোনিওস্কার এখনো আধ ডজনে চিহ্ন দিতে বাকি। বাছা, রুমালগুলো হারিও না—চমৎকার রুমাল। বাত্তিস্ত আর তুলোর তৈরি।

মিখায়েভ-এর দোকানে দুই রুবল পঁচিশ সেন্ট করে এক গজ কিনেছি এই তো সবগুলো দিনেনের কাপড় জামা। এখন স্যুটগুলো হিসেব করা যাক। ইভেসি কোথায়? ও আসছে না কেন? ইভেসি!

ইভেসি ধীরে ধীরে উপরের ঘরে এল।

আমাকে ডাকছেন? অতি ধীরে শুধালে।

ডাকছি? আনা পাভলোভনা রেগে উঠলেন। কেন গোছ-গাছের সময় আসনি, এসে দেখনি? যদি পথে কিছু দরকার হয়, তখন তো সব উলট-পালট করবে, তছনছ করে দেবে। নিজের সোহাগের মানুষের কাছ থেকে আসতে পারছনা আহা কি অমূল্যনিধি! দিন এখনো ঢের পড়ে আছে, বহু সময় পাবে। এমনি করেই বুঝি ওখানে মনিবের খপরদারী করবে? যা বলি শোন! এই যে-এই ফ্রক কোটগুলো কোথায় রাখছি দেখ—আর শাসেন্কা, খুব যত্নে রাখবে, রোজ পরবে না, এক গজ কাপড়ের দাম ষোলোটি রুবল। যখন কোন মান্যগণ্য লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, তখন পরবে। কিন্তু বসবার সময় তোমার পিসির মত করোনা। সেতো খালি চেয়ার বা সোফা চোখে দেখতে পায় না—যেখানে টুপি বা অন্য কিছু আছে সেখানেই ঝুপ করে বসে পড়ে। এই তো সেদিন এক প্লেট মোরাব্বার উপরই বসে পড়ল, কি কাণ্ড বলত! যখন সাধারণ কোন মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাবে, এই নীল কোটটা পরবে। এবার ওয়েস্ট কোটগুলো! এক, দুই, তিন, চার। দুই প্রস্থ ট্রাউজার আছে। ওঃ, তোমার যা পোশাক আছে তিন বছর কেটে যাবে। বাছা, উঃ হয়রাণ হয়ে পড়লাম। সেই সকাল থেকেই তো সব দেখাশুনো করছি। ইভেসি, তুমি এখন যাও! শাসেন্কা, এস অন্য কথা পাড়ি। অতিথিরা সব এখনি এসে হাজির হবেন, তখন তো অন্য কাজ করতে হবে।

সোফায় গা ঢেলে দিলেন, ছেলেকে বসালেন পাশে।

একটু থেমে বললেন, শাসা, তুমি এখন বিদেশে যাচ্ছ।

—পিটার্সবুর্গ-বিদেশ? মা-কি বলছ?

একটু সবুর কর—আমি কি বলতে চাই আগে শোন। ঈশ্বরই জানেন, সেখানে কার দেখা পাবে, কি দেখবে। ভালমন্দ সবই তো দেখতে হবে। আমাদের স্বর্গীয় পিতা যেন তোমাকে শক্তি দেন! যা-ই-ই কর না কেন,

তাঁকে যেন ভুলে যেয়োনা—মনে রেখো, তাঁর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া তোমার বাঁচার উপায় নেই। যদি ওখানে বড় চাকুরীও তুমি পাও, বেশ উঁচুতে ওঠ—আমাদের প্রভুর কাছে মাথা নুয়ে থাকবে। আমরা কারো চেয়ে কম নই—তোমার বাবা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ—তার উপরে ছিলেন মেজর। সুখে দুঃখে সবসময়েই ভগবানকে ডাকবে, সেই প্রবাদ বচনের চাষীর মত হয়ো না। সেই চাষী যে বাজ না ডাকলে কখনো প্রার্থনা করত না। অনেক মানুষ আছে, যখন তাদের ভাগ্য ভাল থাকে, তারা গীর্জার ভিতরে উঁকি মেরেও দেখেনা, কিন্তু যখন দুঃসময় এসে দেখা দেয়, তারা এক রুবল দামের মোম জেলে দেয়, আবার গরীবকে দানও করে। সে তো মহাপাপ। ভাল কথা, ভিখারীদের কথা বলি। না ভেবে-চিন্তে ওদের পয়সা-কড়ি দিও না, একবারে বেশি করে দিওনা। কেন ওদের নষ্ট করবে? যতই দাওনা কেন, ওদের তুষ্ট করতে পারবে না। ওরা মদ খেয়ে সে পয়সা উড়িয়ে দেবে, তোমাকে দেখে হাসবে। তোমার মন নরম তা জানি—তুমি হয়তো দশ কোপেকের রেজকিগুলো চারিদিকে ছড়াবে। অমন কোরোনা—ঈশ্বর ওদের দেবেন। গীর্জায় কি তুমি নিয়মমত যাও! রবিবারের প্রার্থনায় কি যাও?

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

আলেকজান্দার নির্বাক নিরুত্তর। তার মনে পড়ল, জেলা-শহরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত, সে একজন উৎসাহী গীর্জার যাত্রী ছিল না। গ্রামে এসে মাকে খুশী করার জন্যই সে গীর্জায় তাঁর সঙ্গী হয়। মিছে বলতে লজ্জা হল। মা তার মৌনের কারণ বুঝে আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

বলতে লাগলেন, বেশ তো, আমি তো জোর করতে চাইনে। তোমার অল্প বয়সে আমাদের বুড়োদের মত তুমি ঈশ্বরের মন্দিরে যেতে অধীর হয়ে উঠবে—এটা আশাও করা যায় না। তাছাড়া তোমার কাজই তোমাকে বাধা দেবে। নয়তো সেখানে গিয়ে ঘুমোবে। ঈশ্বর যেন যুবকদের দয়া করেন। না, রাগ করোনা। তোমার মা আছে। সে বেশিক্ষণ ঘুমোবে না। আমার শিরায় যতক্ষণ একফোঁটা রক্ত থাকবে, যতক্ষণ আমার সমস্ত চোখের জল না শুকিয়ে যাবে—ভগবান আমার পাপ ক্ষমা করবেন—যদি আমার হাঁটার শক্তি না থাকে আমি হামাগুড়ি দিয়ে গীর্জার দোরে

গিয়ে হাজির হব—আমার শেষ নিঃশ্বাস, আমার শেষ ফোঁটা চোখের জল বাছা তোর জন্ত আমি দেব। প্রার্থনা করে তোর স্বাস্থ্য, তোর উচ্চপদ, পুরস্কার আর আশীর্বাদ আমি চেয়ে নেব। পার্থিব আর স্বর্গীয়—সবই আমি চাইব। নিঃসহায়া বৃদ্ধার প্রার্থনা নিশ্চয়ই আমার দয়াময় পিতা প্রত্যাখ্যান করবেন না! নিজের জন্ত তো আমি কিছু চাইনা। আমার স্বাস্থ্য, আমার জীবন, আমার দৃষ্টিশক্তি—সবকিছু থেকে তিনি আমাকে বঞ্চিত করুন—যতক্ষণ তিনি তোমাকে সমস্ত আনন্দ, সমস্ত সুখ আর সমস্ত ভাল জিনিস দেন—

চোখের জল ধারায় গড়িয়ে পড়ছে, তিনি আর বলতে পারলেন না।

আলেকজান্দার লাফিয়ে উঠে পড়ল।

মা—সে চেঁচিয়ে উঠল।

চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছে বললেন, বসো, বসো! আরো অনেক কথা আছে। কি যেন বলছিলাম? মগজ থেকে চলে গেছে? দেখ—স্মৃতিশক্তি আজকাল কি হয়ে গেছে! ও—হাঁ—উপবাসের দিনগুলোয় উপোস করো। বাছা, ওগুলো খুব দরকারী। বুধ আর শুক্রবারের উপোস করতে হবে না। ভগবান তোমাকে সেগুলি মাপ করবেন। কিন্তু লেণ্টের উপোস কোরো—ভগবানের দোহাই পেড়ে বলছি। এবার মিখাইল মিখাইলোভিচের কথা বলি—লোকটিকে সবাই চালাক-চতুর বলে জানে—দেখ তো তার দিকে তাকিয়ে! মাংস খাবার দিনেই হোক আর উপোসের দিনেই হোক, ও তো গোগ্রাসে গেলে, এমন কি পবিত্র সপ্তাহটাও বাদ দেয় না। এতে মাথায় চুল খাড়া হয়ে উঠবে না? অবিশ্যি, গরীবকে সে দান করে, কিন্তু ঈশ্বর তো তার এই দান গ্রাহ্য করবেন না। লোকে বলে, একবার এক বুড়োকে নাকি সে দশ কবল দিয়েছিল, সে তো কবল পেয়েই মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেললে। সবাই তাকে সেলাম ঠোকে, কত ভাল ভাল কথা বলে সামনে, কিন্তু আড়ালে ওর কথা উঠলেই ক্রুশচিহ্ন আঁকে—যেন ও সাক্ষাৎ শয়তান।

আলেকজান্দার অসহিষ্ণু না হয়ে শুনে গেল, জানালার বাইরে দূর পথের দিকে সে তাকিয়ে আছে।

তিনি মুহূর্তের জন্ত থামলেন।

সবচেয়ে বড় কথা, শরীরের উপরে নজর রেখো, তিনি বলে চললেন। ঈশ্বর না করুন, যদি খুব অসুখ হয়—আমাকে জানাবে। আমি আমার যথা-শক্তি করব, অমনি তোমার কাছে ছুটে যাব। ওখানে কে তোমাকে দেখবে? ওরা হয়তো অসুস্থ মানুষকে ঠকাতে চাইবে। রাতে একা পথে বেরিও না—গুণ্ডাদের এড়িয়ে চলবে, টাকা সাবধানে রাখবে। দুদিনের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করো। বুঝে শুনে খরচ করো। যা কিছু ভাল আর মন্দ ঐ অভিশপ্ত জিনিসটা থেকেই সৃষ্টি। উচ্ছৃঙ্খল, অসংযমী হয়ো না। তুমি আমার কাছ থেকে বছরে আড়াই হাজার রুবল নিয়মিতভাবে পাবে। আড়াই হাজারটি রুবল তুচ্ছ করার মত টাকা নয়। কোন রকম বিলাসিতার ভিতর যাবে না আবার অকারণে নিজেকে বঞ্চিতও করবে না। যদি ভাল কিছু খেতে ইচ্ছে হয়, কৃপণতা করো না। মাতাল হোয়ো না, ঐটেই মানুষের চিরশত্রু। আর—তিনি স্বর নামিয়ে বললেন—মেয়েদের সম্বন্ধে হুঁশিয়ার, আমি ওদের চিনি। কত বেহায়া মেয়ে আছে যারা তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে, যখন তারা দেখবে এমন—

ভালবাসা-ভরা চোখে তিনি ছেলের দিকে তাকালেন।

মা-মণি, থাক, থাক। এখন বল ছোটহাজরীর কি হ'ল? একটু বুঝি বিরক্ত হয়েই সে বললে।

মিনিট-খানেকের ভিতরে আসছে—আর একটা কথা শুধু বলব। অন্যের স্ত্রীর উপর নজর দিয়ো না—তিনি বললেন। তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইছেন কথা। ওটা মহাপাপ। বাইবেলে আছে—নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীকে কামনা করিও না! যদি কোন মেয়ে তোমার কাছে বিয়ের কথা পাড়ে, ঈশ্বরের দোহাই—তুমি কি ওকথা ভাব না! যেই তোমার টাকা আর সুন্দর মুখ-খানা দেখবে, অমনি ওরা তৈরী হয়েই থাকবে। অবশ্য যদি তোমার অফিসের কর্তা কি কোন মহৎ আর বনেদী ঘরের ধনীর তোমাকে পছন্দ হয়, আর তিনি যদি তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান—সে আলাদা কথা। আমি না বলব না। কিন্তু আমাকে তখনি চিঠি লিখবে। যেভাবেই হোক, আমি পিটার্সবুর্গে ছুটে যাব, গিয়ে দেখব ওরা তোমার ঘাড়ে তাকে গছিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চাইছে কিনা—হয়তো কোন আইবুড়ো ধাড়ি, নয় তো খারাপ মেয়ে আর কি! ওরা তো এমন স্বামীর জন্য মুখিয়ে

আছে। যদি কোন ভাল মেয়েকে নিজেই ভালবেসে ফেল, আর মেয়েটি পছন্দসই হয়—তাহলে—তিনি স্বর আরো নামিয়ে আনলেন—সোনিয়ার কথা ভেবো না (সে তার মনের মানুষটিকে এত ভালবাসে, সে বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে রাজী)। বাস্তবিক, মারিয়া কার্পোভ্‌নার নজর অত উঁচু হওয়া উচিত নয়, সে তার মেয়েকে তোমার সমান মনে করে। একটা গেঁয়ো মেয়ে? তোমাকে পেলে অনেক বড় বড় ঘরের মানুষও খুশী হবে।

সোফিয়া! না, না, মা—আমি সোফিয়াকে কখনো ভুলব না—আলেক-জান্দার বললে।

বেশ, বেশ বাছা, আমিও ওকথা বলিনি। কাজ করবে, বাড়ি ফিরে আসবে, তারপরে দেখব, ঈশ্বর কি দেন। অমন বহু কনে জুটে যাবে। যদি ওকে ভুলতে না পার—সে তো ভাল কথা। তোমাকে—

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল—ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে শুধালেন—

তুমি তোমার মাকে তো ভুলবে না?

ও বাধা দিলে, কি বলছ মা! তাড়াতাড়ি কিছু খাবার আনতে বল—একটা ওমলেট কি অমনি কিছু হলেই হবে। তোমাকে ভুলব? অমন কথা ভাবলে কি করে? আমাকে ঈশ্বর যেন শাস্তি দেন—

থামো থাম্ তো, তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। ঈশ্বরের অভিশাপ নিজের উপর টেনে আনিসনে। না, না! যদি নিজে কখনো ও পাপ করে ফেলিস, আমিই যেন তার শাস্তি ভোগ করি। তোর অল্প বয়েস, সবে জীবন শুরু করেছিস, অনেক বন্ধু জুটবে—বিয়ে করবি, তোর অল্পবয়েসী বৌ মার জায়গা জুড়ে বসবে, সবকিছু দখল করে বসবে। না! না আমি যেমন তোকে আশীর্বাদ করছি, তেমনি যেন ঈশ্বরও করেন!

তিনি কপালে চুমু খেলেন, উপদেশের পালাও সাঙ্গ হ'ল।

ওরা আসছে না কেন? বলে উঠলেন। মারিয়া কার্পোভ্‌না, আন্তন ইভানিচ, পাদ্রী—কেউ আসছেন না! এতক্ষণে গীর্জার উপাসনা তো শেষ হয়ে গেছে। ঐ—কে যেন আসছে! আন্তন ইভানিচ বলেই মনে হয়—হাঁ—সে-ই তো! দেবদূতের কথা যদি বল—

আন্তন ইভানিচকে সবাই চেনে। ও সেই ভবঘুরে ইহুদী। সব সময়ে

সর্বত্র আছে। ঐ আর পুরাকাল থেকেই ওর অস্তিত্ব বিদ্যমান, কেউ কখনো ওর মৃত্যু দেখে নি। গ্রীক আর রোমান ভোজে ও হাজির ছিল, অমিতব্যয়ী পুত্র ফিরে আসতে সুখী পিতা পুত্রের সম্মানে যে সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট ভেড়াটি মেরেছিলেন, তারও ভাগ অবশ্যই সে পেয়েছিল।

রাশিয়ায় তার বহু ছদ্মবেশে চলা-ফেরা। আমরা এখন যাঁর কথা বলছি, তিনি বিশ ঘর প্রজার মালিক। একেবারে মাথা অবধি দেনায় ডুবুডুবু। এমন বাড়িতে থাকেন, চাষীর কুঁড়েঘর থেকে একটু সরেশ, এক অদ্ভুত বাড়ি—দেখতে খামারবাড়ির মত দেখায়—পেছনে কোথায় যেন ঢোকার পথ—সে পথ আবার মস্ত মস্ত কাঠ দিয়ে আটকানো। একেবারে বেড়ার ধার ঘেঁষে পথটি। বিশ বছর ধরে তিনি জাহির করে আসছেন, সামনের বসন্ত-কালে তিনি নতুন বাড়ি গড়তে শুরু করবেন। বাড়িতে কাউকে খাওয়ান-দাওয়ান না। তাঁর পরিচিতদের কেউ তাঁর সঙ্গে ভোজ খেয়েছে বলতে পারবে না, এমন কি এক পেয়ালা চা ও না। কিন্তু হেন লোক নেই যার বাড়িতে তিনি ডিনার খান নি। আর রাতের খাবার তো বছরে পঞ্চাশবারও খেয়েছেন।

এক সময়ে আস্তন ইভানিচ ঢিলে ব্রীচেস আর লম্বা কোট পরে ঘুরতেন, এখন সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে ওভারকোট আর ট্রাউজার্স পরেন, রবিবারে পরেন এক অদ্ভুত কাটছাঁটওলা ফ্রককোট। দেখতে বেশ মোটাসোটা মানুষটি, দুঃখ, ভাবনা-চিন্তার বালাই নেই। যদিও তিনি বলেন, অন্যের দুঃখ আর ভাবনা-চিন্তার আঁচ তাঁকে সারাজীবন ধরে পোহাতে হচ্ছে। কিন্তু একথা তো সবাই জানে; কেউই অপরের দুঃখ আর ভাবনা-চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে থাকতে পারে না। সেইটেই মানুষের স্বভাব।

আস্তন ইভানিচকে কারোই সত্যি কোনো দরকার নেই, কিন্তু কোন ব্যাপারই তাঁকে ছাড়া হয় না—সে বিয়েই হোক আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াই হোক। সব ভোজে আর সান্ধ্য-মজলিসে আর পারিবারিক মন্ত্রণা সভায় তাঁকে দেখা যায়—তাঁর পরামর্শ ছাড়া কেউ এক পা এগোয় না। এতে মনে হতে পারে তিনি অতি প্রয়োজনীয়, তিনি কোথাও হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করে দেন, কোথাও বা দেন সুপরামর্শ, কোথাও বা করেন নিষ্পত্তি—কিন্তু তা মোটেই নয়! কেউ তাঁকে কোন কাজ দিয়ে বিশ্বাস করে না;

তিনি অকর্মা মানুষ—কিছু জানেন না—মামলায় কাউকে যেমন সাহায্য করতে পারেন না, তেমনি পারেন না মধ্যস্থ হয়ে কাজ করতে, আবার দু'দলের ঝগড়াও মিটিয়ে দিতে তিনি অক্ষম।

কিন্তু কিছু কিছু কাজ করে থাকেন বইকি। যেমন—অমুক জানিয়েছে তার সম্ভাষণ—সেকথা বলে যান, কখনো ভোলেন না। দুপুরের ভোজ খেতে খেতে বলেন, অমুক দলিলটা পাওয়া গেছে, যদিও ঠিক কোন দলিলটি তা তাঁকে বলা হয় না। এক ঘট মধু, কি একমুঠো বীজ তাঁর হাতে দেওয়া হয় অমুক্ত পৌঁছে দেবার জন্ত, সঙ্গে সঙ্গে থাকে কঠিন-কঠোর আদেশ—যেন একটুও না ফেলে দেন; আবার কখনো বা একজনকে আর-একজনের নামকরণের দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেও তাঁকে পাঠানো হয়। চাকর-বাকর পাঠাতে যখন দৃষ্টিকটু দেখায়, তখনই আন্তন ইভানিচের ডাক পড়ে, তাঁকে অনুরোধ করা হয়। তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়—পেত্রুসকাকে পাঠানো চলে না। ও গিয়ে সব গোলমাল করে দেবে, তার চেয়ে আন্তন ইভানিচকে বল। নয় তো—চাকর-বাকর পাঠিয়ে হবে না—হয়তো অমুক-অমুক চটে যাবেন—তার চেয়ে আন্তন ইভানিচকে পাঠাও।

তাঁকে কোন ভোজে বা উৎসবে গরহাজির দেখলে সবাই কি অবাকই না হয়! আন্তন ইভানিচ কোথায়? সবাই নিশ্চয়ই অবাক হয়ে শুধায়, কি হ'ল তার? কেন এল না?

আর ভোজের উৎসবটিও মাটি হয়। কি ব্যাপার জানবার জন্তে কাউকে পাঠাতে হয়—তার অসুখ করেছে, কোথাও গেছে কি না—জানতে হয়। অসুখ করলে, তাঁর সম্বন্ধে সকলেরই সদয় দৃষ্টি বর্ষিত হয়—দেখে মনে হয় তিনি যেন পরম আত্মীয়।

আন্তন ইভানিচ আনা পাভ্লোভনার হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে অভিবাদন জানালেন।

দিন আপনার ভাল যাক আনা পাভ্লোভনা! সব বুঝি নতুন করে করছেন!

নতুন করে করছি আন্তন ইভানিচ? প্রতিধ্বনি করে উঠলেন আনা পাভ্লোভনা, নিজের আপাদ-মস্তক দেখে নিলেন।

আপনার ফটকের সুমুখের তক্তাগুলো তো এই মাত্র পাতা হ'ল।

আমার গাড়ির চাকায় সেগুলো ছুলে-ছুলে উঠল না। অমনি দেখে বুঝলাম, ওগুলো নতুন।

পরিচিতকে সম্ভাষণ করতে গেলে কোন একটা কিছু নিয়ে অভিনন্দন জানানো তাঁর অভ্যেস। হয় সেটা লেন্টের উৎসব, নয় তো বসন্ত কি হেমন্ত কাল—যাই-ই হোক না কেন। বরফ গলার পরে আবার যদি তুষারপাত শুরু হয়, তিনি তুষারপাত নিয়েই অভিনন্দন জানাবেন, আবার তুষারপাতের পর গলা শুরু হলে—তাই নিয়েই বলবেন।

এখন ওসব কিছুই নেই—কিন্তু আস্তন ইভানিচ সবসময়েই কিছু না কিছু পেয়ে যান।

বললেন, আলেকজান্দ্রা ভ্যাসিলিয়েভনা, মাত্রিওনা মিখাইলোভনা আর পিতর সার্জেইচ আপনাকে তাঁদের সম্ভাষণ জানিয়েছেন।

অনেক ধন্যবাদ আস্তন ইভানিচ। ওঁদের ছেলেমেয়েরা ভাল আছে?

হাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভালই আছে। প্রভুর আশীর্বাদ আমি আপনার জন্যে বয়ে এনেছি—পাত্রী আসছেন। মাদাম, আপনি সেমিওন আর্কপীচের কথা শুনেছেন?

কি ব্যাপার? সভয়ে চিৎকার করে উঠলেন আনা পাভ্‌লোভনা।

তিনি মারা গেছেন।

না, না, ওকথা বলবেন না। কখন এ ব্যাপার হ'ল?

গত কাল সকালে। ওরা সন্ধ্যেয়ই আমাকে খবর দেয়। ওদের ছেলে ছুটতে-ছুটতে আসে। আমি তখনি গেলাম—সারারাত ঘুম হয় নি। সবাই কান্নাকাটি করছেন—সান্ত্বনা দিতে হ'ল, কি করতে হবে বলে দিতে হ'ল—কেউ তো তখন কান্না ছাড়া আর কিছু করছিল না—একমাত্র আমিই বাদ ছিলাম।

হা ঈশ্বর! আনা পাভ্‌লোভনা মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। এই তো আমাদের জীবন···কিন্তু কি করে হ'ল? এই তো গত সপ্তাহে আপনার মারফত তিনি সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন!

হাঁ, মাদাম। বহুদিন ধরেই অসুখে ভুগছিলেন। বড় বুড়ো হয়ে পড়েছিলেন। এত দিন যে বেঁচে ছিলেন সেইটেই আশ্চর্য।

বুড়ো? ওঁর চেয়ে এক বছরের বড় ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি

দিন, ক্রুশচিহ্ন এঁকে আনা বললেন। বেচারী ফিওদোসিয়া পেত্রোভনা—অক্তোভলো ছেলেপুলে নিয়ে পড়ে রইলেন। কি ভয়ানক! পাঁচ-পাঁচটি সন্তান—আর প্রায় সবগুলিই মেয়ে! অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কবে?

আগামী কাল।

আহ্বন ইভানিচ, সকলেরই নিজের নিজের দুঃখ আছে—এই তো আমি আমার ছেলেকে বিদায় দিচ্ছি।

আনা পাভ্‌লোভনা—এর তো আর চাড়া নেই! আমরা তো মানুষ। ধর্মশাস্ত্রে আমাদের সহ্য করতেই বলা হয়েছে।

আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে রাগ করবেন না। আমাকে দুঃখ সইতে হবে, তার জন্যে আপনার সাহায্য চাই। আপনি পরিবারের লোকের মতই আমাদের কথা ভাবেন।

নিশ্চয়ই আনা পাভ্‌লোভনা—নিশ্চয়ই ভাবি! আপনার মত ক'জন আছে? আপনি নিজের দাম নিজে জানেন না! আমার কি ভাবনার অন্ত আছে—আমার বাড়ির খসড়াও এখন হয়ে এল—কাল তো সারা সকালটা কারিগরের সঙ্গে কথা বলে বলে হাঁপিয়ে উঠছিলাম, কিন্তু এখনো একটা চুক্তি হ'ল না। তবু মনে মনে বললাম, আমি ওঁর কাছে যাব, আমাকে ছাড়া একা উনি কি করে কি করবেন? উনি তো আর আগের মত তেমন জোয়ান নন—হয়তো সব গুলিয়েই ফেলবেন।

আহ্বন ইভানিচ, আমাদের ভোলেননি বলে ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন! হাঁ, আমাতে আর আমি নেই। আমার মাথায় সব গোলমাল হয়ে গেছে, আমি নিজেই বুঝতে পারছিনা—আমি কি করছি। কেঁদে কেঁদে গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে। আপনি কিছু খাবেন? নিশ্চয়ই আপনি ক্লান্ত, খিদেও পেয়েছে!

আপনাকে ধন্যবাদ! সত্যিই পথে পিতর সার্গেইচের ওখানে সামান্য কিছু খাবার আর পানীয় জুটেছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। পাদ্রী এখনি এসে পৌঁছবেন, প্রার্থনাও করবেন। ঐ তো উনি ঐ গাড়ি-বারান্দায়।

পাদ্রী এসে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনে মারিয়া কার্পোভনা আর তাঁর মেয়ে। মোটাসোটা, গোলাপী গাল মেয়েটি মুখে হাসি, চোখ কেঁদে কেঁদে লাল। সোফিয়ার চোখ আর তার মুখের অভিব্যক্তি যেন স্পষ্টই বলে—আমি

সহজ-সরল ভাবে ভালবাসব, কোন আষে বাজে কিছু সেখানে থাকবেনা। আমার স্বামীর সেবা করব নার্সের মত, সব ব্যাপারে তাঁর হুকুম মেনে চলব, আর তাঁর চেয়ে চালাক-চতুর হতে কখনো চেষ্টা করব না। আর স্বামীর চেয়ে কে বেশী চালাক-চতুর হতে পারে! সে তো পাপ! আমি ঘর-গৃহস্থালীর কাজ ভালভাবে দেখব, জামা-কাপড় রিপু করব, আধডজন ছেলেপুলে বিয়োব, তাদের লালন-পালন করব। সাজাব-গোছাব জামা-কাপড় রিপু করে দেব নিজে। তার তাজা, টেবো গাল আর মস্ত বুকখানা সন্তান-সন্ততির প্রতিশ্রুতির সমর্থন করে। কিন্তু চোখের জল আর বিষন্ন হাসি এই মুহূর্তে তাকে একেবারে পাঁচপাঁচি থেকে একটু উঁচুতে তুলে দিয়েছে।

প্রথমে প্রার্থনা। আস্তন ইভানিচ পরিবারের সবাইকে ডেকে আনলেন, মোম জ্বালালেন, পাদ্রীর পড়া শেষ হলে পাদ্রীর সহকারীটির হাতে বইখানি দিয়ে দিলেন। তারপরে একটা শিশিতে পবিত্র বারি ঢেলে পকেটে রাখলেন। পকেটে রেখে বললেন, এটা আগাফয়া নিকিতিশনার জন্য রইল। এবার সবাই এসে বসলেন টেবিলে। আস্তন ইভানিচ আর পাদ্রী ছাড়া আর কেউ খাবার ছুঁলেন না। আস্তন ইভানিচ এই হোমারীয় ভোজে যথাকর্তব্য করলেন। আনা পাভ্‌লোভনা শুধু গোপনে কাঁদলেন আর চোখের জল মুছলেন।

আনা পাভ্‌লোভনা, কাঁদবেন না! আস্তন ইভানিচ কৃত্রিম দুঃখে এক গেলাস কর্ডিয়াল ঢালতে-ঢালতে বলে উঠলেন, সবাই ভাববে আপনি ওকে বধ্যভূমিতে পাঠাচ্ছেন। তারপরে গেলাসের অর্ধেকটা পান করে অতি তৃপ্তিতে ঠোঁট চেটে বললেন, আহা কি কর্ডিয়াল! কি ভোজ! এমনটি সারা গ্রামদেশে আর পাবে না।

দু'বছর ধরে পড়ে আছে, আনা পাভ্‌লোভনা ফোঁপানির মাঝখানে বললেন, শুধু একটিই ছিল, আপনার জন্য খোলা হয়েছে।

আনা পাভ্‌লোভনা—আপনার জন্য আমি লজ্জিত—আস্তন ইভানিচ শুরু করলেন—আপনাকে মারা দরকার। আহ্লাদে মারা দরকার!

আস্তন ইভানিচ—আমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে দিন—আমার একমাত্র ছেলে—আর সে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে! মরলে আমাকে এখানে কে কবর দেবে?

আমাদের কি হবে? আমি কে? একজন অপরিচিত নয় কি? আপনি মরার জন্ত এমন তাড়াহুড়ো করছেন কেন? বরং শীগগীরই হয়তো বিয়ে করবেন। আপনার বিয়েতে নেচে নেচে কত মজা করব। এখন আর কাঁদবেন না!

আমন ইভানিচ—আমি যে পারছি না—সত্যি পারছি না। নিজেই চেয়ে অবাক হচ্ছি—এত চোখের জল কোথা থেকে এল?

আপনি অমন যুবো ছেলেকে যেন আটকে রাখতে পারবেন! ওকে স্বাধীনতা দিন, নিজের পাখনার শক্তি এখন ও অনুভব করতে পারবে—আর দেখবেন কি তাজ্জব কাণ্ড ও করে। ওখানে গিয়ে ঠিক ওর পদবৃদ্ধি হবে।

আপনার কথাই যেন সত্যি হয়। আপনার পাতে তো পাই নেই—আর কয়েকখানা নিন।

ধন্তবাদ—আর ঐখানাই খাব। আলেকজান্দার ফিওদরিচ, তোমার স্বাস্থ্যপান করছি। শুভ হোক তোমার যাত্রা! শীগগীরই ফিরে এস! এসে বিয়ে-থা করবে! ওকি লজ্জায় লাল হয়ে উঠছ কেন সোফিয়া ভ্যাসিলিয়েভনা?

ও কিছু না—আমি শুধু—

আহা যৌবন—যৌবন!

আমন ইভানিচ—আপনি যেখানে থাকবেন, সেখানে কেউ মনমরা হয়ে থাকতে পারে না, আনা পাভলোভনা বললেন। আপনি তো আমাদের সান্ত্বনা। ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ রাখুন। আর একটু কর্ডিয়াল নিন না!

নেব, আনা পাভলোভনা, আর একটু নেব! বিদায় নিতে এসে মানুষ পান করবে বই কি।

খাওয়া শেষ হল। গাড়োয়ান বহু আগেই ঘোড়াগুলো গাড়িতে জুতে দিয়ে গাড়ি বারান্দার সামনে এনে রেখেছে। ভৃত্যেরা এক-একজন করে ছুটে আসছে। একজন তোরঙ্গ নিয়ে চলেছে, আর একজন একটি পুঁটলি—আর একজন বস্তা—আবার আরো কিছু আনার জন্ত ফিরে যাচ্ছে। গুড়ের চারিদিকে মাছির মতো ওরা গাড়ি ঘিরে আছে, প্রতিজনই গাড়ির ভিতরে হাত পুরে দিচ্ছে।

একজন বললে, তোরঙ্গ রাখার এই-ই সেরা জায়গা। খাবার-দাবারের বাক্সটা ওখানে রাখা যেতে পারে।

পা রাখবে কোথায়? আর একজন শুধালে তোরঙ্গটা লম্বালম্বি রাখ, বাক্সটা পাশেও রাখা যায়।

তোরঙ্গটা লম্বালম্বি রাখলে, পালকের গদিখানা খসে পড়বে, বরং আড়াআড়ি রাখ। আর কি রইল? জুতোগুলো প্যাক করেছ?

জানি না। কে প্যাক করেছে?

আমি নই। গিয়ে দেখ—ওগুলো ওপরে কোথাও পড়ে আছে কি না।

নিজে যাওনা।

কেন—তুমি যেতে পারবে না কেন? দেখছ না—আমি ব্যস্ত।

এই যে—এটা ভুলে যেও না—চেঁচিয়ে উঠল একটি চাকরানী, মাথার সারের ভিতর দিয়ে একখানা হাত পুরে দিলে। হাতে একটা পোঁটলা।

এদিকে দাও!

তোরঙ্গে রেখে দাও—আমরা ভুলেই গিছলাম! আর একটা ঝি এসে গাড়ির পাদানীতে চেপে একটা ব্রাস আর চিরুণী দিলে—

হৃষ্টপুষ্ট সহিসটি খেঁকিয়ে উঠল—এখন কি করে তা করব? ভাগো। দেখছ না, তোরঙ্গটা একেবারে নিচে রয়েছে!

কর্ত্রীর হুকুম! আমি জানি না—ছুঁড়ে ফেলে দাও না!

যত শয়তানের দল!

এদিকে দাও—জলদি দাও! পকেটে রেখে দেওয়া যাবেখন!

ঘোড়াটা মাথা দোলাচ্ছে অবিরাম, প্রতিবারে ডাণ্ডার ঘন্টি বেজে-বেজে উঠছে। যেন বিদায়ের স্মারক। আশে-পাশের ঘোড়াগুলি মাথা নুয়ে আছে, তারা যেন চিন্তায় বিভোর। সম্মুখে যাত্রাপথের আনন্দ যেন উপলব্ধি করছে—মাঝে মাঝে লেজ নাড়ছে, ঘোড়াটার দিকে নিচের ঠোঁট বাড়িয়ে দিচ্ছে। অবশেষে অভিশপ্ত মুহূর্ত এল। ওঁরা আর একবার প্রার্থনা করলেন।

বসুন—সবাই বসুন! আস্তন ইভানিচ আদেশ করলেন। আলেকজান্দার কিওদরিচ—তুমি বোস! ইভেসিও বোস! বসতে পারছ না? তিনি হেসে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। ঈশ্বর তোমাদের ভাল করুন!

আনা পাভ্লোভনা কেঁদে ফেললেন, আলেকজান্দারের গলা জড়িয়ে ধরেছেন তিনি।

বিদায়, বিদায় বান্ধা, তাঁর কোম্পানির মধ্য দিয়ে শোনা গেল, আর কি তোমাকে দেখতে পাব?

তারপরে এক গোলমেলে কাণ্ড। হঠাৎ আবার এক ঘণ্টি শোনা গেল, তিন ঘোড়ার এক হালকা গাড়ি এসে উঠোনে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। ধুলায় ধূসর একটি যুবক লাফিয়ে পড়ল গাড়ি থেকে, সে ছুটে ঘরে এসে আলেকজান্দারকে জড়িয়ে ধরল।

পসপেলভ! আন্তুয়েভ! ওরা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

কোথা থেকে উদয় হলে? কি করে এখানে এলে?

বাড়ি থেকে আসছি। সারাদিনরাত ঘোড়া দাবড়িয়ে তোমাকে বিদায় দিতে এসেছি।

আমার সত্যিকারের বন্ধু তুমি, আবেগে বলে উঠল আলেকজান্দার। চোখে তার জল দেখা দিয়েছে। বিদায় দিতে এসেছ একশো মাইল গাড়ি চালিয়ে! তাহলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বলে জিনিস এখনো আছে! চিরদিনের বন্ধুত্ব আছে? আবার বন্ধুর কাছে ছুটে গেল, তার হাত চেপে ধরল ব্যগ্রভাবে।

কবর অবধি এ বন্ধুত্ব থাকবে, আলেকজান্দারের হাত আরো জোরে চেপে ধরে আবার যুবকটি উত্তর দিলে। তাকে জড়িয়ে ধরল ব্যগ্রভাবে।

চিঠি লিখো।

লিখব, তুমিও লিখবে।

পসপেলভকে নিয়ে আনা পাভ্লোভনা খুব একটা বাড়াবাড়ি করতে পারলেন না। যাত্রা আরো আধঘণ্টা পিছিয়ে গেল। অবশেষে ওরা রওনা হল।

গাছপালাগুলো যেখানে আছে, সেদিকে সবাই হেঁটে চলল। সোফিয়া আর আলেকজান্দার আঁধার গাড়ি-বারান্দায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। শাসা, আমার প্রিয় শাসা! সোনিয়েচকা—ওরা অস্ফুটস্বরে বললে, কিন্তু কথা চুম্বনে ডুবিয়ে গেল।

ওখানে গিয়ে আমাকে ভুলে যাবে না তো? অশ্রুমুখী সোফিয়া শুধালে।

আমাকে কতটুকু তুমি জান! বিশ্বাস কর, আমি ফিরে আসব—আর কেউ—

এই নাও—আমার ফুল আর আঙটি।

আলেকজান্দার তাড়াতাড়ি সেগুলি পকেটে পুরে রাখল।

আনা পাভলোভনা আগে আগে চলেছেন, তাঁর সঙ্গে ছেলে আর পদপেলভ, পিছনে মারিয়া কর্পোভনা আর তাঁর মেয়ে। সব শেষে পাত্রী আর আন্তন ইভানিচ। গাড়ি একটু পেছনে অনুসরণ করছে। গাড়োয়ান ঘোড়াগুলোকে অতি কষ্টে বাগ মানিয়ে রাখছে। চাকর-চাকরাণীরা ইভেসিকে ফটকের কাছে ঘিরে আছে।

বিদায় ইভেসি ইভানিচ—বিদায় বুড়ো—আমাদের ভুলে যেও না! চারিদিক থেকে আসছে স্বর।

বিদায় ভাইসব, বিদায়! আমাকে ভুলে যেওনা!

বিদায়—ইভেসেউসকা বিদায়—বাছা আমার। ইভেসির মা তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন। এই একটা তাবিজ দিলাম—আশীর্বাদও করছি। নিজের ধর্ম হারাবেনা, ইভেসি, ওখানে নাস্তিকদের সঙ্গে মিশবেনা! যদি হারাও, আমার শাপ-মন্যি লাগবে। মদ খেওনা, চুরি কোরোনা—মনিবকে সত্যিকারের সেবা করবে, বিশ্বাসী হবে। বিদায়, বিদায়!

ঝাড়ন দিয়ে মুখ ঢেকে ঘুরে দাঁড়ালো।

মা, বিদায়, আস্তে আস্তে বললে ইভেসি।

বছর বারোর একটি মেয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বোনের কাছে বিদায় নাও গো, ভিড়ের ভিতর থেকে কে একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল।

আরে—তুমিও এসেছ! ইভেসি এই বলে তাকে চুমু খেল। বিদায়, বিদায়, ঘরে যাও, খালি পায়ে এসেছ!

সব শেষে এল আগ্রাফেনা। আর সবার থেকে আলাদা হয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখখানায় অসুস্থ সবুজ আভা। আসি আগ্রাফেনা ইভানোভনা, ইভেসি তার দিকে হাত বাড়িয়ে মিহি সুরে টেনে টেনে বললে।

সে তাকে জড়িয়ে ধরতে দিলে বটে, কিন্তু আলিঙ্গনে সাড়া দিলে না—শুধু শরীরটা একটু কুঁচকে রইল।

এই যে নাও! ঝাড়নের আড়াল থেকে একটা ছোট্ট থলে বার করে তাঁর দিকে ছুড়ে দিয়ে বললে—'পিটার্সবুর্গের ছুঁড়িদের সঙ্গে খুব ঘোরাঘুরি

করবে বোধহয়, সে ওর দিকে ট্যারচা চোখে তাকাল। ঐ এক চাউনিতে তার সব দুঃখ আর ঈর্ষার হদিশ পাওয়া যায়।

আমি? টক্রেসি চেঁচিয়ে উঠল, ঈশ্বর যেন আমাকে মেরে ফেলেন, আমার চোখের জেলা যেন বেরিয়ে আসে, আমি যেন মাটিতে সেঁধিয়ে যাই গো যদি…

বেশ, বেশ। আগ্রাফেনা সস্নেহভরে বিড়বিড় করে বললে, আমি তোমাকে চিনি।

ওহো ভুলেই গিছলাম, টক্রেসি বলে উঠল। সে এক জোড়া তেল-চিটচিটে তাস পকেট থেকে বার করলে। আগ্রাফেনা ইভানোভ্না তোমার জন্যে একটা উপহার। এখানে তো আর এক জোড়া পাবে না। আগ্রাফেনা হাত বাড়িয়ে দিলে।

টক্রেসি ইভানিচ, আমাকে দাও গো! প্রণকা ভিড়ের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল।

তোমাকে দেব! তার চেয়ে পুড়িয়ে ফেলাও ভাল! সে তাসজোড়া পকেটে রেখে দিলে।

এই মাথামোটা, দাও, আমাকে দাও। আগ্রাফেনা বললে।

না—আগ্রাফেনা ইভানোভনা—যা-ই বল, তোমাকে দেব না! ওর সঙ্গে এই তাস দিয়ে খেলবে। আসি তাহলে।

একবারও পিছন না ফিরে, সে হাত নেড়ে গাড়ির পেছনে পেছনে চলল। তাকে দেখে এমন জোয়ান মনে হয় যে সে, আলেকজান্দার, গাড়োয়ান, গাড়ি ঘোড়া সবশুদ্ধ কাঁধে তুলে নিতে পারবে।

হতচ্ছাড়া কোথাকার! ওর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আগ্রাফেনা, রুমালের কোণ দিয়ে মুছে ফেলতে লাগল ঝরে-পড়া চোখের জল।

গাছপালার কাছে এসে সবাই থেমে পড়ল। আনা পাভ্লোভ্না যখন ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে ছেলের কাছে বিদায় নিচ্ছিলেন, আন্তন ইভানিচ তখন একটা ঘোড়ার ঘাড়ে চাপড় মারছিলেন। নাক ধরে মাথায় ঝাঁকুনি দিচ্ছিলেন। ঘোড়াটা নিশ্চয়ই খুশী হয় নি—সেটা দাঁত বার করে ডেকে উঠল।

গাড়োয়ানকে বললেন, আসলে ঘোড়াটার লাগাম আলগা হয়ে আছে, জোয়াটা কেমন বেঁকে আছে দেখছ না।

গাড়োয়ান ঘোড়ার লাগামের দিকে তাকাল, সে দেখলে লাগাম ঠিকই আছে, তাই আর কোচবাক্স থেকে নড়ল না, শুধু চাবুক দিয়ে সাজগুলো একটু ঠেলে দিলে।

যাত্রার সময় হয়েছে। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন! আস্তন ইভানিচ বলে উঠলেন। আনা পাভ্‌লোভ্‌না—নিজেকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছেন—আর নয়! এবার আসুন। আলেকজান্দার পেত্রভিচ—তুমি উঠে পড়! শিস-কোভোতে সন্ধ্যেয় পৌঁছতে হবে। এস, এস! ঈশ্বর তোমাকে সুখ, উঁচুপদ, পদক, যা কিছু ভাল জিনিস আর সম্পত্তি দিন! এস, এস! ঈশ্বর মঙ্গল করুন! গাড়োয়ানকে বললেন, ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগাও, যখন পাহাড় বেয়ে নামবে তখন সামলে রেখো!

আলেকজান্দারের গাল দুখানি চোখের জলে ভেজা, সে গাড়িতে উঠে বসল।

ইভেসি মনিবের কাছে এল, নুয়ে পড়ে হাতে চুমু খেল; তিনি তাকে একখানা পাঁচ রুবলের নোট দিলেন।

ইভেসি ঠিক মত থাকবে—আর মনে রাখবে যদি ঠিকমত মনিবের কাজ কর—আগ্রাফেনার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। আর যদি না কর—

তিনি আর বলতে পারলেন না। ইভেসি কোচবাক্সে উঠে বসল।

দেরী দেখে হাঁফিয়ে উঠেছিল গাড়োয়ান, হঠাৎ যেন সজীব হয়ে উঠল। কানের উপর টুপিটা বসিয়ে নিজের আসনে ঠিক হয়ে বসে লাগাম তুলে নিলে। ঘোড়াগুলি হালকা চালে রওনা হল। আশেপাশের ঘোড়াগুলোকে পালা করে চাবুক মারছে। তারা লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে, গলা বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে—গাড়ি পথ ছাড়িয়ে এবার বনে ঢুকে পড়ল। যাত্রা দেখতে ভিড় জমেছিল, ভিড় এখন ধুলোর মেঘের ভিতর পড়ে রইল। যে পর্যন্ত না গাড়ি দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত রইল স্তব্ধ হয়ে নিঃশব্দ জনতা।

আন্তন ইভানিচই প্রথম সামলে নিলেন। বললেন, এবার সবাই বাড়ি ফিরতে পার।

আলেকজান্দার গাড়ির পেছন দিক দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যায় দেখছিল; সে আর কাউকে দেখতে পেলে না। গদিমোড়া আসনে মুখ গুঁজে সে সটান শুয়ে পড়ল।

আমার এই দুঃসময়ে আমাকে ছেড়ে যাবেন না, আস্তন ইভানিচকে আনা পাভ্লোভ্না বললেন, এখানে থাকুন, আমার সঙ্গে সন্ধ্যার আহার করবেন।

নিশ্চয়ই মাদাম, আমি রাতের আহারও করব, অবশ্য যদি আপনার ইচ্ছা হয়।

আপনি রাতেও এখানে থাকতে পারেন।

কি করে থাকব? কাল যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

তাই না কি! বেশ তো, আপনাকে জোর করছিনে। ফেদোসিয়া পেত্রভ্নাকে আমার ভালবাসা জানাবেন, বলবেন আমি ওর দুঃখে সত্যই দুঃখিত। নিজেই দেখা করতে যেতাম—যদিনা ঈশ্বর আমাকে এই দুঃখ না দিতেন—আমার ছেলেকে যদি এইমাত্র বিদায় দিতে না হোত!

আমি তাঁকে বলব, নিশ্চয়ই বলব।

শাসেঙ্কা, বাছা আমার? চারিদিকে চেয়ে আনা বলে উঠলেন। ও তো চলে গেল, চোখের আড়াল হয়ে গেল!

আনা পাভলোভ্না সারাদিন নিঃশব্দে বসে কাটালেন, সন্ধ্যার বা রাতের খাওয়া হল না। কিন্তু আস্তন ইভানিচ বক্‌বক করলেন, সন্ধ্যা আর রাতের খাওয়াও তাঁর সমাধা হল।

আনা শুধু মাঝে মাঝে বলতে লাগলেন, এখন আমার বাছা কোথায়?

এখন নিশ্চয়ই নেপলিউওভোতে পৌঁচেছে। না, না, কি বলছি? এখনো নেপলিউওভোতে পৌঁছয়নি, কাছাকাছি এসেছে। ওখানে গিয়ে চা খাবে। আস্তন ইভানিচ উত্তর দিলেন।

না, না, ও এসময় কিছুই খায় না;

এমনি করেই আনা পাভ্লোভ্না মনে মনে আলেকজান্দারের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর হিসেব-মতো যখন আলেকজান্দারের পিটার্সবুর্গে পৌঁছনো উচিত, তখন তিনি প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। তাস নিয়ে ভাগ্য গণনায় বসলেন—মারিয়া কার্পোভনার কাছে আলেকজান্দারের গল্প করতে লাগলেন।

আর আলেকজান্দার?

আমরা এর পরেই পিটার্সবুর্গে তার দেখা পাব।

দুই

পিওতর ইভানোভিচ আদুয়েভ—আমাদের নায়কের পিতৃব্য। ভ্রাতুষ্পুত্রের মত তিনিও বিশ বছর বয়সে পিটার্সবুর্গে যান। আলেকজান্দারের বাবা তাঁর বড় ভাই, তিনিই তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। আর সেখানে তিনি এক নাগাড়ে সতেরো বছর কাটিয়েছেন। ভাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি আত্মীয় স্বজনদের কাছে চিঠি লেখা বন্ধ করে দেন। তাই তাঁর সামান্য জমিদারী বিক্রি করার সময় থেকে আনা আর তাঁর কোনো খবর পান নি, এই জমিদারী আনার নিজের গ্রাম থেকে বেশিদূরে ছিল না।

পিটার্সবুর্গে তিনি পয়সাওলা মানুষ বলে পরিচিত, হয়তো তার যথেষ্ট কারণও আছে। কতকগুলি বিশেষ কাজের ব্যাপারে কয়েকজন হোমরা-চোমরা লোকের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ আছে। তিনি ফ্রক-কোটের বোতামের ঘরে কয়েকটা সম্মান-চিহ্নের ফিতেও পরে থাকেন। একটা বড় রাস্তায় তিনি থাকেন, ভাড়াও নিয়েছেন একখানি চমৎকার ফ্লাট। তিনটি চাকর আর ঘোড়াও রেখেছেন কয়েকটি। বৃদ্ধ লোক তিনি নন, যেটাকে 'জীবনের প্রথম ভাগ' বলা হয় সেই বয়সে এসে গেছেন—পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে তাঁর বয়েস। কিন্তু বয়সের কথা তিনি বলতে ভালবাসেন না, সেটা তুচ্ছ অহংকারের ব্যাপার নয়, বরং সুচিন্তিত গণণার ফল, যেন তিনি নিজের জীবনটা কম প্রিমিয়ামে বীমা করতে চান। সে যাই-ই হোক, বয়স গোপন করার মধ্যে কখনো স্ত্রীজাতিকে সন্তুষ্ট করার ব্যর্থ ইচ্ছা তাঁর দেখা যায় না।

দীর্ঘ দেহ, সুঠাম পুরুষ তিনি—তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন দীর্ঘ, তেমনি সুপুষ্ট; তাঁর মুখে মসৃন অলিভ-শ্যামশ্রী। তাঁর ভাবভঙ্গী, ব্যবহার সংযত কিন্তু সুন্দর। এমনি মানুষকেই বলা হয় সেরা ভদ্রলোক।

তাঁর ভাবলক্ষণ প্রকাশও সংযত, তাতে আত্মসংযম দেখা যায় আর দেখা যায় এমন দৃঢ়তা যাতে মুখখানা আত্মার আরশী হয়ে উঠতে পারে না। তাঁর মতে ঐটে হলেই তাঁর নিজের এবং অপরের পক্ষে অসুবিধেরই কারণ

হত। এমনি ভাবেই তিনি সমাজে দেখা দেন। কিন্তু তাঁকে যদি হাস্ত-মুখ বলে বর্ণনা করা হয়, সে তো ভুলই হবে—তিনি মানুষটি শুধু প্রশান্ত, মাঝে মাঝে অবশ্য, ক্লান্তির রেখা তাঁর মুখে দেখা যায়—সেটা যে অতি পরিশ্রমের ফল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি একজন কর্মঠ এবং কার্যকুশল লোক বলে পরিচিত। সবসময়েই বেশভূষায় নিখুঁত, এমন কি বাবুগিরির সীমায় গিয়েই পৌঁছান। কিন্তু কখনো রংবেরং সাজেন না, সবসময়েই রুচি-মাফিক তাঁর সাজ। তাঁর লিনেন সবচেয়ে সরেশ; হাত দুখানি নধর আর সাদা, নখগুলি লম্বা আর গোলাপী।

সেদিন সকালে জেগে উঠে ঘণ্টি টিপে চাকরকে ডাকলেন। চাকর জোরাই চায়ের সঙ্গে তিনখানা চিঠি নিয়ে এল। সে খবর দিলে আলেকজান্দার ফিওদরিচ আদুয়েভ নামে একজন যুবক পিতর ইভানিচকে খুড়ো বলে দাবী জানিয়ে গেছেন, তিনি একবার এসেছিলেন, আবার বেলা বারোটায় আসবেন।

পিতর ইভানিচ স্বভাবত শান্তভাবেই খবরটা শুনলেন, কিন্তু মন দিয়েই শুনলেন, ভ্রূ উঠে এল।

আচ্ছা! তুমি যেতে পার, খানসামাকে বললেন।

একখানা চিঠি তুলে নিলেন, খুলতে গিয়ে থেমে গেলেন। যেন চিন্তায় তিনি বিভোর।

গ্রাম থেকে এল ভাইপো—একটু অবাক ব্যাপার বইকি—তবে তিনি অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন আমি তো ভেবেছিলাম, ওরা আমার কথা ভুলে গেছে। যাহোক, আমি ভদ্রতা দেখাতে যাব না। আমি ওকে বিদায় দেব।

তিনি আবার ঘণ্টি বাজালেন।

ভদ্রলোক এলে বলে দিয়ো, আমি উঠেই কারখানায় গেছি। ফিরতে মাস তিনেক দেরী হবে।

জী হুজুর খানসামা বললে। উপহারগুলোর কি হবে?

উপহার কিসের?

ওর খানসামা উপহার এনেছে—সে বললে, ঠাকরুণ পাঠিয়েছেন গ্রাম থেকে।

উপহার?

হাঁ—এক পাত্তর মধু, এক বস্তা শুকানো গোলাপ জাম।

পিতর ইভানিচ কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন।

দুখানি বড় বড় লিনেনের থান, কিছু মোরব্বা।

লিনেন কেমন হবে বুঝতেই পারছি!

লিনেন ভালই হুজুর। মোরব্বাও সিরাপ দিয়ে তৈরী।

বহুৎ আচ্ছা। এখন যাও! আমি ওগুলো এখুনি দেখছি। তিনি একখানা চিঠি তুলে নিয়ে খুলে ফেললেন। চোখ বুলিয়ে গেলেন পাতাটির উপর। অতীতদিনের স্নাভদেশীয় সনন্দ বলে মনে হয়, একটি যতিচিহ্নও নেই। আবৃত্তের ভঙ্গিতে পড়তে লাগলেন, অর্ধোত্থিত তাঁর স্বর।

প্রিয় মহাশয়, পিতর ইভানিচ,

আপনার পিতামাতার সহিত বন্ধুত্ব ছিল এবং আপনার শৈশবে আপনার সহিত বহুদিন খেলা করিয়াছি এবং আপনার গৃহে রুটি ও নুন খাইয়াছি বলিয়াই আপনার মৎপ্রতি সদয় ব্যবহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে সাহসী হইয়াছি—এই আশা আছে যে, আপনি সেই পুরানো দিনের ভ্যাসিলি টিখোনিচকে ভুলিয়া যান নাই। আমার গৃহের সকলে আপনার এবং আপনার পিতামাতার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি।

স্বাক্ষরিত নামের দিকে তাকিয়ে পিতর ইভানিচ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, কে লোকটা? কার কাছ থেকে এল? ভ্যাসিলি জায়েহালভ! কি মুশকিল—মনে করতে পারছি না! কি চায় ও?

আবার পড়তে লাগলেন—

আমার এই বিনীত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবেন না! পিটার্সবুর্গ আর গ্রাম সমান নহে। গ্রামে আমরা সকলে সকলের কথা জানি, সকলকিছুই সেখানে প্রিয় এবং পরিচিত। আমার উপর একটি অভিশপ্ত মামলা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আজ প্রায় সাতবৎসর ধরিয়া এই মামলা লড়িতেছি। আমাদের গ্রাম হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র বনটির কথা কি আপনার মনে আছে? ক্রয়ের ব্যাপারে আদালত ভুল করিল এবং আমার শত্রু মেদভেদেভ সেই ভুলের সুযোগ লইয়াছে—আইনের ধারাটিই ভুল—সে বলিতেছে। সেই মানুষটিই মেদভেদেভ যে বিনা অনুমতিতে আপনাদের পুকুরে মাছ ধরিত। আপনার স্বর্গত পিতা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন,

লজ্জাও দিয়াছিলেন—তিনি তাহার এই ঔদ্ধত্যের জন্য লাটসাহেবের নিকট নালিশ করিবেনও ভাবিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার ছিল বড়ই দয়ার শরীর—ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিন!—তাই তিনি তাহা করেন নাই। যদিও ঐরূপ বদমায়েসকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। পিওর ইভানিচ, আমাকে সাহায্য করুন! মামলা সীনেটে উঠিয়াছে, কোন দপ্তরের ব্যাপার, কাহার হাতে জানিনা কিন্তু ইহা নিশ্চিত জানি, আপনাকে তাহারা তৎক্ষণাৎ দেখাইবে। সেক্রেটারী এবং সীনেটের সদস্যদের নিকট যান, আমার পক্ষে তাহাদের আবেদন করুন, বলুন, আমি ভুলের শিকার মাত্র — বিক্রয়-আইনের একটি ভুলে এইরূপ হইয়াছে। আপনার জন্য উঁহারা সবকিছু করিবে। এই কাজ করিবার সময় আমার জন্য তিনটি পেটেণ্ট……আর একটি অতি জরুরী অনুরোধ আপনার নিকট করিব পিওর ইভানিচ—একজন নিষ্পাপ নিগ্রহভোগকারীর অনুভূতির সহিত পরিচিত হইয়া আমাকে পরামর্শ এবং কাজে সাহায্য করিবেন। জেলা শাসন বিভাগে একজন প্রিভিকাউন্সিলর আছেন—তাঁহার নাম প্রকভ—তিনি মানুষ নন, দেবদূত। তিনি মরিবেন তবু বন্ধুকে ত্যাগ করিবেন না। শহরে তাঁহার বাড়িটি যেমন চিনি, তেমনটি আর কাহারও বাড়ি চিনি না। যে-মুহূর্তে শহরে গিয়া পৌঁছাই, সোজা তাঁহার নিকট যাই—সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁহার ওখানে কাটাই—অন্য কোথাও থাকিবার কথা কখনো স্বপ্নেও ভাবি না। তিনি অতিথি সৎকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। আমরা খাওয়া-দাওয়ার পরে অনেক রাত পর্যন্ত বষ্টন খেলি। এহেন মানুষ নিন্দিত হইয়াছেন, বাধ্য হইয়া পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন! যত হোমরা-চোমরা লোক আছে, বন্ধু, তাঁহাদের নিকট যান—গিয়া বলুন আফানসি ইভানিচ কিরূপ লোক। তিনি যে কাজের ভার নেন, তাহাই সফল হয়। তাঁহার সম্পর্কে যে খবর তাহা মিথ্যা, লাটবাহাদুরের সেক্রেটারী তাহা বিকৃত করিয়াছে। তাঁহারা আপনার কথা শুনিবেন এবং আমাকে পত্রের ডাকে উত্তর দিবেন। আমার পুরানো দিনের সহকর্মী কোভিয়াকভের সহিত দেখা করিবেন। এইখানে একটি লোক আসিয়াছিল—তাহার নাম, স্মেনিৎসিন—আপনাদের পিটার্সবুর্গেরই মানুষ—হয়তো চিনিতেও পারেন। সে পেস্কীতে (পিটার্সবুর্গের শহরতলী) থাকে। তাহার বাড়ি যে কোন বালকও দেখাইয়া দিবে।

পরের ডাকে পত্র দিবেন, বিলম্ব করিবেন না। তিনি জীবিত এবং সুস্থ আছেন কিনা এবং এখন কি করিতেছেন, আমাকে মনে আছে কিনা—তাহা জানাইবেন। তাহার সহিত আলাপ করিবেন, মিতালি পাতাইবেন। তিনি চমৎকার মানুষ—যেমন দিলখোলা, তেমনি আমুদে।

আর একটি সামান্য অনুরোধ করিয়া চিঠি শেষ করিতেছি······চিঠির শেষটা না পড়েই আহ্‌মেত ধীরে ধীরে চার টুক্‌রো করে ফেললেন, টেবিলের নীচে বাজে কাগজের টুকরিতে ফেলে দিলেন। এবার হাত পা ছড়িয়ে হাই তুলছেন।

আর একখানা চিঠি বেছে নিয়ে আবার তেমনি অর্ধোত্থিত স্বরে পড়তে শুরু করেছেন।

প্রিয় ভ্রাতা—মাননীয় পিতর ইভানিচ মহোদয়,

এ আবার কোন বোন! আহ্‌মেত স্বাক্ষরের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন। মারিয়া গোর্বাতোভা। ছাদের দিকে চেয়ে মনে করতে চেষ্টা করলেন।

কি ব্যাপার? চেনা চেনা ঠেকছে—ও-হাঁ! আমার ভাই এক গোর্বা-তোভাকে বিয়ে করেছিলেন বটে, এ তাঁরই বোন হবে—সেই যে······হাঁ মনে পড়ছে! আবার ভ্রূ কুঁচকে পড়তে লাগলেন।

যদিও ভাগ্য হয়তো চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, আমাদের মধ্যে এখন উপসাগরের ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে···বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

কয়েক ছত্র বাদ দিয়ে আবার পড়তে লাগলেন।

আমার শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত আমি মনে রাখিব, কেমন করিয়া আমরা দুইজনে আমাদের হ্রদের চারিদিকে বেড়াইতাম। আপনি জীবন বিপন্ন করিয়া, শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভবনা থাকিলেও হাঁটু অবধি জলে নামিয়া শরবনের মধ্যে যে বড় হলদে ফুলটি ফুটিয়াছিল, তাহা আনিতে গিয়াছিলেন। কি করিয়া সেই ফুলের ডাঁটির রস আমাদের হাত রাঙাইয়া দিয়াছিল। আপনি টুপীতে করিয়া জল আনিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে আমরা হাত ধুইতে পারি। কি রকম আমরা হাসিতাম! আহা, কি সুখীই ছিলাম তখন! আজও একখানি বইয়ের পাতার ভিতরে সেই ফুলটি আছে······

আহ্‌মেত থামলেন। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়লেন।

আবার পড়তে লাগলেন—এখনো কি সেই ফিতেটি আপনার কাছে আছে—আমার শত কান্না বা প্রার্থনা না শুনিয়া যেটি আমার নিকট হইতে চুরি করিয়া লইয়াছিলেন।

আমি ফিতে চুরি করেছি? তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, মুখে ভীষণ ভ্রূকুটি। আরো কয়েক ছত্র বাদ দিয়ে পড়তে লাগলেন।

আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি চিরদিন একা থাকিব, তাই আমার ভারী আনন্দ। কেহ তো আমার সেই সুখের দিনের স্মৃতিকে বাধা দিতে পারিবে না—

ওঃ এক আইবুড়ীর কাণ্ড! পিতর ইভানিচ মনে মনে বললেন, ইনকে ফুলের স্মৃতি জীইয়ে রাখবে আশ্চর্য কি! তারপর?

প্রিয় ভ্রাতা, আপনি কি বিবাহিত? যদি বিবাহ করিয়া থাকেন—কাহাকে করিলেন? কোন কোমলা বান্ধবী আপনার জীবনের পথে শোভা করিয়া আছেন। তাঁহার নাম আমাকে বলুন! আমি তাঁহাকে ভগিনীর মত ভালবাসিব, এবং আমার স্বপ্নে আপনার মূর্তির সহিত তাঁহার মূর্তির মিলন ঘটাইব। আমি আপনাদের দুইজনের জন্যই প্রার্থনা করিব। যদি আপনার বিবাহ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেন করেন নাই—খোলাখুলি জানাইবেন। আপনার গোপন কথা পড়িবে এমন কেহ এখানে নাই। আমার হৃদয়ে আমি তাহা রক্ষা করিব, আমার হৃৎপিণ্ডের সহিত তাহা একমাত্র কাড়িয়া লওয়া সম্ভব হইবে। আপনি বিলম্ব করিবেন না। আমি আপনার লেখা পড়িবার জন্য অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছি, ঐ লেখা তো কখনো মুছিয়া যাইবে না—

না, না, অধৈর্য হবার দরকার নেই—মুছে যাবে না—অমন কটিচক্র মিলবে না—পিতর ইভানিচ আপন মনে বললেন।

পড়তে লাগলেন তিনি :

আমি জানিতাম না যে, আমাদের প্রিয় শাসা হঠাৎ রাজধানীতে যাইবে বলিয়া ঠিক করিয়াছে-ভাগ্যবান সে! কত বড় বড় বাড়ি বড় বড় দোকান-পাট সে দেখিবে, সবরকম বিলাসিতা উপভোগ করিবে, তাহার আরাধ্য পিতৃব্যকে আলিঙ্গন করিবে, আর আমি কাঁদিব আর অতীত সুখের দিনের কথা স্মরণ করিব। আমি যদি তাহার যাওয়ার কথা জানিতাম, তাহা হইলে,

দিনরাত্রি বসিয়া আপনার জন্ত একটি আসন বুনিয়া দিতাম—একটি নিগ্রোর সঙ্গে দুইটি কুকুর নক্সাটিতে আঁকা হইত। ঐ নক্সাটি দেখিয়া কত যে কাঁদিয়াছি আপনি ধারণা করিতে পারিবেন না। বন্ধুত্বের চাইতে বিশ্বাসের পাত্র আর কি আছে? আমার এখন একমাত্র চিন্তা—আমার দিনগুলি ঐ কাজেই কাটাইব। কিন্তু এখানে ভাল পশম পাওয়া যায় না। তাই আমার বিনীত অনুরোধ, হে আমার প্রিয় ভ্রাতা—নক্সাটির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সবচেয়ে ভাল বিলাতী পশম পাঠাইবেন। নক্সাটি এই পত্রের মধ্যে রহিল। যত শীঘ্র পারেন পাঠাইবেন, সেরা দোকান হইতে কিনিয়া পাঠাইবেন। কিন্তু কি করিয়া আর লিখিব? একটি ভয়ানক কথা মনে হইতে কলম থামিয়া গেল। হয় তো, আমাদের আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। কেনই বা আমার মত দুঃখিনীকে মনে রাখিবেন—সে তো সমাজ হইতে বহুদূরে কাঁদিয়া জীবন কাটাইতেছে। কিন্তু না! আর সবার মত আপনি অমন নিষ্ঠুর হইবেন, ভাবিতেও পারি না। না, না! আমার মন বলিতেছে, রাজধানীর বিলাস আর আনন্দের মধ্যে আপনি এখনো আমাদের প্রতি পূর্বের অনুরাগ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এই চিন্তাই আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে একমাত্র শান্তির প্রলেপ। আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি আর লিখিতে পারিতেছি না। হাত কাঁপিতেছে।

মরণ অবধি আপনারই

মারিয়া গোর্বাতোভা

পুঃ ভ্রাতঃ, আপনার নিকট কি ভাল বই আছে? যদি আপনার দরকারে না লাগে, আমাকে কয়েকখানি পাঠাইবেন। প্রতি পৃষ্ঠায় আপনার কথা আমার মনে পড়িবে, আমি কাঁদিব। অথবা বেশী দামী না হইলে দোকান হইতে নূতনও কিনিতে পারেন। লোকে বলে, মিঃ লাগেচ্কীন আর মিঃ মালিনিস্কী কয়েকখানি ভারী চমৎকার উপন্যাস লিখিয়াছেন—উহার যেকোন একখানি দিলেই হইবে। আমি খবরের কাগজে মিঃ পুজিনীর "কুসংস্কার প্রসঙ্গে"—নামে একটি বইয়ের কথা পড়িয়াছি—ঐ বইখানি পাঠাইবেন। আমি কুসংস্কার সহিতে পারি না।

শেষ করে আহ্‌মেত-এর প্রথমে ইচ্ছা হ'ল চিঠিখানা ছুঁড়েই ফেলে দেন, কিন্তু তা করলেন না।

না, আপন মনে বললেন, আমি এখানি রাখব। অনেক লোক এমনি চিঠি পছন্দ করে। নিয়মিত একটি সংগ্রহ গড়ে ওঠে। এই চিঠি দিয়ে কাউকে বাধ্য-বাধকতায় ফেলা চলবে।

দেওয়ালে পুঁতি-বসানো একটা টুকরি ঝুলছিল, তার ভিতরে চিঠিখানা ফেলে দিলেন। তারপর তৃতীয় চিঠি।

পড়তে লাগলেন, আমার প্রিয় দেবর, পিতর ইভানিচ।

আপনার কি মনে পড়ে, কিরূপ ভাবে আপনাকে আমরা সতেরো বৎসর পূর্বে বিদায় দিয়াছিলাম? এখন আবার আমার নিজ সন্তানকে আশীর্বাদসহ সুদীর্ঘ যাত্রাপথে প্রেরণ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে আদেশ করিয়াছেন। হে বন্ধু, তাহার প্রতি নজর রাখিবেন, মৃত প্রিয়জন, আমাদের অমূল্য ফিওদর ইভানিচের কথা স্মরণ রাখিবেন, শাসেন্কা তাঁহারই প্রতিচ্ছবি। ঈশ্বরই জানেন, আমার মাতৃহৃদয়ে তাহাকে বিদেশে যাইতে দিতে কি হইতেছে। আমার বাছাকে সোজা আপনার নিকট পাঠাইতেছি। আপনার সহিত ছাড়া আর কাহারও সহিত তাহাকে বসবাস করিতে বলি নাই।

আদুয়েভ মাথা নাড়লেন।

বুড়ীর যত কাণ্ড! ঘোঁৎঘোঁত করে উঠে আবার পড়তে লাগলেন।

তাহার অনভিজ্ঞতার দরুণ সে হয়ত সরাইখানায়ই উঠিত, কিন্তু আমি জানি উহাতে তাহার পিতৃব্য কিরূপ আঘাত পাইবেন—তাই সোজা আপনার নিকট যাইতে বলিয়াছি—আহা, কি আনন্দের মিলনই না হইবে! আপনার পরামর্শ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবেন না আমার প্রিয় ঠাকুরপো, আপনার পক্ষপুটে তাহাকে আশ্রয় দিবেন। তাহাকে আপনার হস্তেই সমর্পণ করিতেছি।

আবার পিতর ইভানিচ থামলেন। পড়তে লাগলেন।

আপনি ছাড়া তাহার আর কেহ নাই। তাহার তত্ত্ব-তালাস লইবেন, তাহাকে মাটি করিবেন না—কিন্তু খুব কড়াও হইবেন না। সমালোচনার লোকের অভাব হয় না, অপরিচিতদের তো উহার জন্যই সৃষ্টি; কিন্তু আপনজন স্নেহ দেখাইতে জানে, আর সে স্নেহভাজন ছেলেও বটে; শুধু তাহাকে একবার দেখিলেই আর কখনও তাহাকে ছাড়িতে চাহিবেন না। কাজে লাগিলে, তাহার উপরওয়ালাকে বলিবেন, তিনি যেন শাসেন্কাকে একটু

দেখেন এবং তাহার সহিত সদয় ব্যবহার করেন। সে অতিশয় স্পর্শাতুর তাহা আপনি জানেন। মদ আর তাস হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন—পাশেহার চিৎ হইয়া শোওয়া অভ্যাস—আর তাহাতে সে গোঙায় আর ছটফট করে। আহা বেচারী! আপনি তাহাকে ধীরে ধীরে জাগাইবেন; তাহার উপর ক্রুশের চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিবেন—অমনি গোঙানি ও ছটফটানি দূর হইবে। গ্রীষ্মকালে তাহার মুখ রুমাল দিয়া ঢাকিয়া দিবেন। মুখ ঘুমের মধ্যে খুলিয়া যায় আর ঐ দুষ্ট মাছিগুলি ভোরের দিকে তাহার মুখে ঢুকিয়া পড়িতে পারে। যদি তাহার টাকার প্রয়োজন হয়, কখনো না বলিবেন না।

আন্দ্রেভ ভ্রূকুটি করলেন, কিন্তু আবার পড়তে পড়তে মুখখানি নির্মল হয়ে উঠল।

যাহা যাহা প্রয়োজন, আমি পাঠাইব। এক হাজার রুবল তাহাকে দিয়াছি, উহা সে নিকটে রাখিবে। আজেবাজে জিনিস কিনিয়া ঐ টাকা ব্যয় করিতে দিবেন না—কোন তোষামুদে বদমায়েশের হাতে না পড়ে তাহাও দেখিবেন। বহু জুয়াচোর ও বদমায়েশ নিশ্চয়ই রাজধানীতে আছে। সর্বশেষে প্রিয় ঠাকুরপো, আমাকে ক্ষমা করিবেন—কি করিয়া চিঠি লিখিতে হয় প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি।

বিনীত

ভবদীয়

ভ্রাতৃবধূ

এ, আন্দ্রেভা

পুঃ আমাদের গ্রাম্য কয়েকটি উপহার পাঠাইতেছি—আমার বাগানের গোলাপ জাম, অশ্রুর মত বিশুদ্ধ সাদা মধু, দুই ডজন সার্টের কাপড় আর ঘরে তৈরী কিছু মোরব্বা পাঠাইলাম। এই সকলই ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকুক ইহাই আমার কামনা। যখন ঐগুলি ফুরাইয়া যাইবে, আবার কিছু পাঠাইব। ইভেনিরও একটু তত্ত্ব-তালাস লইবেন। সে বাধ্য, মদ খায় না, কিন্তু রাজধানীতে গিয়া বিগড়াইয়া যাইতে পারে। যদি যায়, চাবকাইবেন।

পিওত্র ইভানিচ ধীরে ধীরে চিঠিখানি টেবিলের উপর রেখে দিলেন।

আরো ধীরে ধীরে; একটা চুরুট বার করে দুহাতে পাকিয়ে ধূমপান করতে লাগলেন। তাঁর ভ্রাতৃবধূ যে চালটি খেলেছেন, সেই কথাই বহুক্ষণ ভাবতে লাগলেন। একে তিনি মনে মনে চাল বলেই মনে করেন। তিনি পরিস্থিতিটির একটি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করে ফেললেন, আর কি করবেন তাও ঠিক হয়ে গেল।

তিনি ব্যাপারটা নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করলেন ;—ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি চেনেন না, তাই তাকে ভালবাসাও সম্ভব নয় আর, তাই মনে তার প্রতি কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। যে কোনো সিদ্ধান্তই যুক্তি এবং ন্যায়পরায়ণতার আইনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই বিয়ে করেছিলেন, দাম্পত্য জীবনের সুখও তিনি পেয়েছিলেন, আর তিনি পিতর ইভানিচ—যিনি বিবাহিত জীবনের কোন সুযোগ-সুবিধেই পাননি—তিনি কেন ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য ভাবনা করে নিজেকে ভারাক্রান্ত করবেন? এমন কোনো কারণ নেই যার জন্তে তাঁকে তা করতে হবে।

অন্যদিকে পরিস্থিতিটা এই ভাবেও দেখা যায়—মা তাঁর ছেলেকে সোজা তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন, তার উপরে ভার দিয়েছেন—এ ভার নিতে তিনি চান কি চান না তাও জানেন না। এমন কি তিনি বেঁচে আছেন কিনা, ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্ত কিছু করবার মত তাঁর যোগ্যতা আছে কিনা তাও জানেন না। এটা অবশ্য নির্বুদ্ধিতা, কিন্তু যখন ব্যাপারটা হয়েই গেছে, এবং ভ্রাতুষ্পুত্রও পিটার্সবুর্গে এসে গেছে, আর তাকে সাহায্য করবারও কেউ নেই—কোন বন্ধু, এমন কি কারো কাছে পরিচয়-পত্রও না—আর সে যখন ছোকরা, একেবারে আনাড়ি……তখন কি তাকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে—তাকে কি অগণিত জনতার মধ্যে পরামর্শ বা উপদেশ ছাড়া ছুঁড়ে ফেলে দেবেন? যদি একটা মন্দ কিছুই হয়, পিতর ইভানিচকে কি নিজের বিবেকের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে না?

এইবার আদুয়েভ মনে না করে পারলেন না—তাঁর মৃত ভ্রাতা আর এই আনা পাভলোভনা সত্তেরো বছর আগে কি করে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন। পিটার্সবুর্গে তাঁর জন্তে তাঁরা কিছু নিশ্চয়ই করতে পারতেন না, তিনি নিজেই নিজের পথ করে নিয়েছেন……কিন্তু বিদায়ের সময় আনার চোখের জলের কথা মনে হ'ল। মার মত আশীর্বাদ করেছিলেন আনা। আদরের কথা, পিঠের কথা আর বিদায়কালের কথাগুলিও মনে পড়ল। শাসেকা যখন বড়

হবে—তখন সে তিন বছরের শিশু—তাই, তুমি হয়তো তার উপর নজর হবে। ভাবনার এই স্তরে পিতর ইভানিচ উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি হলে ছুটে গেলেন।

ভ্যাসিলি, চেঁচিয়ে বললেন, যখন আমার ভাইপো আসবে, তাকে ভিতরে নিয়ে এস, আর দেখ তো উপরে এখনো ঘরভাড়া আছে কিনা। যদি থাকে. ওদের বলো—আমি নেব। আর এই উপহারগুলো! এগুলো নিয়ে কি করব?

ভাণ্ডারী উপরে নিয়ে যেতে দেখেছে। সে জিজ্ঞেস করলে, মধু আমরা বেচবো কিনা। বললে—ভাল দাম দেব। গোলাপ জামও সে নেবে।

চমৎকার! ওগুলো সে নিয়ে নিক! কিন্তু কাপড়ের কি হবে? অড় হতে পারে? তাহলে রেখে দাও। আর মোরব্বাও রেখে দাও—খাওয়া যাবে। ভালই তো মনে হচ্ছে।

পিতর ইভানিচ সবে দাড়ি কামাতে শুরু করবেন, এমন সময় আলেকজান্দার ফিওদরিচ এল। পিতৃব্যের গলাই সে জড়িয়ে ধরত, কিন্তু পিতর ইভানিচ যুবকের কোমল হাতখানি নিজের শক্ত মুঠোয় পুরে ওকে তফাতেই রাখলেন—যেন ওকে ভাল করে দেখতে চান এমনি তাঁর ভাবখানা। আসলে তিনি ওর উচ্ছ্বাসকে সংযত করবার জন্ত করমর্দনের চৌহদ্দীর মধ্যেই রাখতে চাইলেন।

তোমার মা ঠিকই বলেছেন, বললেন, তুমি আমার মৃত ভ্রাতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আমি তোমাকে যে কোন জায়গা থেকে চিনে বার করতে পারতাম। কিন্তু তুমি দেখতে তাঁর চেয়েও ভাল। তোমার সঙ্গে ভদ্রতা করব না—আমি দাড়ি কামাচ্ছি, তুমি ওখানে বসো, আমার উলটো দিকেই বসো যাতে আমি দেখতে পাই। আলাপ চলুক!

এই বলে পিতর ইভানিচ তার কাজ করতে লাগলেন, যেন কেউ কাছে নেই তার।

চোয়ালে সাবান ঘসলেন। জিভ পুরে গালা করে দুইগাল ফুলোলেন। আলেকজান্দার এ হেন অভ্যর্থনা পেয়ে অপ্রতিভ, কি করে আলাপ শুরু করবে ভেবে পেলে না। পিতৃব্যের এই শীতল ব্যবহারের কারণ সে এই বার করল—সে কেন তৎক্ষনাৎ এসে তার বাড়িতে উঠেনি।

তোমার মা কেমন আছে? ভাল আছেন? নিশ্চয়ই অনেক বয়েস হয়েছে—পিতৃব্য আয়নায় মুখভঙ্গী করতে করতে শুধালেন।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় মা ভাল আছেন। তিনি আপনাকে সম্ভাষণ জানিয়েছেন—আমার মাসী মারিয়াও জানিয়েছেন, আলেকজান্দার ভয়ে ভয়ে বললে। আমার মাসী তো তাঁর হয়ে একটা চুমু দিতে বলেছেন! সে উঠে পড়ে পিতৃব্যের কাছে গেল—গালে, মাথায়, কাঁধে যেখানে হয় চুমু খাবে।

তোমার মাসীর বয়েস হয়েছে, তাঁর বুদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেখছি বিশ বছর আগেকার সেই খোকাটিই আছেন।

বিব্রত আলেকজান্দার পিছু হটে তার জায়গায় চলে এল।

কাকা, আপনি কি তাঁর চিঠি পেয়েছেন? সে শুধালো।

হাঁ, পেয়েছি।

আলেকজান্দার ফিওদরিচ বললে, ভ্যাসিলি তিখোনিচ জায়েজালভ আপনাকে তার মামলাটা সম্পর্কে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। আর—

হাঁ, তার কাছ থেকে একখানা চিঠিও পেয়েছি, এখনো কি গ্রামদেশে অমন গাধা আছে?

আলেকজান্দার কি বলবে ভেবে পেল না—এহেন অভ্যর্থনা পেয়ে সে এমনি হতভম্ব হয়ে গেছে।

কাকা, আমাকে মাপ করবেন, সে শুরু করলে। দুরু দুরু বুঝি কাঁপছে তার বুক।

কেন?

আপনার কাছে সোজা উঠিনি, হোটেলে উঠেছি, আপনি কোথায় থাকেন তা জানতাম না।

এর জন্যে মাপ চাইচ কেন? খুব ভালই করেছ। তোমার মা কি ভেবেছিলেন কে জানে! তোমাকে কোথায় থাকতে দিতে পারব না জেনে কি করে তুমি আমার কাছে আসতে। তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ, এটা একটা অবিবাহিত মানুষের বাসা—একজনের পক্ষেই মানায়। অভ্যর্থনা করবার ঘর, বসবার ঘর, খাবার ঘর, আপিস ঘর, পোশাক ঘর, স্নানের ঘর, একটাও বাড়তি ঘর নেই। এখানে থাকলে আমি তোমার অসুবিধের কারণ হব,

তুমিও হবে আমার। কিন্তু আমি তোমার জন্যে বাড়তি একটা ঘর রেখে রেখেছি।

কাকা, আলেকজান্দার চেঁচিয়ে উঠল। আপনার এত দয়া—কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব?

আবার সে লাফিয়ে উঠে পড়ল, কাজে, কথায় তার বাধ্যবাধকতা প্রমাণ করবে এই তার ইচ্ছা।

না, না অতো তাড়াতাড়ি নয়—আমাকে এখন ছুঁয়োনা, খুড়োমশাই বলে উঠলেন। খুরখানা বড় ধারালো, সাবধান না হলেই তোমারও কাটবে, আমারও কাটবে!

আলেকজান্দার বুঝতে পারলে, যতই চেষ্টা করুক সে আজ কিছুতেই তার পূজ্যপাদ পিতৃব্যকে আলিঙ্গন করে বুকে চেপে ধরতে পারবে না। তাই সে এই কাজটি অন্য সময়ের জন্য মুলতুবী রাখলে।

পিতর ইভানিচ বলতে লাগলেন, চমৎকার ঘর! জানালাগুলো যদিও একটা দেওয়ালের দিকে মুখিয়ে আছে, কিন্তু তুমি তো সারাদিন জানালায় বসে কাটাবে না। বাড়িতে যখন থাকবে, ব্যস্তই থাকবে—জানালা দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকার সময়ই পাবে না। তাছাড়া ভাড়াও চড়া নয়—মাসে মাত্র চল্লিশটি রুবল। হলঘরে খানসামার থাকার জায়গা হবে। শুরু থেকেই একা থাকা তোমাকে শিখতে হবে, যখন দাই-মা ছাড়াই থাকতে হবে। নিজের খাবারের টেবিল, চায়ের সরঞ্জাম সবকিছুর নিজেই ভার নেবে, এক কথায়, ফরাসীরা যেমন বলে তোমার নিজের গৃহকোণ—ঠিক তেমনটি চাই। যে কাউকে সেখানে অভ্যর্থনা করে আনতে পারবে। অবশ্য, আমি যখন বাড়িতে খাব, তখন সব সময়েই তুমি আসবে। অন্যসময়ে—এখানকার যুবকেরা হোটেলে খায়—কিন্তু তোমাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি—খাবার আনিয়ে নেবে। ঘরে বেশ নিরিবিলি হবে, যার-তার সঙ্গে বসে খেতে হবে না। কি আমার সঙ্গে একমত তো?

কাকা, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ!

কৃতজ্ঞতার কারণই নেই। আমরা আত্মীয়—তাই না? আমি আমার কর্তব্য করছি। আমাকে এখনি পোশাক পরে বেরুতে হবে। কাজ আছে, কারখানা আছে।

কাকা, আপনার কারখানা আছে জানতাম না।

কাচ আর চীনেমাটির কারখানা। কিন্তু আমার একার নয়, দুজন অংশীদার আছে।

ভাল চলছে?

মন্দ নয়। দূরের প্রদেশগুলির মেলায় আমরা বিক্রি করি। গত কয়েক বছর ধরে বেশ ভালই হচ্ছে। যদি এমনি পাঁচ বছর চলে, আমরা দাঁড়িয়ে যাব। আমাদের একজন অংশীদার খুব একটা নির্ভরযোগ্য লোক নয়—তা যতই অমিতব্যয়ী হোক, আমি তাকে কবজায় রাখতে জানি। আচ্ছা, এস! শহরটা দেখ, ঘোর ফেরো, কোথাও খেয়ে নিও! বিকেলে চায়ের সময় আমার এখানে এস—বাড়ি থাকব। তখন আসল আলাপ হবে। ভ্যাসিলি, ভদ্রলোককে তাঁর কামরা দেখিয়ে স্থিত হতে সাহায্য কর।

নিজের ঘরে একা বসে আলেকজান্দার আপন মনে বলে উঠল, এই তাহলে পিটার্স বুর্গের রীতি, নিজের কাকাই যদি এমনি হয়, অপরিচিতেরা কেমন হবে কে জানে!

তরুণ আড়ুয়েভ পায়চারী করতে লাগল। গভীর চিন্তায় সে মগ্ন। ইভেসি ঘর গোছাতে গোছাতে আপন মনে বকছে।

এ কেমন ধারা ব্যাপার গো? সে খোঁত খোঁত করছে। ওরা বলে, পিতর ইভানিচের রসুইঘরে মাসে একবার উনুন ধরানো হয়, লোকে বেশীর ভাগই বাইরে খায়। হা ঈশ্বর, আচ্ছা মানুষ তো সব! একথা আমাকে বলতেই হবে। এরা নিজেদের পিটার্স বুর্গের মানুষ বলে! আমাদের ওদিকে কুকুরগুলোরও নিজের নিজের থালা-বাসন আছে।

আলেকজান্দারও ইভেসির সঙ্গে বুঝি একমত কিন্তু কিছু বললে না। জানালার কাছে সে চলে এল। তার ভিতর দিয়ে দেখলে চিমনী, ছাদ, ইটের দেয়াল—ঝুলে কালো হয়ে আছে।···মাত্র দুসপ্তাহ আগে নিজের গ্রামের বাড়ির জানালা থেকে যে দৃশ্য দেখেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করলে। হতাশ হ'ল সে।

বেরিয়ে পড়ল সে—পথে সে দেখল লক্ষ্যহীন ব্যস্ততা—প্রতি লোকটাই ব্যস্তভাবে কোথাও না কোথাও চলেছে—নিজের কাজেই বিভোর—পথচারীদের দিকে তাকাচ্ছে কি তাকাচ্ছে না—যদি বা তাকাচ্ছে সে শুধু ধাক্কা

ব্যক্তি এড়াবার জন্য। জেলা-শহরের কথা তার মনে পড়ল। সেখানে পথে অতি মামুলি সাক্ষাৎও কিছু না কিছু কৌতূহল জাগায়। ইভান ইভানিচ পিতর পেত্রোভিচের সঙ্গে দেখা করতে যদি যায়,সারা শহর জানবে কেন এই সাক্ষাৎকার। মারিয়া মাভিয়েভ্‌না গীর্জা থেকে বেরুচ্ছেন, আকানসি সাভিচ মাছ ধরতে যাচ্ছে। একটা পুলিশ লাটবাহাদুরের বাড়ি থেকে পড়ি কি মড়ি ঘোড়া দাবড়ে ডাক্তারের বাড়িতে ছুটে আসছে—সবাই অমনি জেনে ফেললে—মহামান্য লাটবাহাদুরের পত্নী একটি শিশু-সন্তান প্রসব করেছেন। অথচ ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আর বুড়ীদের মতে, কারো একথা জানার কথা নয়। সবাই শুধায়—ছেলে না মেয়ে? মহিলারা তাদের সেরা কেপ বার করে বসেন। মাতভেই মাত্তভিইচ তার মোটা লাঠিটা নিয়ে যখন সন্ধ্যে ছটার সময় নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, সবাই জানে, তিনি সান্ধ্যকালীন ব্যায়াম করছেন, এ ছাড়া তাঁর হজম হয় না। তিনি বৃদ্ধ প্রিভিকাউন্সিলরের জানালার কাছে এসে থামতে ভুলবেন না। এই সময়টা কাউন্সিলর মশাই চা পান করে থাকেন। যার সঙ্গেই দেখা হয়, একটু সম্ভাষণ, ক'টি কথার আদান-প্রদান হয়। যদি সম্ভাষণ নাও কর, তুমি ঠিক জান লোকটি কে, সে কোথায় যাচ্ছে—কেন যাচ্ছে—আর তার চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পার—আমি জানি তুমি কে—কোথায় এবং কেন যাচ্ছ। এমন যদি হয়, দুজন অপরিচিত—কেউ কাউকে আগে কখনো দেখেনি—মুখোমুখী যদি পথে দেখা হয়ে যায়, তখন দুজনের মুখই জীবন্ত প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দেখা দেয়। ওরা থেমে পড়ে একবার 'কি দুবার পেছন ফিরে তাকায়। বাড়ি এসে অপরিচিতের পোশাক আর গতিভঙ্গীর বর্ণনা করে। আর অপরিচিতটি কে এবং কোথা থেকে এল, কেন এল—এই নিয়ে কত গবেষণাই চলে। কিন্তু এখানে, এই পিটার্সবুর্গে মানুষ পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়, ধাক্কা মারে।

প্রথম-প্রথম আলেকজান্দার গেঁয়ো মানুষের মত প্রতিটি পথচারী আর সুবেশধারী মানুষের মুখের দিকে কৌতূহলভরে তাকিয়ে থাকত—সে প্রতি-জনকে রাষ্ট্রের মন্ত্রী, বিদেশী দূত বা বিখ্যাত লেখক বলে ভাবত—সে অবাক হয়ে ভাবত—ইনিই কি সেই? এই কি সেই মানুষ—কিন্তু শীঘ্রই সে হাঁফিয়ে উঠল। প্রতিপদক্ষেপেই তার মন্ত্রী, লেখক আর কূটরাজনীতিবিদদের সঙ্গে দেখা হতে লাগল।

বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আরো হতাশ হয়ে গেল। একঘেয়ে পাথুরে প্রাকার বিরাট সমাধিমন্দিরগুলির মত একটানা চলে গেছে, তা দেখে মন বিষাদে ডুবে গেল। আপন মনে বললে—পথ যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন দেখার মত খানিকটা বিস্তৃতি মিলবে—একটা পাহাড়, কয়েকটা গাছ কি একটা ধসে-পড়া বেড়া নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু না—শুধু অবিকল তেমনি বাড়িগুলির পাথুরে দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই মেলে না। তেমনি বাড়ির সার—চার সারি করে তেমনি জানালা। আর এই পথ যখন শেষ হয়, ঠিক অমনি আর একটা শুরু হয়। ডাইনে বাঁয়ে যেদিকে তাকাও শুধু বাড়ি আর বাড়ি—পাথরের উপর পাথর, শুধু পাথর, এক দৈত্যবাহিনীর মতো যেন তোমাকে ঘিরে ধরে। চোখ একটু ফাঁকা পায় না, বিশ্রাম করতে পারে না—চারিদিক থেকে তুমি তখন পরিবেষ্টিত—মানুষের ভাবনা আর অনুভূতিও বুঝি এমনি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে।

গ্রাম্য মানুষের পিটার্সবুর্গ সম্পর্কে প্রথম ধারণা বিষণ্ণতাই নিয়ে আসে। সবকিছুই অদ্ভুত আর শোকাবহ বলে মনে হয়; কেউ তার দিকে লক্ষ্যও করেনা। সে এই মহানগরীতে হারিয়ে যায়; এই যে নূতনত্ব, বৈচিত্র্য আর জনতা এ তাকে ভোলাতে পারে না। এখানে যা কিছু দেখে আর বাড়িতে যা কিছু দেখেনি—তাদেরই বিরুদ্ধে তার গ্রামীন গর্বের সংঘাত শুরু হয়ে যায়। সে সবকিছু দেখে ভাবে, নিজের দেশের শহরে মনে মনে ফিরে যায়। সেখানে কি সুন্দরই না সব দেখায়। একটা বাড়ির ছাদ চূড়ার মত, একটা বাগান আকাশিয়া গাছে ভরতি। ছাদের উপর কোথাও দেখা যায় পোষা কবুতরদের আশ্রয়। ইভিউমিন মত্ত কবুতর-বিশেষজ্ঞ। তাই সে ছাদের উপর পায়রার খোপ তৈরী করে দিয়েছে। প্রতিদিন ভোরে আর সন্ধ্যায় সে ছাদে রাতের টুপী আর জোব্বা পরে দাঁড়িয়ে থাকে, নেকড়া বাঁধা একখানা লাঠি দোলায় আর শীষ দেয়। পরের বাড়িটা যেন একটা লণ্ঠন। চারিদিকে তার জানালা—চ্যাটালো ছাদ—ভারি পুরানো বাড়ি। দেখে মনে হয় এখুনি ধসে পড়বে বা স্বতস্ফূর্ত বিস্ফোরণে এখুনি পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। ছাদের কাঠগুলো হালকা ধূসর। অমন বাড়িতে থাকাও ভয়ের ব্যাপার—কিন্তু মানুষ তবু থাকে। মালিক মাঝে মাঝে চালু ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখে আর মাথা নাড়ে। অবাক হয়ে জোরেই বলে, বসন্তকাল

অবধি টিকবে কি না কে জানে। তারপরে বলে, আশা করি টিকবে। আগের মতোই চলবে, নিজের চেয়ে নিজের টাকার থলের কথাই সে ভাবে। পরের বাড়িটি ডাক্তারের। ফটকটি অদ্ভুত, দুটি দিক যেন দুটি সান্ত্রীর ঘাঁটি—তার পাশের বাড়িটি একেবারে পাতায় ঢাকা। এবারে যে বাড়িটা এল, পথের দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে এক মাইল জুড়ে বেড়া—তার আড়াল দিয়ে শাখায় শাখায় দোদুল গোলাপী আপেল দেখা যায়—ছোট ছোট ছেলেপুলেদের প্রলোভনের বস্তু। গীর্জাগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখেছে বাড়িগুলো—সেগুলির চারিদিক ঘিরে আছে ঘন ঘাসের জঙ্গল আর কবরগুলি। আপিস যে আপিস সবাই দেখেই বুঝতে পারে। কাজ ছাড়া কেউ সেদিকে ঘেঁষেও না। কিন্তু এই রাজধানীতে, আপিসের সঙ্গে সাধারণ বাড়ির তফাত নেই—আর ভাবতো একবার—সেই বাড়িতেই আবার একটা দোকানও আছে। দেশে কয়েকটা পথ হেঁটে পার হলেই, মুক্ত বাতাসের অনুভূতি পাবে—বেড়া-ঘেরা শব্জীর বাগান পার হয়ে তখুনি এসে দাঁড়াবে শস্যের খেতে। কি নির্জনতা, কি নিস্তব্ধতা আর একঘেয়েমি! পথে, মানুষের মুখেও সেই নিস্তব্ধতা যেন লেগে আছে। যে যার মত সেখানে থাকে—কোন আড়াল-আবডালের প্রয়াস নেই। মোরগ আর মুরগীগুলোও আপন মনে পথে ঘুরে বেড়ায়। ছাগল আর গরু ঘাসের শীষ খায় আর ছোট ছোট ছেলেরা ওড়ায় ঘুড়ি।

কিন্তু এখানে—এখানে কি বিষাদ—কি থমথমানি। গ্রামের মানুষ, শহর দেখতে আসে, জানালার সামনে বেড়া, ধূলোভরা নোংরা পথ, নড়বড়ে সাঁকো আর দোকানের দরজায় ঝোলানো সাইনবোর্ডের জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। মস্ত আইজাকের উপাসনা মন্দির তার দেশের শহরের চেয়ে অনেক বেশী জাঁকালো আর উঁচু একথা স্বীকার করতেও সে ঘৃণা করে। অভিজাতদের ক্লাবের হলঘর দেশের হলঘরের চাইতে বড়—একথাও স্বীকার করতে তার লজ্জা। তাকে শুনিয়ে অমন তুলনা করলে সে ক্রুদ্ধ হয়ে চুপ করে থাকে। কখনো বা সাহস করে মন্তব্যও করে বসে যে, কোন কোন কাপড় আর মদ তার দেশের শহরে এর চেয়ে সস্তা আর ভাল। আর সেখানে মানুষ সাগর পারের দুর্লভ বস্তু ঐ বড় চিঙড়ি, কড়ি আর লাল মাছের দিকে তাকিয়েও দেখে না। তারা বলে, যদি সাধ যায় তো বিদেশীর কাছ থেকে বাজে জিনিস

কেনো। ওরা তো তোমাকে ঠকাবে, আর তুমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে! গ্রাম্য মানুষ যখন ক্যাভিয়ার, পীয়ার আর রুটি তার নিজের দেশের শহরে ভাল—এ তথ্য আবিষ্কার করে তখন কি তার আনন্দ! ওটাকে কি পীয়ার বলে নাকি? সে বলে, আমাদের দেশে চাকর-বাকরেরাও ও জিনিস খাবে না!

কিন্তু যখন পরিচয়পত্র নিয়ে সে কোন একটা বাড়িতে ঢোকে, তার মোহ-মুক্তি আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। সে আশা করে, দুহাত বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা তাকে করা হবে, কে তাকে আসন দেবে, তারই জন্ম কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, খাবার দেওয়া হবে। কৌশলে ওরা জেনে নেবে—কি তার প্রিয় খাদ্য—সে এই আদর-যত্নে এমন অভিভূত হয়ে পড়বে যে, শেষপর্যন্ত সে ভদ্রতার বালাই চুকিয়ে দিয়ে গৃহকর্তা আর কর্ত্রীকে আলিঙ্গন করে তাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করবে—যেন তারা পরস্পরকে বিশ বছর ধরে চেনে—এমনি হবে তাদের ভাবখানা। সবাই পান করবে বাড়িতে তৈরী সুরা, সমস্বরে গাইবে গান।

কিন্তু একটুও সেরকম নয়। তারা তার দিকে ফিরেও তাকায় না, মুখভঙ্গী করে বলে, তারা ব্যস্ত। যদি কাজে এসে থাক তো, তারা এমন সময়ের কথা বলে যখন কারো খাওয়া-দাওয়ার সময় নয়। আর কারুরই যেন সামান্য কিছু খাওয়া বা এক গেলাস ভোদ্‌কা পানের সময়ের জ্ঞান নেই। গৃহকর্তা তোমার আলিঙ্গনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়বেন, অতিথিকে অদ্ভুত বলে তাঁর মনে হবে। পাশের ঘর থেকে আসছে চামচের টুংটাং শব্দ, গেলাসের ঝনঝনানি—অতিথি নিমন্ত্রণের প্রত্যাশা করছে—কিন্তু রকমারী সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে তাকে চলে যেতে বাধ্য করা হ'ল। প্রতি জায়গায়ই বন্ধ দরজা, প্রতি জায়গায় দরজায় ঘণ্টি—বাজে ব্যাপার নয় কি? মুখগুলি আবেগহীন, আতিথ্য-বিমুখ। আমাদের অঞ্চলে, তুমি সাহসভরে ভিতরে গিয়ে ঢুকবে। পরিবারের যদি খাওয়া দাওয়ার পাট এরই মধ্যে চুকে গিয়ে থাকে, অতিথির জন্ম আবার টেবিল সাজানো হবে। সমোভার সকাল-সন্ধ্যা সবসময়ে থাকবে টেবিলের উপর—দোকানগুলিতেও দরজায় ঘণ্টি নেই। সবাইকে সবাই চুম্বন-আলিঙ্গন করে। ওখানে প্রতিবেশীরা সত্যই প্রতিবেশী। মানুষ অন্তরঙ্গ হয়ে থাকে। আত্মীয় সেখানে প্রকৃতই আত্মীয়। নিজের লোকের জন্ম সে প্রাণ দেবে—হায়!

আলেকজান্দার য়্যাডমিরালটী স্কোয়ারে এসে পৌছল, সে বিহ্বল হয়ে গেল প্রশংসায়। ব্রোঞ্জের ঘোড়সওয়ারের সুমুখে পুরো একঘন্টা সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, ভাবে সে বিভোর। না, না পুশকিনের কবিতার হতভাগা য়েভজেনীর মত নয়, আত্মায় তখন তার তীব্র অনুশোচনা। নেভার আর দুপাশের বাড়িগুলির দিকে সে তাকাল। চোখ তার প্রদীপ্ত। হঠাৎ নড়বড়ে সাঁকো, ফালি বাগান আর ভাঙা বেড়ার প্রতি অনুরাগের জন্য সে লজ্জিত হল। বদলে গেল মানসিক অবস্থা—প্রফুল্ল হয়ে উঠল মন। গোলমাল, ভিড় সবকিছু এখন নতুন অর্থ নিয়ে দেখা দিল তার চোখে। প্রথমে যে বিষণ্ণতার প্রভাবের ফলে দমে গিয়েছিল তার আশা, সেই আশাই আবার জেগে উঠল। নতুন জীবন দিলে তাকে বাহু বাড়িয়ে, অজানার প্রলোভন দেখালে। বক্ষ স্পন্দিত হচ্ছে প্রচণ্ডবেগে, সে স্বপ্ন দেখছে এক মহান প্রচেষ্টা আর মহা আকাঙ্খার। নেভস্কী প্রসপেক্ট দিয়ে গর্বভরে চলেছে, নিজেকে সে বলছে—সে নয়া দুনিয়ার নাগরিক। এমনি স্বপ্ন দেখতে-দেখতেই সে বাড়ি ফিরে এল।

সেদিন এগারোটার সময় কাকা তাকে চা-পানে নিমন্ত্রণ করলেন।

সোফায় এলিয়ে পড়েছিলেন, সেখান থেকেই বললেন, এইমাত্র থিয়েটার থেকে ফিরছি।

আহা, আপনি আমাকে আগে বললেন না কেন কাকা, আমি আপনার সঙ্গে যেতাম।

আমি স্টলে বসেছিলাম—তুমি কোথায় বসতে—আমার কোলে? পিওতর ইভানিচ উত্তর দিলেন। কাল তুমি নিজেই যেও।

কাকা, ভিড়ের ভিতরে একা বড় খারাপ লাগে। কারো সঙ্গে মনের কথা বলাবলি করা চলে না।

তা করার কোন মানেও হয় না। নিজে অনুভব আর চিন্তা করতে শিখবে। এক কথায়—একা একা থাকতে শিখবে। সময় আসবে, যখন তোমার এই গুণটি কাজে আসবে। আর থিয়েটারে যেতে হলে আগে তোমাকে কিছু ভদ্র পোশাক যোগাড় করতে হবে।

আলেকজান্দার তার নিজের কোটের দিকে তাকাল, কাকার কথায় সে অবাক।

আমার কাপড়-চোপড়ের আবার কি খুঁত হল? সে আপন মনেই ভাবে। নীল কোট, নীল ট্রাউজার্স—কাকা আমার তো বেশ্ কাপড়-চোপড় আছে। কনিগস্টিন তৈরি করেছে—সে লাটবাহাদুরের পোশাক তৈরি করে।

কিন্তু উপায় নেই—ওতে চলবে না। দু-একদিনের মধ্যে আমার নিজের দর্জির কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। ওটা তো তুচ্ছ ব্যাপার। আলোচনা করার অনেক বড় বড় জরুরী ব্যাপার আছে। বল তো—এখানে কেন এলে?

আমি থাকতে এসেছি।

থাকতে এসেছ? যদি থাকার মানে খাওয়া-দাওয়া, পান করা আর ঘুম হয়—তাহলে এখানে আসার কোন মানে হয় না। গ্রামে যেমন খেতে ঘুমোতে তেমনটি এখানে হবে না। যদি তোমার অন্য কিছু ধারণা থাকে, আমাকে বুঝিয়ে বল।

আমি বলতে চেয়েছিলাম—জীবন আমি উপভোগ করতে চাই—আলেকজান্দার লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠে বললে। গ্রামে থেকে থেকে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম—সেখানে সেই ঘুরেফিরে একই ব্যাপার।

ওঃ এই কথা! তা তুমি কি নেভস্কী প্রস্‌পেক্টে একটা গোটা দোতলা ভাড়া নিয়ে গাড়িঘুড়ি রেখে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় করতে চাও—একেবারে যাকে বলে মজলিসী কাণ্ড।

সে তো বহু খরচার ব্যাপার, আলেকজান্দার সরলভাবেই বললে।

তোমার মা লিখেছেন, তিনি তোমাকে হাজার রুবল দিয়েছেন, পিওর ইভানিচ বললে। এমন কিছু টাকা নয়। আমার এক পরিচিত এই কিছুদিন হল এসেছেন—তিনিও গ্রামে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন—জীবন তিনিও উপভোগ করতে চাইলেন। কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটি রুবল এনেছেন, আর প্রতি বছরই ঐ টাকাটা পাবেন; তিনিই পিটার্সবুর্গের জীবন সত্যিকারের উপভোগ করতে পারবেন—তোমার দ্বারা হবে না; এজন্য তুমি আসনি।

কাকা, আপনি বলতে চাইছেন, আমি কেন এসেছি তাই ই জানি না।

প্রায় সত্যের ধার ঘেঁষে গেছ, অথবা কথাটায় খানিকটা সত্য আছে। কিন্তু দুটোর একটাও ঠিক নয়। নিশ্চয়ই আসা ঠিক করার আগে—নিজেকে

এই প্রশ্ন করেছিলে—কেন যাচ্ছি? যদি জিজ্ঞেস করে থাক তো ভাল কথা।

ঐ প্রশ্ন নিজেকে জিজ্ঞেস করার আগেই আমার জবাব তৈরী ছিল, আলেকজান্দার উত্তর দিলে, তাতে গর্ব যে রইল না এমন নয়।

তাহলে আমাকে বলছ না কেন? বেশ তো, উত্তরটা কি?

আমি এখানে এক অদম্য কামনার টানে এসেছি—এক মহান কাজের তৃষ্ণা আমাকে টেনে এনেছে। কামনার কথলে আমি—আমি চাই ফুটিয়ে তুলতে—পূর্ণ করতে—

পিতর ইভানিচ সোফায় একটু উঠে বসলেন, চুরুট মুখ থেকে নামিয়ে মন দিয়ে শুনতে লাগলেন।

যে আশা আমার মনে উত্তাল হয়ে উঠেছে তাকে পূর্ণ করতে—

তুমি কবিতা লেখ নাকি? হঠাৎ পিতর ইভানিচ জিজ্ঞেস করে বসলেন।

হাঁ কাকা, পদ্যও লিখি। আপনাকে কয়েকখানি এনে দেখাব?

না, না। পরে এসো। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম।

কেন?

তুমি যেভাবে কথা বলছিলে—

আমার বলার ধরণ আপনার পছন্দ হয় নি বুঝি?

তা বলছিনে। চমৎকার ধরণ তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু একটু অদ্ভুত।

আমাদের সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ঠিক অমনি করে বলেন, আর তিনি সমস্ত অধ্যাপকদের মধ্যে সবচেয়ে বাকপটু বলেই খ্যাত, আলেকজান্দার অবাক হয়ে বললে।

কি বলেন তিনি?

তাঁর নিজের বিষয়ে।

ওঃ

কাকা, আমি কি ভাবে বলব?

আরো সহজ-সরলভাবে। আর সবারই মত—সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের মত নয়। কিন্তু এসব তো হঠাৎ বলে বোঝানো যায় না। নিজেই দেখে শিখবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যতটুকু মনে আছে, আর তার

সাহায্যে যতটা তোমার কথার ব্যাখ্যা করতে পারি—তাতে মনে হয়—তুমি বলতে চাও—তুমি এখানে কৃতী ও ভাগ্যবান হতে এসেছ। কি—তাই না?

হাঁ কাকাবাবু, কৃতী—

আর ভাগ্যও চাই—পিতর ইভানিচ যোগ করলেন। ভাগ্য ছাড়া কিসের কৃতী হওয়া! ভাল কথা! কিন্তু না আসাই উচিত ছিল।

কেন নয়? আলেকজান্দার ঘরের চারিদিকে চেয়ে বললে, আশা করি আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেন নি?

বেশ বলেছ। এটা ঠিকই—আমার একখানা বেশ সুখশান্তিভরা বাসা আছে—আমার কাজকর্মও বেশ ভাল চলছে। কিন্তু আমি যতদূর বুঝি—তোমার সঙ্গে আমার যথেষ্ট প্রভেদ।

আমি নিজেকে স্বপ্নেও আপনার সঙ্গে তুলনা করতে চাই না।

না, না, সেকথা নয়। আমার চেয়ে তুমি দশগুণ চালাক চতুর আর যোগ্য হতে পার, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে নতুন ভাবধারার নিকট নিজেকে সমর্পণ করে দেবে এমন প্রকৃতি তোমার নয়। আর গ্রামের যে রীতি চলে আসছে—আমি হলফ করে বলছি! যেমন তুমি—তুমি তোমার মার আদুরে সন্তান—আমি যা সয়েছি, তুমি কি করে তা পারবে? তুমি হয়তো একজন স্বপ্নবিলাসী—এখানে স্বপ্নের সময় নেই। আমাদের মত লোক এখানে কাজ করতে আসে।

আপনি যদি উপদেশ আর আপনার অভিজ্ঞতার ফল থেকে আমাকে বঞ্চিত না করেন, হয়তো আমিও কিছু করতে পারব।

তোমাকে পরামর্শ দিতে আমি ভয় পাই। তোমার গ্রাম্য স্বভাবের জন্য আমি দায়ী হতে পারি না। যদি কোন ফল না হয়, তখন আমাকে দোষ দিও, কিন্তু আমার মত জানিয়ে দিতে আপত্তি নাই। তুমি ইচ্ছে হলে শুনবে, না হয় না শুনবে—যেটা তোমার খুশী। না, আমার সফল হওয়ার আশা নেই। তোমার জীবনের আদর্শ তোমার নিজের। কি করে তা বদলাবে? তুমি চাও ভালবাসা, বন্ধুত্ব, জীবনের আনন্দ আর সুখ। এখানকার মানুষ ভাবে জীবনে এ ছাড়া আর কিছুই মেলে না। শুধু আঃ আর ওঃ আবেগ আর উচ্ছ্বাস। ওরা চোখের জল ফেলে, গোঙায়, ভাল ভাল

কথা বলে, কিন্তু কিছু করে না। এইগুলি থেকে তোমাকে মুক্তি দেব কি করে? এ তো সহজ নয়।

কাকা, আধুনিক ভাবধারা গ্রহণ করতে চেষ্টা করব। এই তো আজই, এই বিরাট প্রাকার আর ঐ যে জাহাজগুলি দূরদেশ থেকে আমাদের কাছে উপহার নিয়ে আসে—ওদের দিকে তাকিয়ে আমি আধুনিক মানুষের কীর্তির কথা ভাবছিলাম। আমি এই জনতার স্পন্দন বুঝেছি, তার কাজের নীতি আমি উপলব্ধি করেছি—তাই তো আমি ওরই সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার কথা অনুভব করছি।

এই একতরফা উক্তির সময়ে পিওতর ইভানিচের ভ্রূ ঠেলে ঠেলে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছিল। তিনি ভাইপোর দিকে অভিনিবেশ-সহকারে দেখছিলেন। আলেকজান্দার থেমে গেল।

খুড়ো বললেন, এ তো সহজ ব্যাপার! কিন্তু দেখ—ওরা তোমার মাথায় কিসব পুরে দিয়েছে—এই জনতা আর তার কাজের নীতি! তোমার বাড়িতে থাকা উচিত ছিল, হাঁ তাই-ই ছিল ঠিক। তুমি পরম সুখে ওখানে দিন কাটাতে পারতে। সকলের চেয়ে চালাক-চতুর হতে পারতে। লেখক বলে, বাগ্মী বলে চলে যেতে পারতে। শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় প্রেমে, বন্ধুত্বে, আত্মীয়তায় আর সুখে বিশ্বাসী হতে পারতে। বিয়ে করতে পারতে, তোমার জীবন বয়ে যেত মসৃনভাবে বার্ধক্যে—নিজের পথে চলে নিজেই সংসারের সুখী হতে। কিন্তু এখানকার লোকে যে সুখের কথা বোঝে, তাতে তুমি কখনো সুখী হবে না। তোমার সমস্ত ধারণা পাল্টাতে হবে।

কিন্তু কাকা—ভালবাসা আর বন্ধুত্বের মত মহান আবেগ কি স্বর্গ থেকে এই পৃথিবী আর তার আবর্জনার ভিতরে হঠাৎ এসে পড়েনি?

কি বললে?

আলেকজান্দার নিরুত্তর।

ভালবাসা আর বন্ধুত্ব আবর্জনায় পড়েছে! দেখ—এখানে ওসব বাজে কথা বলা চলে না!

ওখানে যেমন আছে, এখানে কি তেমনি ঐ দুটি নেই—আমি তা জানতে চাই?

হাঁ, এখানেও ভালবাসা আর বন্ধুত্ব আছে। কোথায় না এ দুটি

জল খেলে? কিন্তু প্রাণের মত নয়। সময় হলে তুমি নিজেই জানতে পারবে। প্রথম কথা, এই পবিত্র আর স্বর্গীয় আবেগগুলির কথা ভুলে যেতে হবে। আসলে জিনিসগুলি যা সেইভাবেই দেখতে হবে। সেটা খুব ভালই হবে—সহজভাবে কথা কইতে শিখবে। কিন্তু—এতো আমার ব্যাপার নয়। তুমি এখানে এসেছ—ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। যা আশা করছ যদি তা না পাও আমাকে দোষ দিও না। আমি আমার মতে যা ভাল—যা মন্দ তাই-ই বলতে পারি। তুমি তোমার খুশী-মত চলতে পার। কে জানে, হয়তো তোমাকে কিছু করানোও সম্ভব। হাঁ, তোমার মা বলেছেন তোমাকে টাকা সরবরাহ করতে। আমার কথা শোন! আমার কাছে টাকা চেয়ো না। সুখী ও সভ্য মানুষের মধ্যে প্রীতির পক্ষে এটি মারাত্মক। কিন্তু আমি তোমাকে টাকা দিতে অস্বীকার করছি একথা ভেবো না। যদি তোমার আর কোন উপায় না থাকে, অবশ্যই আমার কাছে বলবে। যাই-ই হোক, অপরিচিতের কাছ থেকে ধার করার চেয়ে, খুড়োর কাছ থেকে ধার করা ভাল—অন্তত সুদ তো দিতে হবে না। কিন্তু এমন জরুরী পরিস্থিতি যাতে না হয় তারই জন্য একটা কাজ ঠিক করে দেব, যাতে তুমি রোজগার করতে পার। আচ্ছা এখন এস, কাল একবার এস। তখন উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

আলেকজান্দার নিজের কামরায় ফিরে যাচ্ছিল। খুড়ো তাকে পিছু ডাকলেন। বলছি—রাতের খাওয়াটা খেয়ে যাও না?

আচ্ছা, কাকা, আমার আপত্তি নেই।

আমার কিন্তু কিছুই যোগাড় নেই।

আলেকজান্দার নিরুত্তর। মনে মনে ভাবলে, তাহলে নিমন্ত্রণ করা কেন?

আমি বাড়িতে খাই না, আর হোটেলগুলোও এখন বন্ধ হয়ে গেছে—খুড়োমশাই বলতে লাগলেন। শুরুতে এইটেই তোমার একটা শিক্ষা হোক—অভ্যাস করে নাও। সূর্য আকাশে থাকতেই তোমরা দেশে বিছানা ছেড়ে ওঠ আর শুয়েও পড়, আর প্রকৃতির নির্দেশ অনুসারে পান-ভোজনও করে থাক। যদি ঠাণ্ডা পড়ে, কান-ঢাকা টুপি পর; যখন আলো হয়, তার মানে দিনের বেলা হল আর আঁধার হলেই রাত হল। তোমার চোখ তো খোলা রাখতেই পারছ না, অথচ আমি এমন কাজে বসব—মাসের শেষের হিসেবটা

তৈরী করে ফেলতে হবে। তোমরা সারাবছর ধরে বিশুদ্ধ হাওয়া সেবন কর ওখানে, কিন্তু এখানে তার জন্যে টাকা লাগে। সবকিছুর জন্যে যেমন লাগে, তেমনি লাগে। একেবারে আলাদা! মানুষ এখানে রাতের খাবার খায় না বিশেষ করে নিজের খরচে তো নয়ই, আবার—আমার খরচেও না। তোমার পক্ষে ভাল হচ্ছে, ঘুমের ভিতরে অতো গোঙিয়ো না, গড়াগড়িও করো না। আমার উঠে গিয়ে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকার সময় নেই……

কাকা, এসব ব্যাপার রপ্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে খুব সহজই হবে।

ভাল কথা। গ্রামদেশের মতই কি এখানে সব এক—রাতে কোন বন্ধুর সঙ্গে কি তুমি এখানে দেখা করতে পার, তোমার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়ার কথা ভাবতে পার?

কেন কাকা, আমি তো এতে অন্যায় কিছু দেখতে পাইনে! রুশদের সবচেয়ে বড় ধর্ম—

এই রে! এতে ধর্ম কোথায়? তোমার এমন একঘেয়ে লাগছে যে, একটা বদমাসের সঙ্গে দেখা হলেও বুঝি তুমি খুশী হও? এস, এস, যত খুশী খাও, শুধু আমাদের এই কুড়েমির ভিতরে একটু অন্যমনস্ক করে দাও, সময় কাটাতে সাহায্য কর—তোমার দিকে একটু তাকাতে দাও। অন্তত নতুন কিছু হোক। খাবার দিতে আমরা কার্পণ্য করব না—তাতে খরচা তো কিছু নেই। এ এক অতি বিশ্রী ধর্ম।

তার খুড়োমশাইটি আসলে কি রকম লোক আলেকজান্দার বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করলে। আলাপ-আলোচনার সবটাই স্মৃতি থেকে আউড়ে গেল—অনেক কথাই সে বুঝতে পারে নি, আর বহুকথা বিশ্বাস ও করে নি।

সে ভাবলে, আমিই ভুল বুঝেছিলাম। ভালবাসা আর বন্ধুত্ব চিরন্তন নয়! আমার খুড়োমশাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন কিনা কে বলবে? এখানে কি এই রীতি না কি? কেন, আমার এই বাকপটুতা তো আমার মধ্যে আর সব গুণের চেয়ে সোফিয়া বেশি ভালবাসে! তার ভালবাসা চিরন্তন নয়—এ কি হতে পারে? মানুষ কি সত্যিই এখানে রাতের খাবার খায় না?

বহুক্ষণ বিছানায় সে গড়াগড়ি দিলে, মগজে ভীতিজনক ভাবনাও শূন্য উদর তাকে জাগিয়ে রাখলে।

দুঃসপ্তাহ চলে গেল।

পিওত্র ইভানিচ ভাইপোর উপর প্রতিদিনই সদয় থেকে সদয়তর হচ্ছিলেন। মোটেই বোকা নয়, নিজের একজন অংশীদারকে তিনি বললেন, গেঁয়ো ছেলের পক্ষে সেইটেই আশ্চর্য। আমার ঘাড়ে এসে পড়তে চায় না, কখনো নিমন্ত্রণ ছাড়া আসে না। যখনি দেখে কাজে বাধা জন্মাচ্ছে, তখনি চলে যায়। কখনো টাকা চায় না। ভারি শান্ত। একটু খেয়ালী—সব সময়েই চুমু খেতে চায় আমাকে এবং ধর্মশাস্ত্রের ছাত্রের মত কথা বলে। কিন্তু ওগুলো চলে যাবে। ভাগ্য ভাল, ওকে আমার পুষতে হচ্ছে না।

ধন-দৌলত আছে? অংশীদার জিজ্ঞেস করলে।

না, প্রায় একশো ঘর প্রজা আছে।

আচ্ছা! যদি চালাক-চতুর হয় তো এখানে চালিয়ে নিতে পারবে। তুমিও তো সামান্য অবস্থা থেকে শুরু করেছিলে—এখন ঈশ্বরের দয়ায়—

না, না! ও তা পারবে না। কখনো কিছু করতে পারবে না। ওর ঐ উৎসাহে ওর কিছুই হবে না—শুধু চিরদিন আঃ ওঃ করেই কাটাবে। এখানকার জীবনে ও অভ্যস্ত হতে পারবে না। কি করতে পারবে এখানে? এখানে আসাই ওর উচিত হয়নি—তবে তা ওর নিজের ব্যাপার।

আলেকজান্দার পিতৃব্যকে ভালবাসা তার কর্তব্য বলেই মনে করল, কিন্তু তাঁর চরিত্র আর মানসিক বৃত্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে না।

পসপেলভকে একদা সকালে সে লিখলে—আমার খুড়োমশাইকে ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। তিনি বড় চতুর, কিন্তু গদ্যময় মানুষ, সব সময়ে কাজ-কারবার আর হিসেব-নিকেশে ব্যস্ত। তাঁর মন পৃথিবীতে আবদ্ধ, কখনো বিশুদ্ধ ভাবনার স্তরে উঠতে পারবে না—সেখানে পার্থিবতা মুক্ত হতে পারবে না, মানুষের অধ্যাত্মিকতার সন্ধান পাবে না। তাঁর কাছে স্বর্গটা মর্ত্য দিয়ে বাঁধাই। মনে হয় যেন তাঁর আর আমার কখনো আত্মিক মিলন হবে না। যখন আমি আসি, ভেবেছিলাম, আমার কাকা আমাকে তাঁর অন্তরে স্থান দেবেন—এই উদাসীন জনতার মধ্যে আমাকে উষ্ণ করে তুলবেন তাঁর মিত্রতার আলিঙ্গনে। আমরা তো জানি মিত্রতা ঈশ্বরেরই আর এক রূপ। কিন্তু তিনি নিজেই তো এই জনতার প্রতীক। ভেবেছিলাম, আমরা একসঙ্গে সময় কাটাব, কখনো বিচ্ছেদ হবে না;—কিন্তু কি পেলাম? শীতল উপদেশ—

ঐগুলিকে উনি কাজের কথা বলেন। আমি চাই বরং তা একটু অকাজেরই হোক, তবু যেন আন্তরিক সহানুভূতি থাকে। তিনি যে অহংকারী তা নন, কিন্তু মনের সত্যকারের আবেগ প্রকাশের বিপক্ষে। আমরা একসঙ্গে ডিনার বা সাপার খাই না, কোথাও যাইও না। যখন বাড়ি আসেন, কখনো বলেন না, কোথায় গিছলেন, কি করছিলেন, যেমন কখনো বলে যান না, কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন, তাঁর বন্ধুবান্ধব কারা, তাঁর পছন্দ-অপছন্দ কি, কি করেই বা সময় কাটান। তিনি কখনো খুব একটা চটে ওঠেন না, কখনো স্নেহ-বিগলিত হন না, বিষাদ বা প্রফুল্লতাও তাঁর দেখা যায় না। ভালবাসা, বন্ধুত্ব বা সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তাঁর হৃদয়ের কাছে অজানা। তুমি বলতে পার ঋষির মত আমাদের অবিস্মরণীয় মহান ইভান সেমিওনিচের মত তোমার কি মনে আছে? তিনি চেয়ার থেকে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন, তাঁর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি আর কথা আমাদের উৎসাহে স্পন্দিত করে তোলে। কিন্তু আমার খুড়োটি ভ্রূ তুলে শুধু শোনেন, অদ্ভুত-ভাবে তাকান, অথবা নিঃশব্দ ভঙ্গীতে হাসেন, আমার রক্ত তো হিম হয়ে যায়। আমার প্রেরণাও বিদায় নেয়। কখনো কখনো তাঁর ভিতরে আমি পুশকিনের শয়তানটাকে দেখতে পাই। তিনি প্রেম বা অমনি কিছুতে বিশ্বাসী নন। সুখ বলে কিছু নেই একথাই বলেন, কেউ মানুষকে কখনো সুখের প্রতিশ্রুতি দেয় নি, শুধু দৈনন্দিন জীবন ছাড়া আর কিছু নেই—ভালমন্দতে ভাগ করা সে জীবন, আছে আনন্দ, স্বাস্থ্য, সফলতা, উদ্বেগ, শান্তি আর একঘেয়েমি, দুঃখ, রোগ এমনি কত কি। সবকিছুকে আমাদের সহজভাবে নিতে হবে, কেন আমরা জন্মেছি, কি আমাদের আকাঙ্ক্ষা এসব বাজে জিনিস (ভাবতো একবার, এগুলো বাজে!) মিথ্যে কাগজ ভর্তি করে দরকার নেই। এগুলো আমাদের ব্যাপার নয়, নাকের নীচে কি আছে, এইগুলোই তা দেখতে দেয় না, নিজেদের ব্যাপারে মন দিতেও দেয় না। তিনি কাজের কথা ছাড়া কিছু বলেন না। তিনি বিলাসে মগ্ন না নিছক গন্ধময় ব্যবসায় ব্যস্ত তা বোঝা অসম্ভব। সবসময়েই তিনি একরকম, তা হিসেব নিকেশই করুন আর থিয়েটারেই যান। প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসের ধার ঘেঁষেও যান না, মনে হয় সৌন্দর্য কি জানেন না, ধার ও ধারেন না। এ তাঁর অপরিচিত বস্তু। তিনি যে পুশকিন পড়েছেন—একথাও আমি বিশ্বাস করি না।

পিওত্র ইভানিচ হঠাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের ঘরে এসে দেখলেন, সে চিঠি লিখছে।

কেমন আছ দেখতে এলাম, বললেন, আর কাজের কথাও বলতে এলাম।

আলেকজান্দার লাফিয়ে উঠে হাত দিয়ে কি যেন ঢাকলে।

যদি গোপন কিছু হয়, সরিয়ে রাখ, পিওত্র ইভানিচ বললেন। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকব। কি—রেখেছ? কি যেন পড়ে গেল। কি ওটা?

কিছু না কাকা, আলেকজান্দার শুরু করে আবার বিভ্রান্ত হয়ে থেমে গেল।

যদি ভুল না করে থাকি, একগোছা চুল মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই কিছু নয়। যখন দেখেই ফেলেছি, তখন হাতে কি লুকিয়ে রেখেছ দেখাও।

আলেকজান্দার যেন স্কুলের ছেলের মত দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে হাতের মুঠো খুলে আঙটিটি দেখালে।

ওটা কি? কোথা থেকে এল? পিওত্র ইভানিচ শুধালেন।

কাকা, ওটা অস্থায়ী সম্পর্কের স্থায়ী চিহ্ন।

কি- কি? তোমার স্থায়ী চিহ্নটি দাও তো!

এটি স্মারক—

বোধ হয়, গ্রাম থেকে এনেছ?

কাকা, সোফিয়ার কাছ থেকে বিদায়ের সময় এই স্মৃতিচিহ্নটি পেয়েছি।

ওঃ এই ব্যাপার। এইটেই কি হাজার মাইলেরও বেশী সঙ্গে করে এনেছ? পিওত্র ইভানিচ মাথা নাড়লেন।

তার চেয়ে আর এক বস্তা শুকনো গোলাপজাম আনা উচিত ছিল। ভাণ্ডারীর কাছে বিক্রি করা যেত—কিন্তু এই স্মৃতিচিহ্ন—

তিনি চুলের গোছা থেকে আঙটিটির দিকে তাকালেন। চুল শুঁকলেন, আঙটিটা হাতে ওজন করে দেখলেন। তারপরে টেবিল থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে তাতে দুটি স্মৃতিচিহ্নই মুড়ে একটা তালগোল পাকিয়ে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন।

কাকা, আলেকজান্দার তাঁর হাত চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু দেরী হয়ে গেছে। তালটা পড়শীর ছাদের কোণ পার হয়ে নিচের খালের একটা বজরার উপর দিয়ে পড়ল, সেখানে গোত্তা খেয়ে গড়িয়ে গিয়ে জলে।

আলেকজান্দার নিঃশব্দে খুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল, মুখে তার কটু তিরস্কারের ব্যঞ্জনা।

কাকা—সে আবার বলে উঠল।

কি?

এই কাজটিকে আমি কি বলব?

জানালা দিয়ে অস্থায়ী চিহ্ন আর যত বাজে নিক্ষেপ করা? তোমার ঘরে এগুলো রাখা উচিত নয়।

বাজে জিনিস? এগুলোকে আপনি বাজে জিনিস বলেন?

তুমি এগুলিকে কি ভাব? তোমার অর্থেক হৃদয়? আমি এসেছি কাজের কথা বলতে, আর এসে দেখি—সে কি করছে! বসে বসে যত বাজে জিনিস ভাবছে।

কাকা, আপনার কাজের কথায় কি তারা বাধা দিয়েছে?

মস্ত বাধা। সময় যাচ্ছে, অথচ তুমি আমাকে এখনো কি করবে বলনি—তুমি কাজ করবে, না কোন পেশা নেবে—একটা কথাও বলনি। তার কারণ, তোমার মগজ এখন সোফিয়া আর স্মৃতিচিহ্নময়। মনে হচ্ছে, ওকেই চিঠি লিখছিলে? তাই না?

সবে শুরু করেছি।

তোমার মাকে লিখেছ?

এখনো লিখিনি—কাল লিখব।

কাল কেন? কাল তোমার মাকে আর যে সোফিয়াকে এক মাসের ভিতরেই নিশ্চয় ভুলে যাবে তাকে আজ!

সোফিয়া! তাকে কি আমি ভুলতে পারি!

ভুলতেই হবে। যদি তোমার ঐ স্মৃতিচিহ্ন ফেলে না দিতাম, তুমি হয়তো আরো এক মাস ওকে মনে রাখতে। তোমার ডবল কাজ করে দিলাম। কয়েক বছরের মধ্যেই ঐ স্মৃতিচিহ্ন তোমার বোকামির কথাই মনে করিয়ে দিত, আর তাতে লজ্জাও পেতে।

অমন পবিত্র স্মৃতির জন্য লজ্জা পেতাম? তার মানে তো কাব্যকেই অস্বীকার করা?

বোকামির কি কাব্য হয়? তোমার ঐ মাসীর চিঠির ঐ কাব্য হচ্ছে

বোধ হয়। হয়তো একটা ভুল, একটা দুঃখ—কিছু রহস্য। ভাবতেও পারবে না পড়ে কি খারাপ লাগছিল! আমারই প্রায় লজ্জা করছিল আর কি, অথচ আর তো লজ্জা করার অভ্যেস আমার নেই।

কাকা, এ যে সাংঘাতিক কথা। তার মানে কি আপনি কখনো ভাল-বাসেন নি?

আমি ঐ স্মৃতিচিহ্ন সইতে পারিনে।

আলেকজান্দার ভয়ানক বিচলিত, সে চেঁচিয়ে উঠল, একখণ্ড কাঠের মতই ও জীবনে যে প্রাণ নেই! ও তো ভীষণ তুষারপাত, জীবন নয়! প্রেরণা ছাড়া, অশ্রু ছাড়া, প্রাণ ছাড়া, প্রেম ছাড়া—

আর কেশের গুচ্ছ ছাড়া, খুড়োমশাই যোগান দিলেন।

কাকা, পৃথিবীর যা সবচেয়ে সেরা তাকে কি করে নির্বিচারে ঠাট্টা করছেন? এ তো পাপ…প্রেম…পবিত্র স্পন্দন…

আমি তোমার পবিত্র প্রেম কি তা জানি—তোমার এই বয়সে তুমি চুলের গোছা, চটি, গার্টার ছাড়া কিছু ভাবছ না। হাত একটু ছুঁলেই পবিত্র, উন্নত প্রেম তোমার সারা দেহে সঞ্চারিত হবে, আর তোমার নিজের ইচ্ছা যদি পূর্ণ হয় তাহলে—দুর্ভাগ্য, তোমার প্রেমের কাল এখনো আসে নি। কেউই তাকে এড়াতে পারে না, কিন্তু সময়-মত না করলে, কাজ এড়িয়ে যেতে পারে।

প্রেম কি কাজের একটা অংশ নয়?

না। ওটা হচ্ছে সুখময় অন্যমনস্কতা—ওর জন্য বেশী সময় দেওয়া ঠিক নয়, তাহলে সব মাটি হবে। তাই তো তোমার জন্যে আমার ভয়।

পিওত্র ইভানিচ মাথা নাড়লেন।

তোমার জন্যে একটা কাজ প্রায় ঠিক করে ফেলেছি। তুমি কাজ করতে চাও—তাই না?

কাকা, আমি যে কি খুশি হলাম!

আলেকজান্দার লাফিয়ে উঠে পিতৃব্যের গালে একটা চুমু খেল।

অমনি সুযোগ নিলে। খুড়ো গাল মুছে বললেন, আমাকে আনমনা পেলে কি করে? এখন শোন। বল তো, তুমি কি কাজ জান—কি কাজ করতে পার বলে মনে কর?

আমি শাস্ত্র জানি, দেওয়ানী, ফৌজদারী, প্রাকৃতিক, জনসাধারণের আইন জানি, কূট রাজনীতি, রাজনীতিঘটিত অর্থনীতি, দর্শন, সৌন্দর্যতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব—

থামো, থামো। তুমি রুশভাষা ভাল লিখতে পার? ঐটেই এখন প্রধানত দরকার।

কি অদ্ভুত প্রশ্নই করলেন কাকা! রুশ ভাষা লিখতে পারি কিনা? আলেকজান্দার দেরাজের কাছে গিয়ে সেখান থেকে একগাদা কাগজ নিয়ে এল। খুড়ো ইতিমধ্যে টেবিল থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছেন।

আলেকজান্দার কাগজ নিয়ে টেবিলের কাছে এসে দেখল, খুড়ো তার চিঠিখানা পড়ছেন। কাগজগুলো তার হাত থেকে খসে পড়ল।

কাকা কি পড়ছেন? ভীত হয়ে সে শুধালে।

বোধ হয় বন্ধুর কাছে লেখা একখানা চিঠি পেলাম। আমি দুঃখিত—তোমার লেখা কি রকম শুধু তাই দেখবার ইচ্ছে ছিল।

আপনি কি পড়েছেন?

প্রায়—আর দুটি ছত্র মাত্র বাকি। আমাকে শেষ করতে দাও। কি ব্যাপার? এতে তো গোপন কিছু থাকতে পারে না। তাহলে এমন করে এখানে ফেলে রাখতে না।

আপনার আমার সম্পর্কে এখন কি ধারণা হচ্ছে?

আমার মনে হচ্ছে, তুমি মোটামুটি ভালই লেখ—শুদ্ধ আর সহজ হয়।

তাহলে আপনি পড়েন নি? আলেকজান্দার ব্যগ্র হয়ে শুধালে।

দুখানি পাতার উপরে চোখ বুলিয়ে পিতর ইভানিচ বললেন, আমি বোধ হয় সবটাই পড়ে ফেলেছি। তুমি পিটার্সবুর্গ দেখার বর্ণনা দিয়ে শুরু করেছ, তারপর আছে আমার কথা।

হা ঈশ্বর! আলেকজান্দার হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল।

কি হল তোমার?

আপনি বেশ শান্ত ভাবে বলতে পারছেন? রাগ করেন নি—আমাকে ঘৃণা করছেন না?

মোটেই না! আমি কেন তা করতে যাব?

আবার বলুন—আমাকে শান্ত হতে দিন।

নিশ্চয়ই স্নান করিনি।

আমি তো বিশ্বাস করতেই পারছিনে। বাবা, প্রমাণ দিন।

কি করাতে চাও বল ?

আমাকে আলিঙ্গন করুন!

কুঞ্চিত! তা পারব না।

কেন ?

তার কারণ, ওটা করার কোন যুক্তি নেই—এমন কি ওতে কাণ্ডজ্ঞানেরও পরিচয় মেলে না—অথবা তোমার অধ্যাপকের ভাষায়—বিবেক আমাকে ঐটি করতে উৎসাহ যোগায় না। তুমি যদি নারী হতে, তখন আলাদা ব্যাপার হত। সেখানে মানুষ যুক্তি ছাড়া অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ করে।

বাবা, অনুভূতি মুক্তির জন্য চেষ্টা করে—সে চায় আবেগভরা কাজ, চায় উচ্ছ্বাস।

আমার বেলায় তারা মুক্তি বা কোনকিছুই দাবি করে না। যদি করত, আমি তাদের সংযত করে রাখতাম—আর তোমাকেও তাই করতে বলি।

কেন ?

যাতে, যাকে জড়িয়ে ধরেছ তার সম্পর্কে ভাল করে জেনে পরে লজ্জা না পাও।

বাবা, আপনার জীবনে কি এমনি ব্যাপার ঘটেছে, একটা লোককে প্রথমে তাড়িয়ে দিয়ে পরে অনুশোচনা করেছেন ?

হাঁ, হয়েছে। তাই কাউকে আমি তাড়িয়ে দেই না।

ঐ কাজ করেছি বলে আমাকেও না ? আপনি আমাকে একটা অমানুষ ভাববেন না ?

তোমার মতে যে আজেবাজে লেখে—সেই অমানুষ। যদি তাই হত, তাহলে বহু অমানুষই মিলত।

কিন্তু নিজের সম্পর্কে এমন খাঁটি সত্য পড়া—তাও আবার নিজের ভাইপোর লেখা!

তুমি ভাবছ—সত্য কথাই তুমি লিখেছ ?

বাবা! অবশ্যই, আমি ভুল করেছি—আমি বদলে দেব'খন। আমাকে ক্ষমা করুন!

আমি কি তোমাকে সত্য কি তা বলে দেব?

দয়া করে তাই বলুন!

বসো। এবার লেখ!

আলেকজান্দার এক তা চিঠির কাগজ টেনে নিলে, কলমটাও তুলে নিলে। পিতর ইভানিচ পড়া চিঠিখানার উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বলতে লাগলেন,

প্রিয় বন্ধু—লিখেছ?

হাঁ।

পিটার্সবুর্গ দেখে আমার কেমন লেগেছে সেকথা বর্ণনা করতে আমি চাইনে।

আমার কেমন লেগেছে, লিখতে লিখতে আওড়ালে আলেকজান্দার। পিটার্সবুর্গ বহু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, যা বর্ণিত হয়নি, তা নিজেকে দেখে নিতে হবে। আমার লেখাটার কিছুই মূল্য নেই। এরই জন্ত সময় আর কাগজ নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে আমার খুড়োমশাইয়ের আমি বর্ণনা দেব। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

কাকা! আলেকজান্দার অবাক হয়ে গেল।

আচ্ছা, তুমি লিখেছ আমি সহৃদয় আর চতুর। হয়তো আমি তাই, হয়তো তা নই। মাঝখান থেকেই শুরু করা যাক। লেখো! আমার খুড়োমশাই বোকা নন, আবার তিরিক্ষি মেজাজের মানুষও নন, আমার ভাল চান—

কাকা, এটা বোঝার মত বুদ্ধি আমার আছে, আমি ওটা বুঝতে পারছি, আলেকজান্দার তাঁকে চুমু খেতে চেষ্টা করে বলে উঠল।

যদিও তিনি সবসময়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরতে চাননা-চিঠির বয়ান বলতে লাগলেন পিতর ইভানিচ।

আলেকজান্দার বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি বসে পড়ল।

তিনি আমার ভাল চান, কেননা আমার মন্দ চাইবার কোন কারণ বা ইচ্ছা তাঁর নেই। আমার মা একসময়ে তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন, তিনি আমার তত্ত্ব তালাস করতে বলেছেন। তিনি বলেন, আমাকে তিনি ভালবাসেন না—তিনি তার যুক্তিও দিয়েছেন: এক পক্ষকাল জানাশোনায়

কাউকে ভালবাসা অসম্ভব। আমিও এখন পর্যন্ত তাঁকে ভালবাসি না, যদিও বলি—ভালবাসি।

কি করে একথা বলতে পারছেন? আলেকজান্ডার চেঁচিয়ে উঠল। লিখে যাও! কিন্তু আমরা পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। তিনি বলেন, ভালবাসা ছাড়াও চলতে পারে। দিবারাত্র তিনি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বসে থাকেন না, কেননা সেটা অপ্রয়োজনীয়। তাছাড়া তাঁর সময়ও নেই। তিনি খাঁটি উচ্ছ্বাসের বিরোধী, ঐটে থাকুক-ওটা ভাল। কি লিখেছ?

আজ্ঞে হাঁ।

আর কি বাকি রইল? গন্ধময় আত্মা···দৈত্য—লিখে যাও।

আলেকজান্ডার লিখে চলল, পিতর ইভানিচ একটুকরো কাগজ টেবিল থেকে নিয়ে পাকিয়ে আগুন ধরালেন তারপর তাই দিয়ে চুরোটে অগ্নি সংযোগ করলেন। এবার কাগজখানা ফেলে দিয়ে পা দিয়ে থেঁতলে দিলেন।

আমার খুড়োমশাই দৈত্য বা দেবদূত কোনটাই নয়, আর সবার মতই একজন মানুষ—তিনি বলে চললেন, কিন্তু তিনি ঠিক তোমার আমার মত নন। তিনি সবকিছু দুনিয়ার নিরিখে ভাবেন আর অনুভব করেন। তাঁর কথা এই, আমরা যখন দুনিয়ায় বাস করছি, তখন আকাশে উড়ে যাওয়া উচিত নয়। কেউ তো অতদূর আমাদের যেতে বলে নি। দুনিয়ার ব্যাপার নিয়েই আমাদের থাকা উচিত—সেইটেই তো আমাদের কাজ। তাই তিনি দুনিয়ার যত ব্যাপার আর জীবন যা—সেইভাবেই গ্রহণ করেছেন, আমরা যেভাবে চাই সেভাবে নয়। তিনি ভাল মন্দতে বিশ্বাসী, সুন্দর আর কুৎসিতেও তাঁর বিশ্বাস। ভালবাসা আর বন্ধুতায়ও তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু একথা মনে করেন না যে, সেগুলি স্বর্গ থেকে আস্তাকুড়ে এসে পড়েছে। বরং মনে করেন, এগুলো মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই। মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে—আর সেইভাবেই ওগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। আর এগুলো যা সেইভাবেই তাদের খতিয়ে দেখতে হবে—অন্য কোনো মার্গে গিয়ে বিচার চলবে না। মানীলোকদের মধ্যে, আকর্ষণ থাকার সম্ভাবনা একথা তিনি স্বীকার করেন, আর বার বার যোগাযোগে এবং অভ্যাসে তা মিত্রতায়ও দাঁড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু একথাও তিনি ভাবেন যে, বিচ্ছেদের সময়ে এই

অভ্যাস তার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং মানুষ পরস্পরকে ভুলে যায়। আর সেটা আদৌ পাপ নয়। তিনি তাই আমাকে নিশ্চিত বলে জানিয়েছেন যে, আমি তোমাকে ভুলে যাব, তুমিও আমাকে ভুলে যাবে। এটা আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত লাগছে তোমার কাছেও হয়তো তাই লাগবে। কিন্তু তাঁর পরামর্শ এই যে, এই ধারণায় অভ্যস্ত হওয়া ভাল, এতে আমাদের বোকা সাজতে হবে না। ভালবাসা সম্পর্কেও এমনি তাঁর মতামত, একটু বা সেটা গরম। তিনি শাশ্বত, চিরবিশ্বস্ত প্রেমে বিশ্বাসী নন, যেমন ভূতে তাঁর বিশ্বাস নেই এও তেমনি এবং আমাদেরও সেই পরামর্শই দেন। এদিকে যথাসম্ভব কম মন দিতে তিনি আমাকে পরামর্শ দেন, আর আমিও যাতে তোমাকে সেই পরামর্শই দিই তাও বলেছেন। তিনি বলেন, আপনা থেকেই এটা আসবে, আহ্বান করার দরকার হবে না। জীবন তো শুধু ঐটেই নয়, এরও একটা সময় আছে, ভালবাসা ছাড়া আর কোন কিছুর কথা না ভেবে জীবন কাটানো তো বোকামি। যারা তা চায়, তারা তো মুহূর্তের জন্যও তাকে বাতিল করে দিতে পারেনা, হৃদয় নিয়েই তারা বাঁচে—আর সব চেয়ে খারাপ ব্যাপার—মনকে তার দাম দিতে হয়। আমার খুড়োমশাই কাজের মানুষ—তিনি আমাকেও তাই হতে বলেন—সেই পরামর্শ ই আমি তোমাকে দিচ্ছি। আমরা সামাজিক জীব, সমাজেরও আমাদের দিয়ে প্রয়োজন আছে—একথা তিনি বলেন। কাজের সময়, নিজের স্বার্থ তিনি ভোলেন না। ব্যবসা থেকে টাকা আসে—আর টাকাই মানুষের আরাম—সেই আরাম তার প্রিয়। তাছাড়া, তাঁর হয়তো অন্য ইচ্ছাও থাকতে পারে—তার জন্যেই তাঁর ওয়ারিশ হয়তো আমি হবনা। খুড়োমশাই সর্বদাই তাঁর কাজের কথা, কারখানার কথা ভাবেন না, তিনি পুশকিন ও আর আর কবিদের কবিতা তাঁর মুখস্থ।—

কাকা—আপনি? আলেকজান্দার অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

হাঁ। তুমিও একদিন বুঝতে পারবে। লিখে যাও, দুটি ভাষায় মানুষের জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখায় যা কিছু তথ্য বার হয়, তিনি তা পড়েন, ললিতকলা ভালবাসেন—ফ্লেমিশ স্কুলের চমৎকার চিত্র সংগ্রহ তাঁর আছে। ঐগুলোই তাঁর রুচি-মাফিক—প্রায়ই থিয়েটারে যান। কিন্তু এই নিয়ে হৈ চৈ করেন না। আবার কাতরানি, গোঙানিও নেই। ওগুলোকে

তিনি ছেলেমানুষী মনে করেন—আবেগ দমন করেন, অন্যের উপরে নিজের চিন্তাধারা চাপাতে চান না—তার কারণ অন্যের তো তা দিয়ে প্রয়োজন নেই। তিনি বেশি কথা বলেন না, আমাকেও না বলতে পরামর্শ দেন—আমিও তোমাকে সেই পরামর্শ দিচ্ছি। এখন আসি, যত কম সম্ভব চিঠি লিখো—সময় নষ্ট করোনা। তোমার বন্ধু ইত্যাদি-ইত্যাদি। এবার মাস আর তারিখ দাও।

এ চিঠি কি করে পাঠাই? আলেকজান্দার শুধালে। 'যত কম সম্ভব চিঠি লিখো' তাকে যে একশো মাইল পার হয়ে এসেছিল শুধু শেষ বিদায় সম্ভাষণ জানাতে! আমি এই এই সব করতে পরামর্শ দিচ্ছি। সেও আমার মতই চতুর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তালিকায় দ্বিতীয় হয়ে পাশ করেছে সে।

কিচ্ছু ভেবোনা—পাঠিয়ে দাও। হয়তো এতে ওর বুদ্ধি বাড়বে, যত নতুন ভাবধারা মগজে দেখা দেবে। তুমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুতে পার, কিন্তু তোমার সত্যিকারের শিক্ষা এই-ই শুরু হল।

কাকা, আমি এই চিঠি পাঠাতে পারব না।

আমি অন্যের ব্যাপারে নাক গলাইনে, কিন্তু তুমিই তোমার জন্য কিছু করতে বলেছিলে। আমি তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছি। তোমার প্রথম পা বাড়ানোটা সহজ করে দিতে চাই, আর তুমি আমাকে একগুঁয়ের মত বাধা দিচ্ছ। বেশ তো তোমার যা খুশী কর, আমি আমার মতামত জানালাম। তোমাকে বাধ্য তো করছিনে, আমি তোমার দাই-মা নই।

আমাকে মাপ করুন কাকা, আপনার কথা শুনতে আমি রাজী, আলেকজান্দার আর দ্বিরুক্তি না করে চিঠিখানা বন্ধ করে রাখল।

সে এবার সোফিয়ার কাছে লেখা সেই চিঠিখানার জন্য চারদিকে তাকিয়ে দেখলে। টেবিলের উপরে, নীচে বা দেরাজে—কোথাও নেই।

কি খুঁজছ, খুড়ো শুধালেন।

সোফিয়ার কাছে লেখা অন্য চিঠিখানা খুঁজছি।

খুড়োমশাই খোঁজায় সাহায্য করতে এলেন। কোথায় থাকতে পারে? বললেন, আমি তো জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিইনি—একথা বিশ্বাস করতে পার!

কাকা, আপনি কি করেছেন? আপনি চিঠিখানা দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছেন! আলেকজান্দার চিঠির পোড়া টুকরোগুলো জড়ো করতে করতে বিষণ্ণ হয়ে বললে।

তাই নাকি? খুড়ো চেঁচিয়ে উঠলেন। কি করে এমন কাজ করলাম? একবার নজরেও পড়ল না? দেখ তো অমন ধন-সম্পদ পুড়িয়ে ফেললাম? কিন্তু একটা কথা জান কি? একদিক দিয়ে বেশ ভালই হয়েছে।

তাই নাকি কাকা, কি করে যে ভাল হল বুঝতে তো পারছিনে, আলেকজান্দার হতাশ হয়ে বললে।

হয়েছে—সত্যিই হয়েছে। এই ডাকে চিঠি দেওয়ার সময় পাবেনা, আর পরের ডাক যাবার আগেই তোমার হয়তো মতই বদলে যাবে, নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, অন্য জিনিসের কথা ভাববে। তাতে বোকামিও কম করবে।

আমাকে ও কি ভাববে?

যা খুশি ভাবুক না। আমার বিশ্বাস, এ তার পক্ষেও ভাল হবে। তুমি তো তাকে বিয়ে করতে চাওনা? চাও না কি? সে ভাববে, তুমি তাকে ভুলে গেছ, সেও তোমাকে ভুলে যাবে। তার ভবিষ্যৎ প্রেমিকের সঙ্গে যখন দেখা হবে, তাকে লজ্জিত হতে হবে না। এবং একথাও হলফ করে বলতে বাধবে না যে সে তাকে ছাড়া কাউকে কখনো ভালবাসে নি।

কাকা, আপনি অদ্ভুত লোক। আপনার কাছে বিশ্বাসের কোন দাম নেই, প্রতিশ্রুতি ও আপনার কাছে পবিত্র নয়। জীবন এমন সুন্দর, এমন আনন্দ আর সুখে ভরা, সে যেন এক মসৃণ মুগ্ধকর হ্রদ।

তাতে সরষে ফুল নিশ্চয়ই জন্মায়, খুড়োমশাই বাধা দিলেন।

সে যেন এক হ্রদ—আলেকজান্দার বলতে লাগল—জীবন রহস্যপূর্ণ—প্রলুব্ধ করে সে—অনেক কিছু সে লুকিয়ে রাখে।

বন্ধু, সে এঁটেল মাটি।

কাকা, আপনি পাঁক খুঁড়ে বার করবেন কেন? কেন সমস্ত আশা আনন্দ, সুখ নষ্ট করবেন? কেন অন্ধকার দিকটাই দেখবেন?

আমি প্রকৃত দিকটাই দেখি—আর তোমাকেও তা দেখতে বলি। তাহলে আর বোকা বনতে হবেনা। তোমার জীবনের যে ধারা সেটা

জায়েই বেশ মানায়, সেখানে লোকে জীবন সম্পর্কে কিছু জানে না। সেখানে মানুষ থাকে না, থাকে দেবতারা। আয়েজলিচ একজন সাধুসন্ত, তোমার মাসীর আত্মা উঁচু দরের, সংবেদনশীল। আর সোফিয়া তোমার মাসীর মতোই মস্ত বড় আহাম্মক, ওরা দুজনেই বোধ হয়......

কাকা, বলে যান, রেগে উঠল আলেকজান্দার।

দুজনেই তোমার মত নিঃসন্দেহে স্বপ্নবিলাসী। সব সময়েই শাশ্বত বন্ধুত্ব আর প্রেমের জন্ম ভুঁকে বেড়ায়। একশোবার তোমাকে বলছি—তোমার এখানে আসা উচিত হয়নি।

যেমন সে তার প্রেমিককে বলবে, আগে সে কখনো ভালবাসে নি? আলেকজান্দার আপন মনেই যেন বললে।

এখনো ঐকথা ভাবছ?

বরং সরলভাবে সে নিশ্চয়ই আমার চিঠিগুলো তাকে দেখাবে, আর—আর দেখাবে স্মৃতিচিহ্ন—পিওত্র ইভানিচ যোগ করে দিলেন।

হাঁ আমাদের সম্পর্কের স্মৃতিচিহ্ন দেখাবেই। সে তাকে বলবে, ও-ই প্রথম আমার হৃদয়ের তন্ত্রী স্পর্শ করেছিল। ঐ নামেই প্রথম তারা সাড়া দিয়েছিল।

পিওত্র ইভানিচের ভ্রূ ঊর্ধ্বগামী, চোখ বিস্ফারিত। বললেন আলেকজান্দার নীরব কেন, এখন কি তন্ত্রীতে ঘা মারা থামিয়েছ? বৎস, আমি এইটুকু বলতে পারি, তোমার সোফিয়া যদি অমনি কিছু করে বসে, সে একটি বোকা। আমার বিশ্বাস তার মা আছেন, তিনি নয়তো অন্য কেউ বাধা দেবেন।

আর আপনি এই আত্মার পবিত্রতম প্রেরণাকে, হৃদয়ের এই মহান আবেগকে বোকামি বলতে চান কাকা? আমি আপনার সম্বন্ধে কি ভাবব বলুন তো?

যা ইচ্ছে। সে তার প্রেমিকের কত সন্দেহেরই না উদ্রেক করবে। বিয়েও ভেঙে যেতে পারে—আর সেটা কি কারণে? একদা শুধু হলদে ফুল দুজনে মিলে তুলেছিলে বলে! ওভাবে কাজ হয় না! তুমি যখন রুশ ভাষা ভাল লিখতে পার, কাল আমরা অফিসে যাব। আমার একজন পুরানো সহকর্মীকে তোমার কথা বলেছি, সে এখন একটা দপ্তরের কর্তা। সে বলেছে,

একটা চাকরি খালি আছে। দেরী করার সময় নেই। তোমার হাতে ঐ কাগজের বাণ্ডিলটা কিসের?

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের নোট। গ্রীক ললিতকলার উপরে ইভান সেমিনোভিচের বক্তৃতার কিছুটা আপনাকে পড়ে শোনাই।

সে এরই মধ্যে দ্রুত পাতা ওলটাতে শুরু করেছে।

রক্ষে কর বাপু, পিতর ইভানিচ চেঁচিয়ে উঠলেন চোখমুখ কুঁচকে, ওগুলো কি?

ওগুলো আমার গবেষণা-প্রবন্ধ। আমার ভবিষ্যৎ উপরওলাকে দেখাতে চাই। বিশেষ করে একটা পরিকল্পনা তো আমারই করা।

যে পরিকল্পনা হাজার বছর আগে হয়ে গেছে, নয় তো যে পরিকল্পনা কখনো কার্যকরী হবে না।

কেন কাকা! একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদকে দেখানো হয়েছিল। তিনি এরই জন্য সত্যি সত্যি রেক্টর আর আমাকে দুপুরের ভোজে ডেকেছিলেন। এই যে, আর একটার শুরু।

আমার সঙ্গে দু-দুটো দুপুরের ভোজ খেয়ো, কিন্তু আর পরিকল্পনা শেষ করতে যেয়ো না।

নয় কেন?

কারণ, তুমি এখন ভাল কিছু লিখতে পারবে না—শুধু শুধু সময় যাবে।

কি বললেন? অতগুলো বক্তৃতা শোনার পরও তা হবে?

সময়মত সেগুলো কাজ দেবে, এখন তোমাকে দেখতে হবে, পড়তে হবে, শিখতে হবে, যা বলা হবে তাই করবে।

আমি কি করতে পারি না পারি উপরওলা কি করে জানবেন?

তিনি চট্‌ করে বুঝে নেবেন। এ বিষয়ে তিনি ঝুনো। কি রকমের কাজ তুমি চাও?

কাকা, আমি তো জানি না—কি রকমের—

মন্ত্রী আছে—পিতর ইভানিচ বললেন, উপমন্ত্রী আছে, ডিরেক্টর, সহকারী ডিরেক্টর, দপ্তরের প্রধান, প্রধান কেরানী, তাদের সহকারী, বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যও কেরানী আছে। বেছে নেওয়ার পক্ষে কি অনেক নয়?

আলেকজান্দার ভাবতে লাগল। এমন পছন্দের বহরে গুলিয়ে গেছে মাথা।

আমি প্রধান কেরানী হয়েই শুরু করব, সে বললে।

তা করতে পার, পিতর ইভানিচ সায় দিলেন।

কাকা, আমি কাজ শিখে নিয়ে একমাস কি দুমাস পরে দপ্তরের কর্তা হতে পারব।

ইভান ইভানিচ কান খাড়া করে রইলেন। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই! তিনি হাসলেন। আর তিনমাস পরে তুমি ডিরেক্টর হতে পারবে, একবছর পরে—মন্ত্রী হবে, কি বল? কেমন পছন্দ তো?

আলেকজান্দার লজ্জিত, নিরুত্তর সে। একটু থেমে বললে, দপ্তরের কর্তা আপনাকে কি চাকরী খালি আছে সেকথা বলেন নি?

না, খুড়ো উত্তর দিলেন, চাকরীটি কি. তিনি বলেননি, যাহোক, সেটা তাঁর উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। দেখছ তো, বেছে নেওয়া কত শক্ত, কোনটা সবচেয়ে ভাল হবে, সেটা তিনিই জানেন। তাঁকে বাছাইয়ের গণ্ডগোলের কথা বলো না, আর তোমার পরিকল্পনার কথাও না, তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছ না বলে হয়ত ক্ষুব্ধ হবেন, তোমাকে বাতিলও করে দিতে পারেন। বড় কড়া মানুষ। আর পিটার্সবুর্গের সুন্দরীদের কাছে স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নের কথা বলো না—সেটাও আমার পরামর্শ। ওরা বুঝতে পারবে না। কি করে বুঝবে? ওদের মগজের নাগালের বাইরে ওসব, আমি নিজেই তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

খুড়োমশাই যখন কথা বলছিলেন, আলেকজান্দার একটা কাগজের পুলিন্দা এক হাত থেকে আর এক হাতে নিচ্ছিল।

ওটা কি হাতে?

আলেকজান্দার ঐ প্রশ্নটার জন্যেই অসহিষ্ণু হয়ে অপেক্ষা করছিল।

ওটা·· আমি বহুদিন থেকেই আপনাকে কতগুলো কবিতা দেখাতে চাই। আপনি একবার ও-গুলোর কথাও বলেছিলেন।

মনে পড়ছে না। বলেছিলাম বলে তো মনে হয় না।

কাকা, আমি অফিসের কাজ গদ্যময় বলে মনে করি, সেখানে আত্মার কোন ভূমিকা নেই। আত্মা যে নিজের প্রকাশের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে, আত্মা যে অনুভূতি আর ভাবধারায় পরিপূর্ণ, সে মানুষের সঙ্গে তা ভাগ করে পেতে চায়—

বেশ তো, তাতে কি হল? খুড়োমশাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন।

আমি মনে করি সৃষ্টিটাই আমার পেশা।

অফিসের কাজের উপরে আরো কিছু করতে চাও—তোমার কথায় এই ভাষ্য করা চলবে কি? বেশ তো, খুবই প্রশংসার কথা। তুমি কি করতে চাও—সাহিত্য?

হাঁ, কাকা, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম—আপনি কি কখনো কিছু ছাপা'র সুযোগ পেয়েছেন?

তোমার প্রতিভা আছে এ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত? তাছাড়া তুমি কলার ক্ষেত্রে এক আনাড়ি শ্রমিক হয়েই থাকবে, তাতে লাভই বা কি? যদি প্রতিভা থাকে, তাহলে আলাদা কথা, কাজ করার দাম পাবে, বেশ কিছু করতে পারবে। ওটা মূলধন। তোমার ঐ একশো ঘর প্রজার থেকে ওর দাম ঢের বেশী।

এটাও আপনি টাকার অঙ্কে মাপছেন?

তাছাড়া কি করব? যত বেশী লোক তোমার লেখা পড়বে, তোমাকে ও তত বেশী টাকা দেওয়া হবে।

আর খ্যাতি? খ্যাতিই তো সঙ্গীতকারের সত্যিকারের পুরস্কার।

সঙ্গীতকারকে লালন-পালন করে খ্যাতি হাঁপিয়ে উঠেছেন। প্রার্থীর সংখ্যা আজ অগণিত। আগেকার দিনে, খ্যাতি মেয়েদের মতো যার-তার সঙ্গে জুটে যেত—কিন্তু আজকাল—লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই—সে মিলিয়ে গেছে, লুকিয়ে আছে। কুখ্যাতি আছে। কিন্তু খ্যাতির নামও কেউ শোনে না। নয়তো সে বোধহয় নিজেকে জাহির করার এক নতুন উপায় আবিষ্কার করেছে—যারা সবচেয়ে সেরা লেখে, তারা সবচেয়ে বেশি টাকা পায়—যারা অতো ভাল লিখতে পারে না—তাদের রচনা করে লাভ নেই। যাহোক, ভাল লেখকেরা এখন ভাল জীবন কাটায়, তারা তুষারে জমে যায় না, চিলে কোঠায় উপোস করে মরে না, লোকে তাদের পেছনে আর পথে ছোটে না, তাদের বিদূষকের মত আঙুল দিয়ে দেখায় না। মানুষ বুঝেছে, কবি স্বর্গের বাসিন্দা নয়, সে আমাদের সকলেরই মত তাকায়, হাঁটে, ভাবে, বোকামিও করে। তাহলে কেন হাঁ করে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা?

আমাদের সকলের মত ? কাকা, আপনি কি করে একথা বললেন ? কবির তো বিশিষ্ট ছাপ আছে—তার বুকে আছে এক মহান শক্তি।

যেমন গণিতবিদ্ ঋদ্ধিগুণ বা আমাদের মত কারখানার মালিকদেরও থাকে। নিউটন, গুটেনবার্গ, ওয়াট, শেকস্পীয়ার, দান্তে আর অন্য সব কবিদের মতই মহান শক্তির অধিকারী। যদি একবার কোন রকমে আমাদের পাভ্লোগোলোভো মাটির উন্নতি করতে পারি আর তাতে জার্মানীর আর সেভ্রেস-এর বাসনের থেকে ভাল চীনেমাটির বাসন তৈরী করা যায়, তখন কি মহান শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে না ?

কাকা, আপনি ললিতকলার সঙ্গে কারুকলাকে গুলিয়ে ফেলছেন।

ঈশ্বর না করুন ! ললিতকলা এক জিনিস, আর কারুকলা আর এক জিনিস, কিন্তু দুটোরই সৃষ্টির সূত্র থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। যদি না থাকে, কারিগরকে কারিগরই বলা হয়, শিল্পী বলা হয় না, কবিকেও কবি বলা হয় না, বলা হয় শুধু কবিতালেখক। তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে কি একথা বলে নি ? কি শেখাল ওরা ?

এমন একটা সাধারণ-গ্রাহ্য সত্য ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়ে নিজের উপরই বিরক্ত হলেন পিতর ইভানিচ। আপন মনে বললেন, এযে সত্যি-কারের ভাবাবেগের মতই ব্যাপার। জোরে বললেন, কি আছে দেখাও—কবিতা নাকি ?

তিনি পুলিন্দাটা নিয়ে প্রথম পাতার উপর চোখ বোলালেন।

> কোথা হতে এল এই বিষাদিত কল্পনা
> এক অনাহূত ভিড় করে
> ভেসে এল।
> আশা-আকাঙ্খাকে হত্যা করে চলে গেল।

আলেকজান্দার আমাকে একটু আগুন দাও তো ?

তিনি চুরুট ধরিয়ে আবার পড়তে লাগলেন,

> গভীর বিষাদে আমাদের আত্মা সংবৃত কি ?
> কেন হঠাৎ আঁধারময় দুঃখ
> আত্মাকে গভীর ঘুমে ডুবিয়ে দেয় ?

কোন্ এক অজানা ভয়

অতর্কিতে এসে দেখা দেয়।

এক কথা দিয়েই চার-চারটে পঙ্ক্তি তৈরি বেশ মেশানো হয়েছে বটে! পিওত্র ইভানিচ মন্তব্য করলেন, তারপর আবার পড়তে লাগলেন:

আমাদের মত মরণশীল মানুষের কণ্ঠে, কে জানে

কেন, হঠাৎ শিশিরের মত অশ্রু

বিবর্ণ কপালে দেখা দেয়?

এটা কি হল? ঘামই কপালে দেখা দেয়, কিন্তু অশ্রু তো কখনো দেখি নি।

অজানা অশুভ আসছে তারই চিহ্ন

আকাশের নীরবতার নীচে

কি যেন ভয়ঙ্কর আর ভীষণ অর্থ নিহিত।

ভয়ংকর আর ভীষণতা তো একই কথা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—বিবর্ণ স্থির

হাঁ, এবার নির্ঘাৎ চাঁদ আছে! ওছাড়া চলে না, যদি দিবাস্বপ্ন আর কুমারীতে মিল দাও—তুমি গেলে। তোমার আশা তাহলে ছেড়ে দিতে হবে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখিলাম—বিবর্ণ স্থির

চাঁদ ভেসে যায়, নিস্তব্ধতায় মোড়া

কি যেন বলে এখানে

পাওয়া যায় সেই নিয়তিময় রহস্য।

মন্দ নয়! আমাকে আর একটু আগুন দাও তো, চুরুটটা নিবে গেছে। কোথায় যেন পড়ছিলাম, হাঁ—এই যে—

ভয়ংকর নিস্তব্ধ তারারা

বিন্দু এঁকে যায়

রহস্যময় নৈশ উর্দ্ধে

তারা কেউ কেউ এক পাপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

ছলনার আলোয় তারা চকমক করে,

আবার কারো কাছে বা বিশ্রামভরা

রাত—শান্তিতে তাদের আত্মা যেন
ভরপুর।
ঘুমন্ত পৃথিবী ঘৃণায় পূর্ণ
বিশ্বের সবকিছুই অশুভ ইঙ্গিত আনে—
কুরে-খাওয়া দুঃখের কোন নাম নেই।

পিওত্‌র ইভানিচ সাড়ম্বরে হাই তুলে আবার শুরু করলেন।

কিন্তু দুঃখ অগ্নিশিখার মতই
মিলিয়ে যেতে পারে।
একটু জ্বলে, তারপর নিবে যায়,
মরে যায়।
একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়, আর জেগে ওঠে না।

এবার আপন মনে পড়তে লাগলেন :

তারপরে, হয়তো আর এক অশরীরী
আমাদের মনে এসে বাসা বাঁধে
তারপরে আসে আনন্দের অনুভূতি
আমাদের আত্মায় সে এসে প্রবেশ করে।

ভালও নয়, মন্দও নয়, শেষ করে বলে উঠলেন। কেউ কেউ এর চেয়েও খারাপ লিখে শুরু করে। লিখে যাও, কাজ করে যাও—যদি অবশ্যি তোমার তাই পছন্দ হয়, হয়তো প্রতিভাও দেখাবে! তখন তো আলাদা কথা।

আলেকজান্দার বিমর্ষ। সে অন্য রকম আশা করেছিল। যাই-ই হোক, এই ভেবে একটু সান্ত্বনা পেল যে তার খুড়োটি একটি আত্মাহীন, একেবারে শীতল জীব। এইটে শিলারের অনুবাদ, সে বললে।

ভাল কথা। তাইতো দেখছি. তুমি কি অনেক ভাষা জান?

আমি ফরাসী, জার্মান আর একটু-আধটু ইংরেজী জানি।

বেশ, বেশ—আগে বলনি কেন? যাহোক, একটা কিছু তো হতে পারে। তুমি আমাকে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব—ঈশ্বর জানেন আরও কি কি সব বলেছ—অথচ এমন জরুরী কথাটা বলনি—এ তোমার অকারণ বিনয়। তোমাকে এক্ষুণি লেখার কাজ যোগাড় করে দেব।

দেবেন কাকা? আপনার কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব, আলিঙ্গন করতে দিন!

দাঁড়াও, আগে কাজ যোগাড় করে দিই।

আপনি কি আমার হবু উপরওলাকে আমার কিছু লেখা দেখাবেন না, যাতে তিনি আমাকে কি কাজ দেবেন সে সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পারেন?

না, না! যদি দরকার হয় তো, তুমি নিজেই দেখাতে পারবে। হয় তো দরকার হবে না। তুমি কি তোমার ঐ পরিকল্পনা আর অন্য লেখাগুলো আমাকে উপহার দেবে?

উপহার দেব? নিশ্চয়ই কাকা, আলেকজান্দার খুড়োর অনুরোধে স্ফীত হয়ে উঠল—আমি কি একটার পর একটা সাজিয়ে দেব?

না, কষ্ট করার দরকার নেই। উপহারের জন্য ধন্যবাদ। ইভেশি এই কাগজগুলো ভ্যাসিলিকে দাও গে।

ভ্যাসিলিকে কেন? আপনার অফিস ঘরে নিয়ে যাক।

সে ট্রাঙ্কের ভিতরে পাতার জন্য কতগুলি কাগজ চেয়েছিল সেদিন।

কাকা! আলেকজান্দার পুলিন্দাটা ছিনিয়ে নিয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু ওগুলো তো তুমি আমাকে—তোমার উপহার দিয়ে কি করি না করি তা তোমার ব্যাপার নয়।

আপনার কাছে কি কিছুই পবিত্র নয়, কিছুই না? আলেকজান্দার দুই হাত দিয়ে পুলিন্দাটা বুকে চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠল।

আলেকজান্দার শোন, পিতর ইভানিচ পুলিন্দাটা ভাইপোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে নিতে বললেন—পরে এর জন্য তোমাকে লজ্জিত হতে হবে না, আর আমাকে তখন ধন্যবাদ দেবে।

আলেকজান্দার পুলিন্দাটা ছেড়ে দিলে।

পিতর ইভানিচ বললেন, ইভেশি, এই নাও, নিয়ে যাও! এখন তোমার ঘরখানা দিব্যি পরিষ্কার হল—জঞ্জাল আর রইল না। জঞ্জালে ভরে উঠবে, না, কাজের জিনিস থাকবে ঘরে—তোমার উপর তা এখন নির্ভর করছে। আমরা খোলা হাওয়া পাবার জন্য এখন গাড়ি করে কারখানায় যাব, সেখানে গিয়ে কি রকম কাজ হচ্ছে দেখব।

পরদিন সকালে পিতর ইভানিচ ভাইপোকে অফিসে নিয়ে গেলেন। দপ্তরের কর্তা তাঁর বন্ধু, তিনি যখন আলাপে রত, আলেকজান্দার তখন এই নতুন দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হল। তার পরিকল্পনার স্বপ্নেই সে সব সময়ে বিভোর, রাষ্ট্রের কোন সমস্যা তাকে সমাধান করতে দেওয়া হবে সেই ভেবেই মাথা ঘুরছে, কিন্তু ইতিমধ্যে সে চারিদিকে তাকিয়েও দেখলে।

অবশেষে সে সিদ্ধান্তে এল, এ তো কাকার কারখানার মতোই। ওখানে একজন একতাল মাটি তুলে নেয়, কলের ভিতরে ফেলে দিয়ে ঘোরায়, তার পরে চূড়া দেখা দেয়, আবার ডিমের মত নয়তো গোল আকার দেখা দেয়, তারপরে পরের লোকটিকে দেয়, সে আগুনে শুকিয়ে তৃতীয় মানুষটির কাছে দেয়। সে গিল্টি করে দেয়। চতুর্থ মানুষটি একটা নকসা আঁকে—এমনি করেই পেয়ালা, ফুলদান কি পিরিচ তৈরি হয়। আর এখানে অপরিচিত আবেদন-নিবেদনকারীরা আসে, কাগজখানা দেবার সময় নুয়ে পড়ে করুণ হাসি হাসে। একজন সেখানা নিয়ে গিয়ে কলম দিয়ে একটু ছুঁয়ে দেয়, তারপর অন্যের কাছে দেয়, সে অমন হাজারখানা কাগজের উপরে ফেলে রাখে, কিন্তু হারায় না—সংখ্যা আর তারিখ লেখে দেখে ষ্ট্যাম্প মেরে দেয়—তারপর অন্তত কেছে অমন বিশ জনের হাত দিয়ে চলে যায় সেই কাগজ। ঐ একই রকম কাগজ বাড়তে থাকে, দ্বিগুণ হয়। তৃতীয় একজন সেটি তুলে নেয়, আলমারী খোলে, একখানা বইয়ে বা কাগজে উঁকি মেরে দেখে, চতুর্থ ব্যক্তিকে কয়েকটি গোপন কথা বলে, তার কলম অমনি ব্যস্তভাবে খসখসানি শুরু করে দেয়। যখন তার কলমের খসখসানি শেষ হয় চতুর্থ লোকটি আসল দলিলটি আর একটি কপি দলিল-সমেত পঞ্চম মানুষটির কাছে দেয়। তার কলমও পরিশ্রম সহকারে খস-খসিয়ে চলে, আর একখানা দলিলের জন্ম হয়। আর দলিলখানি এবার ঘুরতে থাকে, কখনো হারায় না—দলিলের আদি জনক হয়ত মারা যেতে পারে, কিন্তু এখানা আরো শত বছর পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকবে। যুগ যুগ ধরে ধুলোয় ঢাকা পড়লেও সেখানাকে আবার খুঁচিয়ে তোলা আর দেখা চলতে পারে। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আজ, আগামী কাল, চিরদিন, আমলাতন্ত্রের যন্ত্রটি মসৃণ, অপ্রতিহতভাবে কাজ করে চলে। কখনো থামে না। যেন মানুষ বলে কোন জীব নেই—শুধু আছে চাকা আর গতির কগুলি।

আলেকজান্দার অবাক হয়ে ভাবলে, কোথায় সেই মন যে এই কাগজের কারখানাতে প্রাণ সঞ্চার করবে, তাকে গতিশীল করে তুলবে? সে কি ঐ খাতাগুলিতে, ঐ কাগজে, অথবা ওদের মগজে?

আর মুখগুলি! অমন মুখ পথে দেখতে পাবে না। মুখের মালিকরা দিনের আলোয় বুঝি মুখ দেখায় না। এইখানেই বোধ হয় তাদের জন্ম হয়েছে, তারা পালিত হয়েছে—বেড়ে উঠেছে কাজের সঙ্গে সঙ্গে—আবার কাজ করতে-করতেই মরছে। আলেকজান্দার দপ্তরের কর্তাকে ভাল করে দেখে নিলে। গর্জনকারী জেহোভার যেমন মার্কারীকে আদেশের জন্য শুধু মুখ খুলতে হয়, তেমনি তাঁর হুকুমে ঝকমকে তকমা-আঁটা কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে। একখানা কাগজ শুধু হাতে বাড়িয়ে ধরার অপেক্ষা, অমনি এক ডজন হাত সেখানা নেবার জন্য এগিয়ে যাবে

ইভান ইভানিচ! তিনি বললেন।

ইভান ইভানিচ তার আসন থেকে লাফিয়ে উঠে জোভ-এর কাছে গিয়ে হাজির। পোকারের মতই একেবারে অনড় হয়ে দাঁড়াল। আলেকজান্দারের বুক ঢুক ঢুক কেঁপে উঠল—কেন কাঁপছে সে নিজেই বলতে পারে না।

এক টিপ নস্যি দাও তো!

দাস-সুলভ ব্যগ্রতায় উন্মুক্ত নস্যিদানী দুহাতে ধরে এগিয়ে দিলে ইভান ইভানিচ।

একে পরীক্ষা করে নাও! কর্তা আাডুয়েভ-এর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

আলেকজান্দার ইভানিচের বার্দ্ধক্যগ্রস্ত চেহারা আর তার কোটের ঘষা-খাওয়া আস্তিনের দিকে তাকিয়ে ভাবলে, এই লোকটা আমাকে পরীক্ষা করবে? এমনি লোক কি রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধান করতে পারে?

হাত কেমন—ভাল? ইভান ইভানিচ শুধালে।

হাত?

হাঁ—হাতের লেখা। এইখানা নকল কর তো!

আলেকজান্দার এই দাবি শুনে অবাক হয়ে গেল। তবু তাকে যা করতে বলা হল করলে। আলেকজান্দারের লেখা দেখে ইভান ইভানিচ চেহারাখানা কুঁচকে ফেললে।

দপ্তরের কর্তাকে জানালে, খারাপ লেখা, তিনিও কাগজখানার দিকে তাকালেন।

হাঁ—একেবারে বাজে। ভাল করে নকল করতে পারে না। অনুমতি-পত্রগুলো প্রথম ও নকল করুক, যখন কাজ শিখবে, তখন ফর্মগুলো পূরণ করতে দিয়ো। হয়তো ওকে দিয়ে চলবে—ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পেয়েছে।

শীঘ্রই আদ্রিয়েনও কলের চাকার একটি দাঁত হয়ে দাঁড়াল। সে অবিরাম লিখতে লাগল, সকালে আর কিছু করা যায়, সে তা ভাবতেই পারে না। তার পরিকল্পনার স্মৃতি শুধু তার গালে লজ্জার রক্তিম চাই এনে দেয়।

কাকা, আপনি সত্যই বলেছেন, আপন মনে সে বলে, নির্মম সত্য। আপনি কি এমনি সব বিষয়েই ঠিক বলেন? আমি কি সত্যিই আমার গোপন অনুপ্রেরণা আর প্রেম, বন্ধুতা, মানুষ আর নিজের সম্পর্কে উদগ্র বিশ্বাসে ভুল করেছিলাম? জীবনের মানে কি?

সে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে আরো জোরে খস্‌খসিয়ে লিখে চলল, চোখের পাতা চকচক করছে জলে।

পিওতর ইভানিচ ভাইপোকে বললেন, তোমার উপরে ভাগ্য সত্যই সুপ্রসন্ন। আমি বিনে মাইনেয় শুরু করেছিলাম, আর তুমি উচ্চ কর্মচারীদের হারে মাইনে পাচ্ছ, এতে সাড়ে সাতশো রুবল হবে, আর ভাতা মিলে সেটা গিয়ে দাঁড়াবে এক হাজার রুবলে। শুরু তো বেশ ভালই হয়েছে! দপ্তরের কর্তা তোমার সম্পর্কে ভালই বলেছেন, তবে একথাও বলেন—তুমি অন্যমনস্ক—কখনো কখনো, কমা দিতে ভুল কর, কখনো বা দলিলের কিছুটা ছেড়ে দাও। তোমাকে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—চারদিকে কি হচ্ছে দেখবে—অমন করে অজানায় উড়ে যেয়ো না।

পিওতর ইভানিচ উপর দিকে নির্দেশ করলেন। এখন থেকে তিনি ভাইপোর প্রতি আরো যেন স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠেছেন।

কাকা, আমাদের প্রধান কেরানীটি কি চমৎকার মানুষ, একদিন আলেকজান্দার বললে।

তোমার কিসে মনে হল?

আমাদের খুব ভাব হয়েছে। এমন উন্নত তাঁর মন, এমন পবিত্র, মহান

তাঁর ভাবধারা! আর সহকারীটিও তাই—একেবারে দৃঢ়চেতা, অনমনীয় মানুষ।

এরই মধ্যে তার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে ফেললে?

নিশ্চয়ই!

তোমাদের প্রধান কেরানীটি কি তাঁর বৃহস্পতিবারের রাত্রির অনুষ্ঠানে তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।

অত্যন্ত পীড়াপীড়িই করেছেন! প্রতি বৃহস্পতিবারেই যেতে হবে। আমাকে খুব পছন্দ হয়েছে বলে মনে হয়।

আর সহকারীটি কি তোমার কাছে ধার চেয়েছেন?

হাঁ—কাকা—সামান্য ধার। আমার কাছে পঁচিশ রুবল ছিল, দিয়েছি। সে আরও পঞ্চাশ চেয়েছে।

কিছু দিয়ে ফেলেছ দেখছি! পিতর ইভানিচ বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমাকে সাবধান করে দিইনি—আমারই কিছুটা দোষ হয়ে গেছে। এক পক্ষকালের মিতালিতে তুমি যে টাকা ধার দিয়ে বসবে আমি তোমাকে এত বোকা ভাবতে পারিনি। যাক—কি আর করা যাবে—আমরা লোকসানটা ভাগ করে নেব। তুমি ধরে নাও, আমি তোমার কাছে সাড়ে বারো রুবল ধারি।

কিন্তু কাকা, নিশ্চয়ই সে ধার শোধ দেবে!

দেবেই না! আমি তাকে চিনি। আমি ওখানে যখন কাজ করতাম, তখন ও আমার কাছে একশো রুবল ধারে। সকলের কাছেই ওর ধার। আবার যখন ধার চাইবে, তখন বলো, আমি আমার কাছে ধারের কথা মনে করিয়ে দিতে বলেছি—তোমাকে ও তাহলে রেহাই দেবে। আর মনে রেখো, প্রধান কেরানীর বাড়িতে যাবে না।

কেন কাকা?

ও এক জুয়াড়ি। ওর মতো কয়েকজন মানুষের পাশে তোমাকে বসাবে, আর ওরা ভাগাভাগি করে তোমাকে ফতুর করে দেবে।

জুয়াড়ি! আলেকজান্দার অবাক হয়ে বললে, তা কি সম্ভব! উনি তো সত্যিকারের ভাবপ্রবণ মানুষ!

ওকে কথায় কথায় বলো, তোমার সমস্ত টাকাকড়ি আমার কাছে

থাকে। তখন দেখবে—ইনি কেমন খাঁটি ভাবপ্রবণ মানুষ—আর তোমাকে কেমন আবার সুসম্পর্কিতভাবে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করবেন।

আলেকজান্দার গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। খুড়োমশাই মাথা নাড়লেন। বললেন, তুমি কি সত্যিই ভাব নাকি তোমার চারদিকে দেবদূত ঘিরে আছে! খাঁটি ভাবাবেগ! তোমাকে পছন্দ হয়েছে! বোধ হয় তোমার মনেই হয় না যে, ওদের মধ্যে ধর্মাবেশ আছে। তোমার এখানে আসাই উচিত হয় নি! সত্যিই আসা উচিত হয় নি।

একদিন, আলেকজান্দার সবে ঘুম থেকে উঠেছে, এমন সময় ইভেসি একখানা বড় খাম আর একখানা চিরকুট এনে হাতে দিলে। তার খুড়োমশাই এগুলো পাঠিয়েছেন।

লিখেছেন, তোমার জন্য কিছু লেখার কাজ অবশেষে জুটেছে। কাল একজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তিনি আমাকে কিছু কাজ দিয়েছেন—তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।

আলেকজান্দারের হাত খাম খুলতে খুলতে উত্তেজনায় কাঁপছিল। জার্মান ভাষায় লেখা কাগজ।

এ কি? সে বললে, গল্প না কি? কি নিয়ে লেখা।

উপরের পেন্সিলে লেখা কথাকটি সে পড়ল।

'মাটি'—কৃষি বিভাগের জন্য লেখা প্রবন্ধ। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনুগ্রহ করে অনুবাদ করে দিন।

সে অনেকক্ষণ ধরে পড়ে ভেবে দেখল, তারপরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কলম তুলে নিয়ে অনুবাদ করতে লাগল। দুদিন পরে প্রবন্ধটি শেষ করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কয়েক দিন পরে খুড়োমশাই তাকে বললেন, চমৎকার! চমৎকার! সম্পাদক মশাই খুশী হয়েছেন, যদিও তাঁর মতে তোমার রচনা তেমন গুরুগম্ভীর নয়। কিন্তু সব কিছুই এত সহজে আশা করা যায় না। তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কাল তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যা সাতটার সময় দেখা করতে যেয়ো—তোমার জন্যে আর একটা প্রবন্ধ রেখেছেন।

কাকা, ঐ একই বিষয়ে নাকি?

না—আর এক বিষয়। বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গেছি। ও—

হ্যাঁ—খালু সম্পর্কে। আলেকজান্ডার, সত্যিই তুমি রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছ। আমি আশা করছি, তোমার কিছু হবেই হবে। হয়তো একদিন আসবে, তখন আর তুমি এখানে কেন এসেছ—একথা জিজ্ঞেস করব না। তোমার আসার পরে এক মাসও যায় নি, সব কিছু যেন আপসে-আপ এসে যাচ্ছে তোমার কাছে।

একহাজার রুবল মাইনে, একজন সম্পাদক তোমাকে একটা প্রবন্ধের জন্য একশো রুবল দিচ্ছেন—তার মানে হল ছহাজার ছশো রুবল। আমিও এভাবে শুরু করি নি—একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন—তোমার মাকে চিঠি লিখো যে, কি করে কাজ পেয়েছ। আমি নিজেও তাঁকে চিঠি লিখব। তাঁকে বলব—তাঁর দয়া আমি মনে রেখেছি। তোমার জন্য যা করবার করেছি।

কাকা, আমার মা আপনার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ থাকবেন, আমিও থাকব—আলেকজান্ডার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—সে আর কাকাকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলে না।

তিন

দুবছরেরও বেশি কেটে গেল। এই আদব-কায়দা-দুরস্ত আর বেশ-ভূষায় ছিমছাম যুবকটিকে দেখে কে চিনবে আমাদের সেই পাড়াগেঁয়ে ছোকরাকে? বহু পরিবর্তন তার হয়েছে, সে এখন পরিপূর্ণ যুবক। তার তরুণ মুখের কোমল রেখা, চামড়ার স্বচ্ছতা—চিবুকের লোম—সব এখন মিলিয়ে গেছে—আর গেছে সলজ্জ ভীরুতা—আর বেখাপ্পা অঙ্গ-সঞ্চালন। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এখন পরিণত—তার মুখ চরিত্র-ব্যঞ্জক। লিলি আর গোলাপ রঙ্ তাম্রাভার নীচে মিলিয়ে গেছে, চিবুকের লোমের বদলে এখন ছোট চাপদাড়ি। তার হালকা চালের লাফিয়ে চলা এখন দৃঢ় অথচ মসৃণ! স্বরে কিছুটা গাম্ভীর্য আমদানী হয়েছে। রেখাচিত্র এখন সমাপ্ত ছবিতে পরিণত। তরুণ এখন পূর্ণ মানুষ। চোখে আস্থা আর সাহস ঝলসে ওঠে—যে সাহসের আড়ম্বর এক মাইল দূর থেকে লক্ষ্য করা যায়—সব কিছুকেই ঔদ্ধত্যভরে বিচার করে—সব কিছুকেই যে ভাবভঙ্গী আর চোখের দৃষ্টিতে বলে—দেখ, সাবধান হও,

স্পর্শ কোরো না, আমার পা মাড়িয়ে দিয়ো না—যদি দাও তো আমি তোমার দফা রফা করে দেব—এ তা নয়! আমি যে সাহসের কথা বলছি, সে বিকর্ষণ করে না, আকর্ষণ করে। আকাঙ্ক্ষার সফলতায়, পথের প্রতিবন্ধক দূর করার কামনায় তার প্রকাশ। আলেকজান্দারের মুখের আবেগের সেই উচ্ছ্বাসময় ব্যঞ্জনা এখন একটু ভাবনার দ্বারা প্রশমিত। আত্মায় সংশয়ের প্রথম চিহ্ন প্রকটিত। হয়তো এ পিতৃব্যের শিক্ষা, হয়তো আলেকজান্দারের চোখে এবং হৃদয়ে আগে যা প্রকটিত হত, তাকে তিনি যে নির্মম বিশ্লেষণ করেছিলেন তারই একমাত্র ফল। অবশেষে আলেকজান্দার কৌশল শিখে ফেললে। তার মানে কি করে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তারই ক্ষমতা আয়ত্ত করলে, সে আর যার সঙ্গে দেখা হয়, তার কাছেই ব্যগ্র হয়ে ছুটে যায় না। বিশেষ করে তার সত্যকার ভাবাবেগ থাকার ফলে এবং পিতৃব্যের সতর্কতা সত্ত্বেও সে কয়েকবার তাসখেলায় ফতুর হয়েছে, দৃঢ়চেতা লৌহ-সমান মানসিক শক্তিসম্পন্ন চরিত্রের মানুষটি তার কাছ থেকে কিছু কিছু ধারও করেছেন। অন্যান্য লোক আর ঘটনাও তাকে সাহায্য করেছে। সে লক্ষ্য করেছে, তার এই খুব সুলভ ভাবাবেগকে লোকে উপহাসই করে, তাকে রোমান্টিক বলে। ওখানে, তার প্রতি কেউ নজর দেয় না, কেননা তাতে কারো লাভ নেই। সে মধ্যাহ্নভোজেও কাউকে ডাকে না, তার গাড়িও নেই, আর চড়া বাজিতে তাসও খেলে না।

প্রথমে তার গোলাপী স্বপ্ন বাস্তবতার সংস্পর্শে যতবারই আসছিল, সে পাচ্ছিল ব্যথা—দুঃখই করছিল। একবারও নিজেকে প্রশ্ন করার কথা তার মনে হয় নি কি বড় কাজ আমি করেছি যাতে জনতা থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখব? আমার গুণ কি, কেন আমি নজরে পড়ব? কিন্তু তবু তার গর্ব আহত হল।

অবশেষে উপরে উপরে সে মেনে নিলে, জীবনে গোলাপ যেমন আছে, কাঁটাও আছে—আর কাঁটা কখনো কখনো দুঃখও দেয়—অবশ্য তার খুড়োমশাই যতটা বলেছিলেন, ততটা নির্মম ভাবে নয়। অবশেষে সে আত্মসংযম শিখলে, ভাবাবেগ বা প্রবৃত্তির হাতে যখন-তখন নিজেকে সঁপে দেওয়া থেকে বিরত হল—অন্তত অপরিচিতদের সামনে তো বটেই।

কিন্তু পিতর ইভানিচের এই দুঃখ যে, এখনো সে মানুষের আত্মায় যে

ভাবধারায় স্পন্দন জাগায় সেগুলোকে ভাগ করে নিতে শেখে নি। সে এখনো স্বীকার করে না যে মানুষের হৃদয়ের সবকিছু রহস্য আর গোপনতা প্রকাশ্যে উন্মুক্ত করা যায়।

ভোরে পিতর ইভানিচ নিয়মিত তাকে শিক্ষা দেন। আলেকজান্দার শোনে, কখনো বা শুনে বিরক্ত হয়, কখনো বা গভীর ভাবনায় ডুবে যায়। সন্ধ্যায় কোন পার্টিতে যায় আর হৃদয়ের আলোড়ন নিয়েই ফিরে আসে। পরদিন যেন স্বপ্নের ভিতরে কাটায়—তার খুড়োমশাইয়ের উপদেশ তখন সে জাহান্নামে পাঠিয়েছে। বল-নৃত্যের কক্ষে মাদকতা আর মোহ, বাজের তুমুল শব্দ, নগ্ন কাঁধের সার, অগ্নিময়ী কটাক্ষ, গোলাপী অধরের হাসি সারারাত তাকে জাগিয়ে রাখে। তার হাত যে কটিতটে ন্যস্ত হয়েছিল, তার বিদায়ের সময়ে যে দীর্ঘ অলস চাহনি তাকে অনুসরণ করেছিল, ওয়ালৎস্‌-এর সময়ে যে উষ্ণ নিঃশ্বাস গালে অনুভব করেছিল, জানালার ধারে যে মৃদু কথার বিনিময় হয়েছিল, মাজুরকার বজ্রগম্ভীর তালে তালে যে চোখ ঝলসে উঠেছিল, সেগুলি তো মুছে যাবে না—সেগুলো মিছিলের মত তার সুমুখ দিয়ে চলে যায়। হৃদয় স্পন্দিত হয়ে ওঠে মহাবেগে, সে অরাত বিভ্রান্তিতে বালিশ জড়িয়ে ধরে। বিছানায় এ পাশ ওপাশ করে।

প্রেম কোথায়? আমি তো প্রেমের পিপাসু—প্রেমের। সে বলে, সে কি শীঘ্রই দেখা দেবে? কখন আসবে সেই স্বর্গীয় মুহূর্ত, সেই মধুর দুঃখ, সেই আনন্দ স্পন্দন আর অশ্রু—কখন শুরু হবে? বাকি সব কিছুই বা কখন পাবে!

পরদিন ভোরে সে গিয়ে দাঁড়ায় খুড়োমশাইয়ের সুমুখে।

উঃ কাকা, জারিস্কায়ায় কি যে পার্টি হল কাল, সে বলে, বল-নাচের স্মৃতি নিয়ে স্বপ্ন দেখে।

ভালই হল বুঝি?

স্বর্গীয় বলতে পারেন।

রাতের খাওয়া ভাল হয়েছিল?

আমি তো খাই নি।

কি? সে কি, তোমার এই বয়সে রাতের খাওয়া খাও নি? তুমি দেখছি এখানকার জীবনধারায় একেবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ, একটু বেশীই হয়েছ।

সব কিছু বেশ জাঁকজমক-যাকিছু হয়েছিল? পোশাক-আশাক, আলো—সব কিছু?

সত্যিই হয়েছিল।

আর অতিথিরা—তাঁরা বেশ ভাল লোক?

চমৎকার; অতি চমৎকার! অমন চোখ, অমন কাণ!

কাণ? কাদের কাণ?

আপনি কি ওকথা জিজ্ঞেস করছেন না?

কার কথা?

কেন— তরুণী মহিলাদের কথা।

না, করছি নে—যাক গে—অনেক সুন্দরী ছিলেন বুঝি সেখানে?

অনেক—অনেক শুধু একটা দুঃখ—ওরা সবাই একরকম। একজন কোন ব্যাপারে যা বলে, আপনি নিশ্চিত হতে পারেন—পরেরটিও তাই বলবে—যেন মুখস্থ বুলি। শুধু একজন ছিল, সে ঠিক ওরকম নয়—কারো কোনো স্বাধীন মত বা চরিত্র তো দেখা যায় না। [illegible], দুষ্ট—সব এক! কোন মৌলিক কথা কখনো শোনা যায় না, কোন অনুভূতির বালাই নেই, সবাই একই রং রঙে জৌলুসে ঢাকা। কোন কিছুতেই ভাবনার প্রকাশ হয় না। তার মানে কি এই যে, অনুভূতি চিরদিনই চাপা থাকবে, কখনো কারো কাছে তার প্রকাশ হবে না? ঐ করসেট কি চিরদিনই ভালবাসার দীর্ঘনিঃশ্বাস আর ব্যথিত হৃদয়ের আর্তনাদ পিষে ফেলবে? ভাবাবেগের কি কোন বাহির হবার পথ পাওয়া যাবে না?

ওগুলো তাদের স্বামীর সুমুখে প্রকাশ পাবে। তোমার মত যদি সবাই এমন সরবে চিন্তা করে, তাহলে হয়তো অনেক মেয়েই আজীবন কুমারী হয়ে কাটাবে। বোকা যারা তারাই যা গোপনীয় যা চেপে রাখতে হয় তা অকালে প্রকাশ করে দেয়—আর তার বদলে চোখের জল ছাড়া আর কি পায়? ওরা বিচার করে দেখতে পারে না।

কাকা এখানেও বিচার—গণনা?

বাপু, সব জায়গায় যেমন এখানেও তেমনি। যারা গণনা করে না, কম আবার তাদের বলে গণনা জানে না এমনি নির্বোধ। এ একেবারে খাঁটি সত্যি কথা।

নিজের মহান প্রবৃত্তি আর আবেগকে চেপে রাখতে হবে বুকে ?

তুমি যে কোনদিন কিছু চেপে রাখতে পারবে না তা আমি জানি। তুমি পথে, থিয়েটারে, বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে রাজি—তা জানি।

কেন নয় কাকা? লোকে শুধু বলবে, এই একটা মানুষের অনুভূতি প্রখর, যার এমন অনুভূতি সেই তো যা কিছু মহান করতে পারে, আর সে—

সে গুণে গেঁথে বিচার করে দেখতে পারে না—তার মানে তার চিন্তাশক্তি নেই। চমৎকার মানুষ—অনুভূতি প্রখর—আবেগ তার অতল গভীর। সবরকম প্রকৃতির মানুষই আছে তাই না? উৎসাহ—উদ্দীপনা! ঐ মানুষটি তো মানুষের মত একেবারে নয়—ঐ নিয়ে গর্ব করবারও কিছু নেই। তোমার তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত—সে তার ভাবাবেগ দমন করতে পারে কি না, যদি পারে তাহলেই সে মানুষ।

আলেকজান্দার মন্তব্য করলে, আপনার মতে ভাবাবেগের দমন দরকার—যেন তারা বাষ্প আর কি। কখনো বা একটু ছাড়, কখনো বা একেবারে বন্ধ করে দাও—ভালভ্‌টা হয় গোল, নয়তো বন্ধ কর—

হ্যাঁ, প্রকৃতি শুধু শুধু মানুষকে এই ভালভ্‌টি দেন নি। সেইটেই বুদ্ধি—আর তুমি সবসময়ে তা ব্যবহার কর না—একথা আমাকে দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে। যদিও তুমি একটি ভদ্র ছেলে।

কাকা, আপনার কথা শুনলেও মনটা খারাপ হয়ে যায়। তার চেয়ে পিটার্সবুর্গে সবে যে মহিলাটি এসেছেন, তাঁর সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দিন।

কে? লুবেৎস্কায়া? কাল রাতে কি সে ওখানে ছিল?

হ্যাঁ। আপনার কথা অনেক বললেন, তাঁর বিষয় সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন।

ও হ্যাঁ—ভাল কথা—

পিতর ইভানিচ টানা থেকে একখানা কাগজ বার করলেন।

ওর কাছে এখানা দিয়ে বলো সবেমাত্র কাল প্রায় জোর করে দপ্তর থেকে আদায় করেছি। ওকে সব বুঝিয়ে বলো। তুমি তো উপরওলাদের সঙ্গে এ সম্পর্কে আমার কথাবার্তা শুনেছ—তাই না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলব। আপনার ভাবনার কারণ নেই। আলেকজান্দার দুহাতে দলিলখানা নিয়ে পকেটে রাখল। পিওত্র ইভানিচ তার দিকে তাকালেন।

ওর সঙ্গে কেন আলাপ করতে চাও? আমার তো ওকে খুব একটা সুশ্রী মনে হয় না—নাকের পাশে একটা আঁচিল আছে।

আঁচিল? মনে পড়ছে না তো। কাকা, আপনি কি করে লক্ষ্য করলেন?

ঠিক নাকের পাশে—না দেখে কেন উপায় আছে! তুমি তার কাছে কি চাও?

তিনি যেমন সহৃদয়া তেমনি যোগ্য মহিলা।

তুমি নাকের আঁচিলটা লক্ষ্য কর নি, কিন্তু তিনি যে সহৃদয়া এবং যোগ্য মহিলা সেটা আবিষ্কার করেছ! মজার ব্যাপার। একটু সবুর করো। তার একটি মেয়ে আছে—সেটি নিশ্চয়ই। ওঃ—এতক্ষণে বুঝলাম! তাই তার নাকের আঁচিল লক্ষ্য কর নি।

দুজনেই হেসে উঠলেন।

আলেকজান্দার বললে, কাকা, আমি বুঝতে পারি নে, ওঁর মেয়েকে লক্ষ্য করার আগে কি করে নাকের আঁচিলটা দেখলেন।

আমাকে কাগজখানা দাও। তুমি হয় তো সমস্তখানি আবেগ ঢেলে দেবে, তালগোল পাকিয়ে দিতে একেবারে ভুলে যাবে, আর সব পণ্ড করে দেবে। আমি নিশ্চিত, তুমি কি করে সব বুঝিয়ে বলবে তা আমার জানা নেই।

কাকা, না, তা করব না। আমি কাগজখানাও আপনাকে ফিরিয়ে দিতে রাজী নই—সে আপনি যা-ই বলুন। আমি এখুনি যাব।

সে ঘর থেকে চলে গেল।

ব্যাপার একটার পর একটা ঠিকমতোই ঘটে গেল। আফিসে তার উপরওয়ালারা আলেকজান্দারের যোগ্যতা দেখে তাকে ভাল চাকুরী দিলেন। ইভান ইভানিচ তাকে সসম্মানে নমস্কার ঠুকে দিতে লাগল। সে তার ভবিষ্যৎ দেখতে পেলে। তার কথায়, আর সবার মতো যে মাসে সবদিনই রবিবার, সেই মাসে শুরু করে আলেকজান্দার তাকে ধরে ফেলবে। তারপর খাটিয়ে খাটিয়ে মরার দাখিল করবে। তারপরে দপ্তরের

প্রধান কেরানী কি সহপরিচালক হয়ে বসবে। নয় তো পরিচালকই হবে। দুজন তাই-ই হয়েছে, অথচ তারা তাদের শিক্ষানবিশী তার কাছেই শুরু করেছিল। সে এও যোগ করে দিলে, ওদের সফলতার জন্ত আমাকে কাজ করতে হবে। মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় অফিসেও আলেকজান্দার কেউকেটা হয়ে উঠল। সে এখন মাল-মসলা বেছে দেয়, প্রবন্ধ অনুবাদ করে, অন্তের প্রবন্ধ সংশোধন করে, এমন কি কৃষি-সম্পর্কে নিজের ধারণা কি জানিয়ে লেখা পাঠায়। তার নিজের মতে, ব্যয় করার মতো টাকা তার আছে, কিন্তু কাকা এখনো তুষ্ট নন। সে শুধু টাকার জন্তই খাটে না। সে সেই উন্নত পেশার স্বর্ণচিন্তা ত্যাগ করে নি—তার যৌবনের উন্মাদনা সবকিছুর অভাব পূর্ণ করে দেয়। ঘুম আর অফিসের কাজ থেকে সময় চুরি করে সে কবিতা, উপন্তাস, ঐতিহাসিক নিবন্ধ আর জীবনী লেখে। তার খুড়োও আর তার রচনা পার্টিশনের কাগজ রূপে ব্যবহার করেন না। নিঃশব্দে পড়ে যান, তারপরে শিস দেন, নয়তো মন্তব্য করেন—প্রথমে যেগুলি দেখিয়েছিলে তার চেয়ে ভাল। ছদ্মনামে তার কয়েকটা প্রবন্ধ ও বেরিয়েছে, আলেকজান্দার তার বন্ধুদের অনুমোদিত বিচার কান পেতে আনন্দে উদ্বিগ্ন হয়ে শোনে। তার বন্ধুর সংখ্যাও বহু, তারা অফিসে, মেঠাইয়ের দোকানে আর বাড়িতে বাড়িতে। প্রেমের স্বপ্নের পরেই তার সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্ন আজ সার্থক হতে চলেছে। ভবিষ্যৎ তার কাছে উজ্জল সম্ভাবনা, মহান বিজয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মনে হয়, মামুলি ভাগ্য তার নয়।

—এমনি সময়ে হঠাৎ—

কয়েক মাস কেটে গেল, আলেকজান্দারকে আর কোথাও দেখা গেল না —সে যেন অন্তর্ধান করেছে। খুড়োর কাছেও কম আসে। খুড়োও ভাবলেন, সে ব্যস্ত, তাকে ঘাঁটালেন না। কিন্তু একদিন পত্রিকার সম্পাদক পিওতর ইভানিচের সাথে দেখা হতে জানালেন যে, আলেকজান্দার একটা প্রবন্ধ দিতে দেরী করছে। সুযোগ হলেই ভাইপোকে বলবেন বলে খুড়োমশাই প্রতিশ্রুতি দিলেন। দু-তিন দিন পরে সুযোগ ঘটে গেল। আলেকজান্দার একদিন ভোরে পাগলের মত তার কাকার ঘরে ছুটে এল। তার চলায়-ফেরায় আনন্দের উত্তেজনা।

সকালটি আপনার ভাল কাটুক কাকা। উঃ আপনার দেখা পেয়ে কি যে খুশী হলাম! পিওতর ইভানিচ টেবিলের পিছনে গিয়ে না দাঁড়ালে, সে হয়ত তাঁকে জড়িয়েই ধরত।

সুপ্রভাত, আলেকজান্দার, এতদিন কোথায় ছিলে?

ব্যস্ত ছিলাম কাকা, জার্মান অর্থনীতিবিদদের লেখা সংকলন করছিলাম।

ওঃ তাহলে সম্পাদক মিছে কথা বলেছে! সেদিন সে বললে, তুমি নাকি কোন কাজ করছ না—ঠিক সাংবাদিকের মত কথা নয় কি? দেখা হলেই আমি তার সম্পর্কে কি ভাবি তা স্পষ্ট বলে দেব।

তাঁকে কিছু বলবেন না, আলেকজান্দার বাধা দিলে। আমি এখনো তাকে আমার সংকলিত লেখাগুলো পাঠাই নি, তিনি তাই বলেছেন।

তোমার ব্যাপার কি? বিজয়ী ভাব মুখে। তুমি কি ম্যানেজার হলে নাকি ক্রস পেলে?

আলেকজান্দার মাথা নাড়লে।

তাহলে টাকা পেয়েছ?

না।

তাহলে এমন বিজয়ীর ভাব কেন? যদি তাই-ই না হয়, তাহলে আমার কাজে বাধা দিও না। বসো, মস্কোতে সদাগর দুভাসভকে লিখে দাও যতশীঘ্র পারে বাকি টাকা যেন পাঠিয়ে দেয়। তার চিঠিখানা পড়। কোথায় গেল?

এই যে!

দুজনেই কয়েক মুহূর্ত নীরব, তারপরে দুজনেই লিখতে লাগলেন।

কয়েক মিনিট পরে আলেকজান্দার বললে, আমি শেষ করেছি।

খুব তাড়াতাড়ি তো—বেশ দেখি তো। ওকি? তুমি যে আমাকে সম্বোধন করেছ—মাননীয় পিওতর ইভানিচ সমীপেষু। তার নাম তিমোফি নিকোনিচ। তুমি ৫২০ রুবলের কথা বলেছ—আর হবে ৫,২০০ রুবল। কি হল তোমার আলেকজান্দার? পিওতর ইভানিচ কলমটা রেখে দিয়ে ভাইপোর দিকে তাকালেন, আলেকজান্দার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

সে শুধালে, আমার মুখে কি কিছু লক্ষ্য করছেন না?

যখন বললে, তখন বলি, তোমাকে বোকা বোকা দেখাচ্ছে। একটু দাঁড়াও তো! তুমি কি প্রেমে পড়েছ?—পিওতর ইভানিচ শুধালেন।

আলেকজান্দার নিরুত্তর।

তাহলে কি ব্যাপার? আমি যা ভেবেছি তাই নাকি?

আলেকজান্দারের মুখে বিজয়ের হাসি ও দৃষ্টি তার দীপ্ত, সে মাথা নেড়ে সায় দিলে।

তাহলে এই ব্যাপার। আমার তখনি বোঝা উচিত ছিল। তাই তুমি কুঁড়ে হয়ে গেছ—তাই তোমাকে লোকে কোথাও দেখতে পায় না! এই সব আরাইস্কায়া আর ফাচিনস ওরা এসে শুধায়, আলেকজান্দার ফিওদরীচ কোথায় গেছে? আর সেই সময়ে তুমি সাতস্বর্গে বসে আছ।

পিওর ইভানিচ আবার লিখতে লাগলেন।

সে নাদিয়া লিয়াবেৎস্কায়া, আলেকজান্দার বললে।

খুড়োমশাই বললেন, আমি তা জিজ্ঞেস করি নি। যে-ই হোক এ হচ্ছে বোকামি। কোন লিয়াবেৎস্কায়া? ঐ যার নাকে আঁচিল?

আঃ কাকা! আলেকজান্দার বিরক্ত হয়ে বাধা দিলে।

আঁচিল কোথায়?

ঠিক নাকের উপরে। তুমি কি বলতে চাও, এখনো দেখ নি?

আপনি সবকিছু ঘুলিয়ে ফেলছেন। আমার তো মনে হচ্ছে, মার নাকে আঁচিল আছে।

ঐ হোল!

ঐ হোল! নাদিয়া—সে তো দেবী! আপনি কি তাকে দেখেন নি? তাকে দেখেছেন, অথচ মনে রাখেন নি—এতো—

তার ভিতরে আশ্চর্য কি আছে? কি দেখতে হবে? তুমি বলছ, তার নাকে আঁচিল নেই।

আপনি আঁচিল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না। কাকা, ছিঃ ছিঃ! কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, সে এই সব দুনিয়ার এইসব মামুলি পুতুলের মত! একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন—কি গভীর প্রশান্ত চিন্তাধারা সেখানে! সে তো শুধু অনুভূতিপ্রবণা মেয়ে নয়, সে চিন্তাশীলা··· গভীর তার প্রকৃতি।

খুড়োমশাইয়ের কলম খস্‌খসিয়ে চলতে লাগল কাগজের উপর, কিন্তু আলেকজান্দার বলে চলল,

আপনি তার মুখ থেকে মামুলি তুচ্ছ কথা শুনতে পাবেন না। তার মন্তব্যে কি দীপ্ত মনের প্রকাশ! তার ভাবাবেগে কি ঔজ্জ্বল্য! জীবনকে কি গুঢ়াকাঙ্ক্ষাবশেই না চেনে! আপনি তো আপনার ভাবধারায় তাকে বিষাক্ত করে তুলেছেন, কিন্তু নাদিয়া আমাকে আবার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে।

আলেকজান্দার থামল, নাদিয়ার স্বপ্নে সে সম্পূর্ণরূপে বিভোর।

আবার সে শুরু করে দিলে—

যখন সে তার চোখ দুটি তোলে, আপনি অমনি দেখতে পান ঐ চোখ দুটি কী এক উদগ্র কোমল হৃদয়ের সেবা করে। আর তার স্বর—তার স্বর! কি মধুর, কি কামনাময়! আর সেই স্বরে যখন সে প্রেম ঘোষণা করে—তখন কোন পার্থিব সুখ তার চেয়ে মহান হতে পারে! কাকা, জীবন কি সুন্দর! আমি কি সুখী!

চোখে জল দেখা দিল, সে কাকাকে জড়িয়ে ধরল! কাঁপছে সে।

পিওত্র ইভানিচ লাফিয়ে উঠে পড়ে বললেন, আলেকজান্দার, তোমার ঐ জালন্ত এখনি বন্ধ কর! সমস্ত বাষ্প বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি পাগল! দেখ তো কি করলে! এক মুহূর্তে দু'দুটো বোকামি করে বসলে—আমার চুল এলোমেলো করে দিলে, আবার চিঠির উপরে একটা কালির ফোঁটা ফেলতে বাধ্য করলে। ভেবেছিলাম, তুমি ও অভ্যেস ছেড়ে দিয়েছ। বহুদিন তোমাকে এমনটি দেখি নি। এই আরশীতে নিজের মুখখানা দেখ—মিনতি করছি—একবারটি দেখে নাও। এমন নির্বোধ মুখ কখনো দেখেছ? অথচ তুমি তো সত্যিই বোকা নও।

হা! হা! হা। কাকা—আমি সুখী।

সে তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

আমার দৃষ্টিতে গর্ব ফুটে উঠছে—তাই না? জানি ফুটে উঠছে। নায়ক, কবি আর প্রেমিক যেমন পারস্পরিক ভালবাসার চেতনায় সুখী হয়ে তাকায়, আমিও তেমন জনতার দিকে তাকাচ্ছি আর কেবল পাগল বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট কেউ যেমন—যাক্ গে—এখন এই চিঠিখানা নিয়ে করি কি?

আমি ঘষে তুলে ফেলছি—দেখা যাবে না—আলেকজান্দার বললে। সে টেবিলের কাছে গিয়ে তেমনি উৎসাহে ঘসতে ঘসতে কাগজ দুখানা

যে পর্যন্ত ফুটো না হল—ততক্ষণ ঘষতে লাগল। টেবিলটা এই অঙ্গসঞ্চালনে কাঁপতে কাঁপতে একটা হোয়াটনটের গায়ে গিয়ে ধাক্কা মারল। হোয়াটনটের উপরে ইতালীয় স্ফটিকে সোফোক্লিস্ বা এস্কাইলাসের একখানি আবক্ষ মূর্তি ছিল। পূজ্যপাদ বিয়োগান্ত নাট্যকার অস্থির পাদপীঠের উপরে সামনে আর পিছনে মাথা নোয়াতে লাগলেন, তারপরে তাক থেকে পড়ে ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলেন।

আলেকজান্দার এই তোমার তিন নম্বরের বোকামি, পিওর ইভানিচ টুকরোগুলো কুড়োতে-কুড়োতে বললেন। এটার দাম পঞ্চাশ রুবল।

কাকা, আমি দিয়ে দেব, হাঁ,—আমিই দেব—শুধু আমার এই প্রবৃত্তিকে গাল দেবেন না। এ তো পবিত্র, মহান জিনিস। আমি সুখী—সুখী! ঈশ্বর—কি সুন্দর এই জীবন!

খুড়োমশাই মুখভঙ্গী করে মাথা নাড়লেন।

আলেকজান্দার, কবে তোমার বুদ্ধি হবে? কি বাজে বকছ?

ভগ্ন আবক্ষ মূর্তিটি তিক্ততার সঙ্গেই দেখছিলেন।

বললেন, আমি দিয়ে দেব, দিয়ে যাব—আর সেইটেই হবে চার নম্বরের বোকামি। তুমি আমাকে তোমার সুখের কথা বলার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছ। বেশ কথা। ভাইপোর প্রতিটি নির্বুদ্ধিতায় কাকা যখন অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য, তখন তাই-ই হোক। আমি তোমাকে সিকি ঘণ্টা সময় দেব। স্থির হয়ে বোসো—পাঁচ নম্বর বোকামিটি করে বোসো না—সবকথা আমাকে বল। এই নতুন বোকামিটি করার পর চলে যাবে। আমি আর সময় নষ্ট করতে পারব না। ভাল কথা—তুমি সুখী হয়েছ—তাতে হল কি? জলদি বল!

ওকথা ভাষায় বলা যায় না, আলেকজান্দার মিনতির হাসি হেসে মন্তব্য করলে।

আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দেখছি তুমি সেই মামুলি ভণিতা দিয়েই শুরু করতে চাও। তাহলে তো ঘণ্টাখানেক অন্ততঃ সময় নেবে। আমার সময় নেই। ডাক বসে থাকবে না। এস, আমি বরং নিজেই বলে যাই।

আপনি বলবেন—সে তো মজার ব্যাপার হবে।

খুবই মজার ব্যাপার—শোন এখন! কাল তোমার প্রিয়ার সঙ্গে গোপনে দেখা করেছিলে।

আপনি কি করে জানলেন? আলেকজান্দার অধীর হয়ে বাধা দিলে। আপনি কি আমার পিছনে লোক লাগিয়েছেন?

নিশ্চয়ই—পয়সা দিয়ে অন্য কারণে তো গোয়েন্দা লাগাই নি! কিসে তোমার মনে হল—তোমার ব্যাপারে আমার এতখানি স্বার্থ? আমার কাছে এর মূল্যই বা কি?

কথার সঙ্গে সঙ্গে রইল বরফের মত শীতল দৃষ্টি।

তাহলে জানলেন কি করে? আলেকজান্দার খুড়োমশাইয়ের কাছ ঘেঁসে এসে বলল।

দোহাই ঈশ্বরের, তুমি বোসো—টেবিলের কাছ থেকে দূরে থাক। নয়তো আর কিছু ভেঙে ফেলবে। তোমার মুখেই সব কথা লেখা, আমি মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। তাহলে তুমি বিয়ের প্রস্তাব করেছ। তিনি বলে চললেন।

আলেকজান্দার লাল হয়ে উঠল, কিন্তু কিছুই বললে না, তার খুড়োমশাই মোক্ষম বুঝেই আবার কোপ মারলেন।

চলতি প্রথা অনুযায়ী তোমরা দুজনেই বোকা, পিতর ইভানিচ বললেন।

ভাইপো অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

দুজনে যখন একা ছিলে, তখন তুচ্ছ কথা থেকেই শুরু হয়। ধর, ওর এমব্রয়ডারীর নক্সা নিয়েই শুরু হল। তুমি জিজ্ঞেস করলে—কার জন্তে ওটা সে বুনছে। সে উত্তর দিলে—মা কি মাসীর জন্ত, নয় তো অমনি কিছু। তারপরে দুজনেই কাঁপতে লাগলে—যেন জেতুজ্বর হয়েছে—

কাকা, এবার আপনি ভুল করলেন। আমরা এমব্রয়ডারীর নক্সা নিয়ে শুরু করিনি—আমরা বাগানে ছিলাম—আলেকজান্দার বলেই নিজেকে সংযত করলে।

তাহলে ফুল বা অমনি-কিছু নিয়ে শুরু হয়, পিতর ইভানিচ বললেন। এমন কি হলদে ফুলও হতে পারে—কিছু মনে করে বোসো না বাপু। যা কিছুর উপরেই চোখ পড়ুক, কথা বলার সুযোগ এলেই হল, জিভ নাড়বার এতটুকুন সুযোগ। তুমি জিজ্ঞেস করলে, সে ফুলটি ভালবাসে কি না, সে বললে 'হ্যাঁ,' জিজ্ঞেস করলে কেন? সে উত্তর দিলে, এমনি ভাল লাগে। দুজনেই এবার

নীরব—তার কারণ, তুমি একেবারে ভিন্ন একটা কথা বলতে চাইছিলে। আলাপ থেমে গেল। এবার তোমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলে, লজ্জায় হয়ে উঠলে লাল।

কাকা, কাকা! আলেকজান্দার মহা বিব্রত হয়ে চিৎকার করে উঠল।

খুড়ো বিচলিত না হয়ে বলতে লাগলেন, তারপরে তুমি বলতে লাগলে—তোমার কাছে এক নতুন পৃথিবীর দুয়ার খুলে গেছে। সে এই কথা শুনে হঠাৎ মুখ তুলে তাকালে, এ যেন ভারি অবাক কথা তার কাছে। মনে হয়, তুমিও অবাক হয়ে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেললে। তারপর প্রায় অস্ফুট স্বরেই বলতে লাগলে, এইমাত্রই তুমি জীবনের মানে বুঝতে শুরু করেছ। এতদিন পর্যন্ত তাকে—কি যেন তার নাম—মারিয়া না?

নাদিয়া।

তুমি তাকে যেন স্বপ্নে দেখলে, আবার তার সঙ্গে দেখা হবার আশায় পথ চেয়ে রইলে, তাকে ভালবাসলে। এখন তুমি হলফ করে বলতে পার, তোমার যত পদ্য আর গদ্য লেখা তাকে নিবেদন করে বসে আছ। আমি এখন কল্পনা করতে পারছি—কি করে তুমি হাত নাড়লে, হয়তো কিছু ফেলেও দিলে, ভাঙলেও বুঝি।

কাকা, আপনি নিশ্চয়ই আড়ি পেতেছিলেন, আলেকজান্দার যেন ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

হাঁ, আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিলাম। আমার তো তোমার পেছনে ছোটা আর ঐ সব বাজে কথা শোনা ছাড়া আর কিছু কাজ নেই।

তাহলে জানলেন কি করে? অবাক হয়ে শুধাল আলেকজান্দার।

সে তো সহজ ব্যাপার। আদম আর ইভের সময় থেকে সবারই ঐ একই ব্যাপার ঘটেছে, একটু অদল-বদল হয়েছে মাত্র। নাটকের কুশীলবদের চরিত্র জানা থাকলে, অদল-বদলটুকুও জানা যায়। তুমি অবাক হচ্ছ—তুমি না লেখক! তিন দিন ধরে তুমি লাফাবে-ঝাঁপাবে পাগলের মত, একে ওকে জড়িয়ে ধরবে। শুধু ঈশ্বরের দোহাই আমার গলা জড়িয়ে ধরো না! আমি কি পরামর্শ দিই জান—এই সময়টা নিজেকে কামরায় বন্ধ করে রাখ, সমস্ত বাষ্প উবে যাক, তোমার যা ছেলেমানুষি সব ইভানের উপরেই চালাও—

এতে করে কেউ দেখতে পাবে না। তার পরে সবটা ভেবে দেখ—বেশি কিছু আদায় করতে চেষ্টা কর। যেমন ধর—একটা চুমু।

নারিয়ার কাছ থেকে চুমু! আহা কি মহান, কি স্বর্গীয় পুরস্কার, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আলেকজান্দার।

কি বললে, স্বর্গীয়?

আপনি কি একে পার্থিব মনে করেন?

নিশ্চয়ই—এ তো বৈদ্যুতিক শক্তির ফল। প্রেমিক প্রেমিকারা হচ্ছে একজোড়া লেডেন জার। ওদের ভিতরে অনেকখানি বৈদ্যুতিক শক্তি রয়েছে—চুম্বনে সেই শক্তি মুক্তি পায়। যখন শক্তি ফুরিয়ে যায়, তখন প্রেম বিদায় নেয়—জুড়োনো শুরু হয়।

কাকা!

কি? তুমি কি মনে কর?

বাঃ, কি দৃষ্টিভঙ্গী! কি মতবাদ?

ও—হ্যাঁ—ভুলে গেছি বটে—তোমাদের মধ্যে স্থায়ী স্মৃতিচিহ্নের বিনিময় এখনো চলতে পারে। আবার যত বাজে জিনিস বাড়ি নিয়ে আসবে, তাই নিয়ে স্বপ্ন দেখবে, তাকিয়ে থাকবে, নিজের কাজকর্ম সব যাবে।

আলেকজান্দার পকেট হাত দিয়ে চেপে ধরল।

সে কি—এরই মধ্যে? মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি থেকে যা করেছে, তুমিও তাই করবে।

কাকা, তার মানে আপনিও এমনি করেছিলেন।

নিশ্চয়ই—তবে তুমি আরো বেশি বোকার মত করছ।

আরো বেশি বোকার মত! আপনার চেয়ে গভীর আর তীব্রভাবে ভালবেসেছি বলে কি বোকা বলছেন। কাকা, আমি অনুভূতিকে বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিই না, ঠাট্টা করি না, আপনার মত উদাসীনভাবে তুচ্ছ করি না—পবিত্র রহস্যের আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে চাই না বলেই কি এমনি বলছেন?

অন্যের মতই তুমি ভালবাসছ, তার চেয়ে বেশী গভীর বা তীব্রভাবে নয়। অন্যের মতই তুমি রহস্যের আবরণ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেবে। কিন্তু তফাৎ থাকবে এই যে, তুমি ভালবাসাকে চিরন্তন আর অক্ষুণ্ণ বলে মনে করবে—তা ছাড়া

আর কিছু ভাববে না—এইখানেই তোমার বোকামি। যা দরকার তার চেয়ে বেশি দুঃখ নিজের জন্ত জমা করে রাখছ।

আপনি ভয়ানক কথা বলছেন কাকা! কতবার যে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছি—আমার মনের কথা আপনার কাছে লুকিয়ে রাখব!

কেন রাখ নি? এখানে এসে আমার উপর চড়াও হয়েছ কেন?

কাকা, আপনিই তো আমার একমাত্র আপনার লোক। কার সঙ্গে আমি আমার এই উদ্বৃত্ত ভাবাবেগ ভাগাভাগি করে নেব। আমার হৃদয়ের অতি পবিত্র স্থানে আপনি আপনার অস্ত্রচিকিৎসকের শল্য নির্মমভাবে চালিয়ে দিচ্ছেন।

আমার নিজের আনন্দের জন্ত করি নি। তুমি পরামর্শ চেয়েছ, কত বোকামি থেকে আমি বাঁচিয়েছি বল তো?

না—কাকা—তার চেয়ে আপনার চোখে বোকা হয়েই থাকব, তবু জীবন আর মানুষের প্রতি অমন ধারণা করতে পারব না। সেটা আমার পক্ষে বড়ই দুঃখের হবে। আমি ও-সর্তে জীবনকে চাই না। শুনছেন—আমি তা চাই নে!

শুনছি, কিন্তু আমি কি করব? তোমাকে জীবন থেকে বঞ্চিতও করতে তো পারি নে।

আপনার শত ভবিষ্যৎবাণী সত্বেও আমি সুখী হব, আলেকজান্দার বললে। আমি একবারই ভালবাসব আর চিরদিনের জন্ত সে ভালবাসা অটুট থাকবে।

দেখছি—তুমি আমার টেবিলের আরো ক'টা জিনিস ভাঙবে। যাক গে! প্রেম কি সবাই জানে, কেউ তোমাকে বাধা দিচ্ছে না। তরুণরা প্রেমের ব্যাপারে অনেকখানি সময় দেয়, তা আমরাই প্রথম আবিষ্কার করি নি। কিন্তু নিজের কাজে অবহেলা করো না। প্রেম এক জিনিস, কাজ হচ্ছে আর এক জিনিস।

আমি জার্মান থেকে সংকলন করছি।

বাজে কথা। তুমি ওসব কিছুই করছ না! তুমি শুধু 'সুখস্বপ্নে' বিভোর হয়ে আছ। এর পরে সম্পাদক তোমাকে দিয়ে আর কোনো কাজ করাতে চাইবেন না।

না কাকা, আমার দরকার নেই। এখন ঐ ঘৃণিত সুযোগের কথা ভাববার যেন আমার সময় আছে, যখন—

ঘৃণিত সুযোগ! ঘৃণিত! তুমি পর্বতে গিয়ে কুঁড়ে ঘর বেঁধে থাক না, রুটি আর জল খেয়ে বাঁচ আর বল :—

তোমার সঙ্গে ভাঙা কুঁড়ের থাকা
সে তো আমার স্বর্গ।

শুধু একটা কথা, তোমার যখন আর ঐ নোংরা টাকা থাকবে না, আমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এস না—আমি তোমাকে একটা টাকাও দেব না।

আমার তো মনে হয় না, আপনাকে ঐ ব্যাপারে ব্যস্ত করে তুলেছি।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিন কর নি। কিন্তু কাজ করা ছেড়ে দিলে করতেও তো পারো। প্রেম টাকাকড়ির দাবী জানায়—পোশাক-আশাক আরো নানা কারণে টাকা চাই। তায়—বিশ বছরের ভালবাসা! সে তো এক বাজে আবেগ—কি যে বাজে—সোজা কথায় একটুও ভাল নয়।

কাকা, কখন সেটা ভাল হয়? চল্লিশ বছরে?

আমি চল্লিশ বছরের ভালবাসার কথা জানি নে—কিন্তু ঊনচল্লিশের ভালবাসার কথা—

আপনার নিজের মত।

আমার মতোও বলতে পার।

তার মানে—ভালবাসাই নয়।

কি করে জানলে?

আপনি যেন ভালবাসতে জানেন!

কেন জানব না? আমি কি মানুষ নই—আমার কি আশী বছর বয়েস? কিন্তু আমি যখন ভালবাসি, যুক্তি দিয়েই বাসি। আমি জিনিস ফেলে দিই না, কিছু ভাঙি না।

যুক্তিপূর্ণ ভালবাসা! কি করতে যাচ্ছে সঠিক জানা—এ তো চমৎকার ভালবাসা! আলেকজান্ডার বিদ্রূপভরে মন্তব্য করলে। এ ভালবাসায় তো কখনো নিজের সত্তা এক মুহূর্তের জন্য ভোলা যায় না।

পশুর ভালবাসা হলে, পিতর ইভানিচ বাধা দিলেন, মানুষ জানে না সে

কি করতে চলেছে। কিন্তু ভালবাসার ভিতরে যুক্তি থাকলে, সে তো জানে কি করতে যাচ্ছে। যুক্তি ছাড়া ভালবাসা, ভালবাসাই নয়।

তাহলে সেটা কি?

নিছক খোকামি বলতে পার।

আপনি—প্রেমে পড়েছেন! আলেকজান্দার অবিশ্বাসভরে খুড়ো মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। হাঃ হাঃ হাঃ!

পিতর ইভানিচ নিঃশব্দে লিখতে লাগলেন।

কার সঙ্গে কাকা? আলেকজান্দার শুধালে।

জানতে চাও?

হাঁ।

আমার বাগদত্তার সঙ্গে।

আপনার বাগদত্তা! আলেকজান্দার আউড়ে গেল, কথা যেন মুখ থেকে সরছে না। সে লাফিয়ে উঠে পড়ে কাকার কাছে এল।

অতো কাছে এস না আলেকজান্দার, তোমার মুখ বন্ধ কর। ভাইপোর বিস্ফারিত চোখ দেখে ছোটখাটো আবক্ষ মূর্তিগুলি, একটা ঘড়ি আর দোয়াতদান নিজের দিকে তাড়াতাড়ি টেনে আনলেন।

বলতে চান—আপনি বিয়ে করছেন? অবাক হয়ে শুধাল আলেকজান্দার।

হাঁ।

আর আপনি এমনি স্থির আছেন! মস্কোতে যত বাজে ব্যাপার নিয়ে চিঠি লিখছেন,কারখানায় যাচ্ছেন আর এমন নারকীয় শীতলতার সঙ্গে প্রেম নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন!

নারকীয় শীতলতার সঙ্গে—কথাটা নয়া আমদানী। নরকে তো শোনা যায় বড়ই গরম। তুমি অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

আপনি—আপনি বিয়ে করছেন!

তাতে অসাধারণত্ব কি আছে? পিতর ইভানিচ কলমটা রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

বিয়ে করছেন! অথচ আমাকে একটা কথা বলেন নি!

মাপ কর—তোমার অনুমতি নিতে ভুলে গেছি।

না, না, কাকা, তা নয়। কিন্তু আমাকে বলা উচিত ছিল। আমার কাকা বিয়ে করছেন, আর আমি কিছু জানিনে। কেউ একটা কথা বললে না!

বেশ তো, এই তো বললাম।

কথাটা এসে গেল বলে বললেন, আলেকজান্দার বললে, আপনার এমন আনন্দের খবর আমারই তো প্রথম জানা উচিত। আপনি জানেন, আপনাকে আমি ভালবাসি আর আপনার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই—

আমার মত হচ্ছে সব রকম জানাজানি বাতিল করা, বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে।

কাকা শুনুন, আবেগভরে বললে আলেকজান্দার, হয়তো···না, না! আপনার কাছে কিছুই লুকোতে চাই না। আমার সে মন নয়, আপনাকে আমি সবই বলব।

আলেকজান্দার, আমি বড়ই ব্যস্ত—যদি নতুন কোন কাহিনী না হয়, কাল পর্যন্ত দেরী করা চলে না?

আমি শুধু বলতে চাইছিলাম, আমিও বোধ হয় সেই সুখেরই—

কি বললে? চিৎকার করে উঠলেন পিওত্র ইভানিচ, কান খাড়া করে রইলেন, ব্যাপারটা মজার হবে বোধ হয়।

মজার হবে? তাহলে আমি আপনাকে জানিয়ে যাব—বলব না!

পিওত্র ইভানিচ একখানা খাম যথেষ্ট উদাসীন ভাবেই তুলে নিয়ে আঁটতে লাগলেন।

আমিও বোধহয় বিয়ে করতে চলেছি, আলেকজান্দার খুড়োমশাইয়ের কানে-কানে বললে।

পিওত্র ইভানিচ খাম আঁটতে আঁটতে অতি গম্ভীরভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, আলেকজান্দার, মুখ বন্ধ কর!

কাকা—ঠাট্টা রাখুন, আমি সত্যি বলছি, মার অনুমতি চাইতে যাচ্ছি।

বিয়ের জন্ম?

কেন নয়?

তোমার এই বয়সে?

আমার বয়েস তেইশ।

তুমি মনে করছ, এটা বিয়ের বয়েস। এই বয়েসে শুধু চাষাবাই বিয়ে করে, তাদের তখন সেবা-যত্নের জন্ত মেয়েমানুষের দরকার হয়।

কিন্তু যদি আমি প্রেমে পড়ি আর বিয়ে করার মত সামর্থ্য থাকে, আপনি কি মনে করেন আমার বিয়ে করাটা—

যার সঙ্গে প্রেমে পড়েছ, তাকে বিয়ে করতে আমি কখনো বলি না।

কাকা, আপনি নতুন কথা বলছেন। এমন কথা আগে কখনো শুনি নি।

এমন বহু জিনিস আছে যা আগে কখনো শোন নি।

আমার সব সময়েই মনে হয়েছে প্রেম ছাড়া বিয়ে ঠিক নয়।

বিয়ে এক জিনিস, প্রেম আর এক জিনিস, পিতর ইভানিচ বললেন।

তাহলে টাকার জন্তেই বিয়ে করা উচিত ?

না—টাকার জন্তে নয়, তবে আর সব জিনিসের সঙ্গে টাকার কথাটাও আছে। মানুষ এমনভাবে তৈরী যে তার সঙ্গিনীর দরকার হয়। বিয়ে করবে বলে মানুষ ভাবে, তার পরে চারদিকে তাকিয়ে ঠিক মেয়েটিকে পছন্দ করে ফেলে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখা—পছন্দ করা! আলেকজান্দার অবাক হয়ে বলে উঠল।

হাঁ, পছন্দ করা, তাই প্রেম করে আমি তোমাকে বিয়ে করতে বলি না। প্রেম উবে যায় তা তো জান—ওটা তো মামুলি ব্যাপার।

এ এক ভাহা মিথ্যে আর বিশ্রী, অশ্লীল, মানহানিকর কথা!

না, তোমাকে বোঝানো যাবে না! সময়ে নিজেই বুঝতে পারবে, এখন শুধু আমার কথাটা মনে রেখো; আমি আবার বলি প্রেম উবে যায়। যে নারী এক সময়ে তোমার আদর্শের নিখুঁত ছবি ছিল, সে আর হয়ত তেমনি নিখুঁত থাকে না। তখন আর কিছু করবারও উপায় থাকে না। স্ত্রীর যে গুণগুলি দরকার সেগুলির অভাব তোমার কাছ থেকে আড়াল করে রাখে এই প্রেম। আর যখন তুমি নিজে বাছাই করবে, তখন এ-মেয়ে, সে-মেয়ের গুণের দাবিগুলো ঠাণ্ডা মাথায় ওজন করে দেখতে পারবে। তোমার স্ত্রীর কোন গুণগুলির দরকার তাও বুঝতে পারবে। এটেই আসল কথা! অমনি একটি মেয়েকে আবিষ্কার করতে পারলে, তার প্রতি তোমার

অনুরাগ নিঃসন্দেহে যোগে টিকবে—কারণ সে তোমার যা প্রয়োজন সেগুলি মেটাবে। তখন তোমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দেখা দেবে, তা আরো পরিণত হয়ে গিয়ে দাঁড়াবে—

প্রেমে? আলেকজান্দার শুধালে।

একে আমরা অভ্যাস বলতে পারি।

অনুরাগ থাকবে না, প্রেমজ কাব্য, আবেগ থাকবে না—শীতল যুক্তিপূর্ণ ভাবে বিবাহ করতে হবে! কেন বলুন তো?

তুমি বুঝি না ভেবেচিন্তেই বিয়ে করবে, নিজের মনে একবার খতিয়েও দেখবে না? কেন? যেমন তুমি নিজে না ভেবেচিন্তেই এখানে এসেছ—কেন এলে?

তাহলে আপনি টাকার জন্যেই বিয়ে করতে যাচ্ছেন? আলেকজান্দার বললে।

টাকার কথাটাও ভেবেছি বইকি।

ও একই কথা।

না, তা নয়। টাকার জন্য বিয়ে করা মানে শুধু টাকারই জন্য করা। সেটা অতি হীন ব্যাপার। কিন্তু কোন কিছু না ভেবেচিন্তে বিয়ে করা তো বোকামি। আর তোমাকে বলি, তোমার বিয়ের কথা এখন মোটেই ভাবা উচিত নয়।

কখন তাহলে আমার বিয়ে করা উচিত? যখন বুড়ো হয়ে যাব? এমন অদ্ভুত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব কেন?

আমার কথা বলছ তো? ধন্যবাদ তোমাকে।

না, আপনার কথা আমি বলিনি, কাকা, আমি সকলের কথাই বলছি। ধরুন, একটা বিয়ের কথা শুনলেন, আর সেখানে গেলেনও। গিয়ে কি দেখলেন? এক কোমল সুন্দর জীব, শিশুর চেয়ে বেশী বড় হবে না, শুধু তার ফুটে ওঠার জন্য প্রেমের বাহুস্পর্শ দরকার, সঙ্গে সঙ্গে এক সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত স্তবক হয়ে দাঁড়াবে। পুতুল, ধাই-মা আর ছেলেমানুষী খেলা থেকে হঠাৎ তাকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে—যদি শুধু তাই-ই হয় তো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ কেউই তার হৃদয়ের সন্ধান নিতে যায় না, কিন্তু সে হৃদয়ও অন্যের হতে পারে। নূতন বস্ত্রে আর রেশমের ওড়নায় আর ফুলসাজে সজ্জিতা সে, তাকে তার বিবর্ণমুখ আর ক্রন্দন সত্ত্বেও বেদীর উপরে টেনে নিয়ে গিয়ে কার

পাশে খাড়া করে দেওয়া হয়? একটা বয়স্ক লোকের পাশে। লোকটা খুব সম্ভব কুশ্রী দেখতে, তার যৌবনের নবীনতা চলে গেছে, হয় সে তার দিকে অপমানকর কামনার দৃষ্টিতে তাকাবে, নয় তো আপাদমস্তক শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে ভাববে, তুমি সুন্দরী, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি খেয়াল আর কল্পনায়—প্রেম আর গোলাপী স্বপ্নে ভরপুর—আমি শীঘ্রই তোমার এই বাজে খেয়ালের ইতি করে দেব! তোমার ঐ দীর্ঘনিঃশ্বাস আর স্বপ্ন চলবে না—ঠিক মতো চলবে এখন থেকে! নয় তো এর চেয়েও খারাপ হতে পারে—সে হয় তো তার ধনদৌলতের স্বপ্ন দেখবে! এই যে পুরুষের দল, এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটির বয়সও কমপক্ষে তিরিশ হবে। তার মাথায় টাক দেখা যাবে। অবশ্য সে একটা ক্রশ বা তারকাচিহ্নের গর্বও করতে পারে। লোকে মেয়েটিকে বলবে; ওরই জন্য তোমার যৌবনের সমস্ত সম্পদ, তোমার হৃদয়ের প্রথম স্পন্দন, তোমার ভালবাসা, তোমার কটাক্ষ, কথা, তোমার কুমারী নারীর সোহাগ সমস্ত তোমার জীবন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। আর তার পাশে যারা ঘিরে থাকবে, তারা যৌবনে, সৌন্দর্যে তার ঐ সমতুল্য, তাদেরই একজনের এসে কনের পাশে দাঁড়ান উচিত ছিল। তারা বেচারাকে চোখ দিয়ে যেন গিলে খাবে আর নিজেদের বলবে, আমাদের তারুণ্য, স্বাস্থ্য যখন চলে যাবে, যখন টাক পড়বে, আমরাও বিয়ে করব। এমন একটি সুন্দর কুসুম আমাদের ভাগ্যে জুটবে! এ তো ভয়ানক কথা!

অলেকজান্দার, এ সব চলবে না। পিতর ইভানিচ চিৎকার করে উঠলেন। দু-বছর ধরে তুমি জামা, আলু আর নানা দরকারী জিনিস নিয়ে লিখছ, সাদাসিধে সংক্ষিপ্ত স্টাইলে আর এখনো কি না তুমি সেই অর্থহীন কথার আবৃত্তি ছাড়নি। দোহাই ঈশ্বরের, অমন আবেগে চলে পড়ো না, আর যদি আবেগের ঠেলায় অভিভূতই হয়ে থাক, যতক্ষণ না তা উবে যায় ততক্ষণ অন্ততঃ চুপ করে থাক—কারণ এ দশায় তুমি বুদ্ধিমানের মত কথা বলতে বা কিছু করতে পারবে না—শুধু বিদঘুটে কিছু করা বা বলাই সম্ভব হবে।

কিন্তু কাকা, কবির ভাবধারার জন্ম কি আবেগে নয়?

জানিনা কোথায় তার জন্ম। শুধু জানি মন থেকে একেবারে তৈরী হয়ে আসে—তার মানে—মগজের প্রক্রিয়াগুলোর ভিতর দিয়ে এলেই সেগুলির

যা কিছু চায়। পিওত্র ইভানিচ একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, তোমার মতে এই অপূর্ব জীবগুলির কাদের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত?

তারা যাদের ভালবাসে, তাদের সঙ্গে—যারা এখনো যৌবনের দীপ্ত সৌন্দর্য হারায়নি, যাদের মগজে আর বুকে এখনো প্রেমের প্রতীক আছে—যাদের চোখ থেকে এখনো দীপ্তি নিবে যায় নি, গাল থেকে গোলাপ-রক্তিমতা বিবর্ণ হয়ে যায়নি—যাদের তারুণ্য, যাদের স্বাস্থ্য এখনো মিলিয়ে যায় নি। এখনো যারা শক্তিমান; যারা জীবনের পথে তাদের প্রিয়াকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে, প্রেমপূর্ণ হৃদয় তাকে অর্পণ করতে পারে, তার অনুভূতি বুঝতে পারে, তার আবেগে অংশ গ্রহণ করতে পারে। যখন প্রকৃতির আইনে—

ঢের হয়েছে। তার মানে তোমার মত এমনি চমৎকার এক ছোকরা। আমরা যদি মাঠে আর বনে বাস করতাম তাহলে এইটে খুব ভালই হত, কিন্তু তোমার মত এমন একটি চমৎকার ছোকরাকে বিয়ে দিতে চেষ্টা করে দেখ না—দেখ না কি ভালই হয়। প্রথম বছরে সুখে সে পাগল হয়ে থাকবে, তার পরে থিয়েটারের হাতায় ঘুর ঘুর করে বেড়াবে, অথবা তুমি যে প্রকৃতির আইনের কথা বলছ, সেই আইন তো পরিবর্তন আর নূতনত্বের দাবি জানায়, সেই নূতনত্বে স্ত্রীর স্বামীকে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী করে তুলবে—খুব চমৎকার না? আর স্ত্রী স্বামীর ব্যাপার দেখে সৈনিকের শিরস্ত্রাণ, কুচকাওয়াজ আর মুখোশ নাচের আসরের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠবে। টাকাকড়ি না থাকলে তো আরো খারাপ। পেটে দেবার কিছু মিলবে না।

পিওত্র ইভানিচ মুখভঙ্গী করলেন।

শোন—ওর কথা শোন এবার—বলতে লাগলেন। আমি বিবাহিত মানুষ—তিনটি ছেলেপুলে আমার···আমাকে সাহায্য কর। আমার পেটে দেবার কিছু নেই—আমি গরীব—অতিশয় গরীব। কি বিশ্রী ব্যাপার ভাব তো! আমার বিশ্বাস, তুমি এই দুটোর একটা স্তরেও পড়বে না।

আমি সুখী স্বামীর স্তরে পড়ব কাকা, আর নাদিয়া পড়বে সুখী স্ত্রীর দলে। অধিকাংশ লোক যেমন বিয়ে করে, তেমনি বিয়ে করার আমার ইচ্ছে নেই। তাদের বুড়ো হয়, আমার যৌবন গেছে, একা থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি—এখন বিয়ের সময় হয়েছে। আমি তাদের মত নই।

বাপু, তুমি বাজে বকছ।

কেন একথা বলছেন ?

কারণ, তুমি আর সব মানুষেরই মত, আর মানুষ সম্বন্ধে আমার বেশ জানা আছে। এবার বল তো, কেন বিয়ে করতে চাইছ ?

কেন ? নাদেজ্দা আমার স্ত্রী হবে বলে। আলেকজান্দার হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল।

তুমি নিজেকে জান না।

উঃ ওকথা ভাবতেও আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা শিহরণ নেমে আসে। আপনি জানেন না আমি তাকে কতখানি ভালবাসি কাকা। এমন করে আগে আর কেউ কখনো ভালবাসে নি—আমার আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে ভালবেসেছি—আমি তার—সম্পূর্ণরূপে তার।

আলেকজান্দার, যদি উপায় না থাকে তুমি বরং শপথ করতে পার, আমাকে জড়িয়েও ধরতে পার, কিন্তু ঐ বোকার মত কথাগুলো বসে বসে আউড়াবে না। আমি অবাক হচ্ছি—কি করে ওকথা বললে—আগে আর কেউ কখনো অমন করে ভালবাসেনি! পিতর ইভানিচ কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন।

কেন—আপনি কি তা সম্ভব বলে মনে করেন না ?

তোমার প্রেমের ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে মনে হচ্ছে—এর চেয়ে বোকামি আর হতে পারে না।

কিন্তু ও বলেছে, একবছর আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের এখন খুবই অল্প বয়েস—আমাদের অনুরাগের পরীক্ষা দরকার। একবছর ধরে চলবে এই পরীক্ষা—তারপর—

একবছর ? কেন তখন একথা বলনি ? পিতর ইভানিচ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন। মেয়েটিই কি একথা বললে ? উঃ কি চতুর মেয়ে! কত বয়েস ?

আঠারো।

আর তোমার তেইশ। ওহে বাপু, তোমার চেয়ে সে হাজারগুণে বেশী চতুর! কিসে কি হয় সে জানে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। সে তোমাকে নিয়ে খেলা করবে, হেঁয়ালি করবে, বেশ মজা করবে, তারপরে—উঃ কতগুলো মেয়ে বড়ই চতুর হয়! তোমার বিয়ে হবে না। আমার মনে হয়েছিল, যেন তুমি শীগগীরই বিয়ে সেরে ফেলতে চাইছ আর তাও গোপনে।

তোমার এই বয়সে মানুষ এই বোকামিটা এত তাড়াতাড়ি করে ফেলে যে, থামা দেবার সময় থাকে না। কিন্তু গোটা একটা বছর! তার বহু আগেই মেয়েটা তোমাকে বোকা বানাবে।

নাদিয়া আমাকে বোকা বানাবে! নাদিয়া কি সাধারণ মেয়ে! আমার নাদেজ্দা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ কাকা! কার সঙ্গে সারা জীবন কাটালেন, কার সঙ্গে মিশলেন, কাকে ভালবাসলেন যে, আজ এমন কথা ভাবতে পারছেন?

আমি মানুষের মধ্যে কাটাচ্ছি আর একটি মেয়েকেই ভালবেসেছি।

ও আমাকে প্রতারণা করবে! ঐ দেবী, বিশ্বস্ততার ঐ প্রতীক—অমন নারী তো ঈশ্বর আর সৃষ্টিই করেননি—সে তো সৌন্দর্য আর দীপ্তির প্রতীক।

কিন্তু তা হলেও নারী—সে হয়তো তোমাকে প্রতারণাই করবে।

এর পরে বলবেন, আমিও তাকে প্রতারণা করব।

হাঁ, সময় পেলে তুমিও করবে।

আমি? যাদের জানেন না, তাদের সম্পর্কে যা খুশী ভাবতে পারেন—কিন্তু আমাকে অমন ভাবলেন! আমার সম্পর্কে অমন হীন ধারণা করতে কি আপনার লজ্জা হল না? আপনি আমাকে কি ভাবেন?

মানুষ বলেই ভাবি।

সব মানুষই সমান নয়। জেনে রাখুন, আমি তাকে সারা জীবন ভাল বাসব এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আমি একে দৃঢ় করার জন্য শপথ করতেও পারি।

জানি, জানি! একজন ভদ্রলোক, কখনো নারীর কাছে প্রতিশ্রুতি খাঁটি কি না সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে না, কিন্তু পরে মত বদলে যায়, ফুড়িয়ে যায়—সে নিজেই বোঝে না কি করে এমন হল। ইচ্ছে করে এটা করে না। সেখানে হীনতা নেই—নিন্দার কিছু নেই—কিন্তু প্রকৃতি আমাদের চিরকাল ভালবাসতে দেয় না। যারা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় প্রেমে বিশ্বাসী, তারা অবিশ্বাসীদেরই মত ব্যবহার করে—কিন্তু হয় নিজেরা তা বুঝতে পারে না, নয় তো স্বীকার করতে চায় না। আমরা বলি—আমরা এ সবের উপরে, মানুষ নই দেবতা—সব বাজে কথা!

কিন্তু এমন প্রেমিক প্রেমিকা বা দম্পতি নিশ্চয়ই আছে যারা পরস্পরকে চিরদিনের জন্য ভালবাসে—সারা জীবন তারা একসঙ্গে কাটায়?

চিরদিনের জন্ত! যে মানুষের ভালবাসা পঞ্চকাল স্থায়ী হয়, তাকে বলা হয় প্রজাপতি—কিন্তু দুই কি তিন বছর স্থায়ী হলে—সেই তো তোমার কাছে চিরদিন। ভেবে দেখ, ভালবাসার কি করে জন্ম হয়, তাহলে নিজেই দেখতে পাবে—ওটা চিরন্তন নয়। এই ভাবাবেগে যে চাঞ্চল্য, যে উন্মাদনা আর চঞ্চলতা আছে সেইগুলিই একে দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধা দেয়! প্রেমিক প্রেমিকা, দম্পতিরা সারা জীবন একসঙ্গে কাটায় এটা সত্যি কথা। কিন্তু সারা জীবন কি তারা পরস্পরকে ভালবাসতে পারে? আমরা কি মনে করতে পারি যে, তাদের প্রথম অনুরাগ চিরদিনের জন্ত একসঙ্গে বেঁধে রাখে? তারা সব সময়েই পরস্পরকে চায়? পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে, কখনো ক্লান্তি বোধ করে না? এই যে ছোটখাট সেবা, চির উদ্বিগ্নতা, একত্র থাকার ইচ্ছে, চোখের জল আর উদ্বেলিত আবেগ—এই সব অর্থহীন ব্যাপারের কি ফল? স্বামীর উদাসীনতা, বিতৃষ্ণা তো এখন প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়ে গেছে। লোকে বড়াই করে বলে, তাদের ভালবাসা বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। তাহলে ভালবাসা আর নেই—এখন আছে বন্ধুত্ব। এ কেমন ধারা বন্ধুত্ব? স্বামী স্ত্রীর একই স্বার্থ, একই অবস্থা—একই ভাগের সূত্রে তারা বাঁধা—তাই তারা একসঙ্গে থাকে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও তাদের বিচ্ছেদ হয়, অপর কাউকে তারা ভালবাসে, কেউ বা আগে, কেউ বা পরে—আর এটারই নাম দেওয়া হয় অসতীত্ব। এক সঙ্গে তারা যে থাকে, তোমার কানে কানে বলছি, সেটা নিছক অভ্যাস বশে, আর প্রেমের চেয়ে সেটা বেশী শক্তিশালী। একে শুধু শুধুই দ্বিতীয় প্রকৃতি বলা হয় নাই। তা নাহলে বিচ্ছেদে বা প্রিয়জনের মৃত্যুতে মানুষকে চিরদিন কাঁদতে হোত—কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ ওরা নিজেরাই নিজেদের সান্ত্বনা দেয়। বারবার চিরন্তন প্রেমের কথা বলেছে, এমন মানুষরাই তা করে। তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখে না, শুধু চেঁচাতে পারে।

কাকা, আপনার নিজের জন্ত ভয় নেই? এই মত অনুসারে আপনার প্রেমিকা—আমাকে মাপ করুন।

আমার তো তা মনে হয় না।

কি আত্মতুষ্টি?

আত্মতুষ্টি নয়—শুধু বুদ্ধিমানের মত হিসাব করা!

আবার হিসাব করে দেখা!

তোমার যদি ইচ্ছে হয়—বিচার করে দেখা বলতে পার।

ধরুন, তিনি যদি অপর কারো সঙ্গে প্রেমে পড়েন।

আমরা তা নিশ্চয়ই হতে দেব না। কিন্তু যদি সে দুর্ভাগ্য দেখা দেয়, তা হলে তাকে মানিয়ে নেওয়ার পথ আছে।

সত্যি আছে নাকি? আপনার সে ক্ষমতা আছে—

নিশ্চয়ই আছে।

পথ থাকলে সব প্রতারিত স্বামীরাই তা করত, আলেকজান্দার বলে উঠল।

সব স্বামীরাই তো আর এক নয় বাপু। কেউ কেউ স্ত্রী সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সে দিকে নজর নেই, নজর রাখতেও চায় না। আবার এমন লোকও আছে, গর্বের খাতিরে অমনি উদাসীন থাকতে চায়, কিন্তু পারে না। কি করে চলতে হয় জানে না।

আপনি কি করতেন?

সে আমার গোপন কথা। তোমাকে বলে লাভ নেই। তুমি এখন জ্বরের ঘোরে আছ।

আমি সুখী—তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমার ভাগ্যে কি আছে সেকথা জানার আমার ইচ্ছা নেই।

তোমার কথার আধখানা এমন বুদ্ধিমানের মত বলেছ যে, যে মানুষ প্রেমে পড়েনি সেও একথা বলতে পারে। এতে বোঝা যায়, বর্তমানকে উপভোগ করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু বাকি আধখানা—আমাকে মাপ কর—ওটা একেবারেই অচল। আমার ভাগ্যে কি আছে জানতে চাইনে, ওটার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি গতকাল বলে কিছু ছিল তাও জানতে চাইনে, আবার আজকের কথাও না। আমি ভাবতে চাইনে, এই ঘটনার জন্য তৈরী হতে চাইনে, একে এড়াতে চাইনে। আমি ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেব। তোমাকে জিজ্ঞেস করি—এতে ভালই বা কি?

কাকা, আপনার পথটা কি? আপনার কি মনে হয়, যখন সুখের মুহূর্তটা আসবে তখন বড়-দেখানো কাচ নিয়ে পরীক্ষা করতে বসে যেতে হবে।

বা, ছোট-দেখানো কাচ, যাতে হঠাৎ আনন্দে মাথা খারাপ হয়ে না যায়, যে কারো আলিঙ্গনে ধরা পড়তে না হয়।

আলেকজান্দার বলে উঠল, অথবা ধরুন, বিবাহের মুহূর্ত আছে—তাকে কি আপনার ছোট-দেখানো কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে ?

না, বড়-দেখানো কাচ বিবাহের জন্ত ব্যবহার করতে হবে। যা নয় তার চেয়ে যদি দ্বিগুণ বড় করে দেখ, তখন দুঃখ সওয়াটা সহজ হয়।

আলেকজান্দার বিরক্ত হয়ে বললে, কেন ? আমি কি প্রতিটি আনন্দকে কুঁড়িতেই পিষে ফেলব শীতল যুক্তি দিয়ে—তার কাছে আত্মসমর্পণ করব না ? কেন আমি ভাবি—সে আমাকে প্রতারণা করবে, এটা স্থায়ী হবে না ? কিছু ঘটার আগেই আগাম নিজেকে যন্ত্রণা দেব কেন ?

খুড়ো-মশাই বাধা দিলেন—কিন্তু যখন ব্যাপারটা ঘটবে, তখন আপন মনে বলতে পারবে—দুঃখও কেটে যাবে, যেমন বহুবার তা আমার এবং অন্তের কেটে গেছে। আমার তো মনে হয়, তাতে ক্ষতি নেই এবং ওটা ভাববারও কথা। যখন জীবনে ভাগ্যের চঞ্চলতা দেখবে তখন আর নিজেকে যন্ত্রণা দিতে হবে না। তুমি হবে শান্ত, ধীর, স্থির—অবশ্য মানুষ যতটা হতে পারে ততটাই।

তাহলে এই আপনার ধীর স্থিরতার রহস্ত—আলেকজান্দার বললে।

পিওত্র ইভানিচ নিঃশব্দে লিখে চললেন।

আহা কী জীবন ! আলেকজান্দার ফেটে পড়ল—কখনো মুহূর্তের সুখে নিজেকে সঁপে দেব না। সব সময়েই শুধু ভাবব আর ভাবব···না, আমি মনে করি, এটা ঠিক নয়। আপনার এই নিরুত্তাপ বিশ্লেষণ বাদ দিয়েই আমি বাঁচতে চাই, আমার জন্ত দুর্ভাগ্য আর বিপদ ওৎ পেতে আছে ওকথা ভাবতে চাইনে। কি আসে-যায় ? কেন আগেভাগে ভাবব, আমার সুখকে কেন বিষিয়ে দেব ?

কেন করবে তা এইমাত্র বলেছি—কিন্তু তুমি একই ধুয়ো তুলছ। আমাকে বাজে তুলনা দিতে বাধ্য কোরো না। এখন বলি : কারণ, যখন তুমি বিপদ, বাধা বা কোন সর্বনাশের আঁচ পাবে, তোমার পক্ষে সেটার সঙ্গে এঁটে ওঠা সোজাই হবে, অথবা সেটা এসে পড়লে সহ্য করাও সোজা হবে। তুমি পাগল হয়ে যাবে না বা মরবে না। যখন সুখের দিন আসবে, তুমি লাফিয়ে উঠবে না, শ্বেতপাথরের আবক্ষ মূর্তি ও ভাঙবে না—বুঝলে তো ? তুমি তাকে বল—এইটেই শুরু—এর থেকে পরিণতি কি হবে

কল্পনা করে নাও; কিন্তু সে চোখ বুজে থাকে, দৃষ্টি এড়িয়ে থাকে, যেন ভূত দেখেছে—আর মেয়েমানুষের মত জীবন কাটায়। তোমার মতে একদিন থেকে আর একদিন এমনি করেই জীবন কাটাতে হবে, যেটা যেমন আসবে, সেইটেকে তেমনি ভাবেই গ্রহণ করতে হবে। নিজের কামরার দরজায় বসে থাকতে হবে—জীবনকে মধ্যাহ্নভোজ, বলনাচ, ভালবাসা আর বিশ্বস্ততার মাপে মেপে নিতে হবে। সবাই স্বর্ণযুগের দিকে চেয়ে আছে। তোমাকে বলিনি, তোমার ভাবধারা গ্রাম্য জীবনের পক্ষে বেশ ভাল, সেখানে তোমার বৌ আর আধডজন থাকবে ছেলেপুলে, আর শহরে করতে হবে কাজ। সব সময়েই এখানে চিন্তা করতে হবে, সব সময়েই মনে রাখতে হবে—কাল কি করেছ, আজ কি করছ, আগামীকাল কি করবে—তা জানবার জন্যই মনে রাখতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সব সময়েই নিজেকে, নিজের কাজকে যাচাই করে নিতে হবে। এমনি করেই সত্যিকারের কিছু করা যাবে। কিন্তু তোমার পথ হচ্ছে—তোমাকে এসব বলে লাভ কি? তুমি এখন প্রলাপের ঘোরে আছ। আরে, আরে—একটা যে বাজে! আলেকজান্দার, আর একটা কথা নয়। এখন যাও, আমি তোমার কথা শুনব না। কাল আমার এখানে দুপুরে খেতে এস—কয়েকজন লোক থাকবে।

আপনার বন্ধুরা?

হাঁ কোনেভ, স্মির্ণভ, ফিওদরোভ—তুমি তাদের চেন, আরও ক'জন থাকবেন।

কোনেভ, স্মির্ণভ, ফিওদরোভ। ওঁদের সকলের সঙ্গে আপনার ব্যবসার সম্পর্ক।

হ্যাঁ—ওদের সবাইকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায়।

এদের কি আপনি বন্ধু বলেন? কাউকে বেশ উৎসাহভরে অভ্যর্থনা করেছেন, এমন তো কখনো দেখিনি।

আমি তোমাকে বারবার বলেছি, যাদের সঙ্গে আমার হামেশাই দেখা হয়; যারা আমার সুখ-সুবিধে দেখেন—তাঁদেরই আমি বন্ধু বলি। দোহাই ঈশ্বরের—শুধু শুধু লোক খাওয়াব কেন?

আমি ভেবেছিলাম, আপনার সত্যিকারের বন্ধুদের বিয়ের আগে বিদায়

ভোজ দিচ্ছেন—যাদের সত্যিকারের ভালবাসেন—তাদের সঙ্গে শেষবারের মত এক পাত্র সুরা নিয়ে বসে আপনাদের আনন্দে নন্দিত যৌবনের কথা স্মরণ করবেন, আর বিদায়ের সময় হয়তো তাঁদের নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরবেন।

সত্যিকারের জীবনে যা নেই, যা থাকা উচিত নয়, তোমার কথায় তার প্রতিটি জিনিস আছে। একথা শুনে কি উৎসাহেই তোমার মাসী তোমার গলা জড়িয়ে ধরবেন! যখন শুধু বন্ধুর কথা বলতে পারতে, তখন বলছ 'প্রকৃত' বন্ধুর কথা। বড় সুরা পাত্রের কথা বলছ, মানুষ মদের গেলাস থেকে মদ খায়, আর বিদায়ের সময় আলিঙ্গন—যখন বিদায়ের প্রশ্নই ওঠে না। হায় আলেকজান্দার!

বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদে বা তাদের সঙ্গে কম দেখা হবার সম্ভাবনায় আপনার কি দুঃখ হয় না? আলেকজান্দার শুধাল।

একটুও না। আমার কারো সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গতা নেই যাতে দুঃখ হতে পারে। তোমাকেও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলি।

কিন্তু হয়ত ওঁরা আপনার মত নন। হয়ত ওঁরা আপনার মত একজন প্রিয়বন্ধু আর সঙ্গীকে হারিয়ে দুঃখিত।

সে তাদের ব্যাপার, আমার নয়। এইভাবে বহু বন্ধু আমি হারিয়েছি, কিন্তু দেখছ তো, মরিনি। তাহলে কাল আসছ তো?

কাকা, কাল তো আমি—

কি?

গ্রামে যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি।

লুবেৎস্কীতে যাবে—মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ।

এই ব্যাপার। তা তোমার যা খুশী। আলেকজান্দার নিজের কাজের কথা ভেবো। সম্পাদককে আমি বলব, তুমি কি করছ!

কাকা, বলবেন না! আমি শপথ করছি জার্মান অর্থনীতিবিদদের সংকলন আমি শেষ করে দেব।

প্রথমেই শুরু করে দাও। মনে রেখো, গোলাপী স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছ—তাই নোংরা টাকাকড়ি চাইতে আমার কাছে এসো না।

চার

আলেকজান্দারের জীবন দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সকালগুলো কাটে কাজে। ধুলোভরা ফাইল ঘেঁটে বহু তথ্য সে বার করে, তার নিজের সেগুলির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই—লাখো লাখো টাকা সে কাগজের উপর গণনা করে, কিন্তু সেগুলি তার নিজের নয়। কিন্তু কখনো-কখনো তার মগজ অঙ্কের জন্ত ভাবনা করতে চায় না—কলম আঙুল থেকে খসে পড়ে, সোনালী স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে যায়—এতে পিতর ইভানিচ খুবই বিরক্ত হয়।

এমনি মুহূর্তে আলেকজান্দার চেয়ারে বসে পড়ে মনে মনে স্বর্গে উধাও হয়, সেখানে কাগজ, কালি, অচেনা মুখ বা অফিসী উর্দি নেই। সেখানে শান্তি, মধুরতা, আর স্নিগ্ধতা বিরাজ করে। সেখানে ফুলগুলো গন্ধ বিলায় এক চমৎকার সাজানো হলঘরে—সেখান থেকে ভেসে আসে পিয়ানোর শব্দ—সেখানে তোতাপাখী খাঁচায় লাফায় আর বাইরে বাগানে বার্চ গাছের শাখা আর লাইলাক ঝোপগুলি মৃদুমন্দ বাতাসে দোলে। আর এই সকলের রাণী সে……

ভোরে যদিও অফিসে বসে থাকে আলেকজান্দার, কিন্তু তার আত্মা তখন সেই দ্বীপে হাজির, যেখানে লুবেৎস্কীর কুটীরটি রয়েছে। আর সন্ধ্যায় তো রক্তমাংসের শরীর আর তার সমস্ত সত্তা নিয়েই সেখানে সে হাজির হয়। আসুন, আমরা তার এই সুখস্বর্গের দিকে অবিবেচকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করি।

গ্রীষ্মের দিন, এমন দিন পিটার্সবুর্গে খুব কমই দেখা যায়। সূর্য সদয় হয়ে মাঠের উপর ঝলমল করছে, কিন্তু পিটার্সবুর্গের পথঘাট রৌদ্রদগ্ধ, তার রশ্মিজালে ফুটপাথ অর্ধসিদ্ধ, পথচারীদেরও অর্ধসিদ্ধ করে তুলছে। পুরুষ আর নারী মন্থর গতিতে মাথা নুইয়ে চলেছে আর কুকুরগুলি জিভ বার করে ছুটোছুটি করছে। শহর যেন উপকথার সেই নগরী, যাদুকরের যাদুদণ্ডের সঞ্চালনে সেখানে সবকিছু প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে। পথের পাথরের উপর দিয়ে ঝকঝক করে চলে না গাড়ী—জানালারও পর্দাগুলো অবনমিত চোখের পাতার মত। পথ যেন কার্পেটের মেঝের মত ঝলমল করছে, আর মানুষের পায়ের তলা পুড়িয়ে দিচ্ছে। সর্বত্রই ক্লিমন্ত একঘেয়েমি।

পথচারী মুখের ঘাম মুছে ছায়া খুঁজতে লাগল। একখানা ডাকগাড়ি দুজন যাত্রী নিয়ে শহর ছেড়ে এল ধীরে ধীরে, চাকার ধুলোয় স্পন্দন উঠল কি উঠল না। চারটের সময় করনিকেরা বেরিয়ে এল আফিস থেকে, ধীরে ধীরে বাড়ির পথে চলতে লাগল।

আলেকজান্দার এমনভাবে ছুটে বেরিয়ে এল যেন ছাদ ধসে পড়েছে। ঘড়ি দেখলে সে। সাড়া ডোভের পৌছানোর পক্ষে বেশ দেরী হয়ে গেছে। সে একটা রেস্তর্রাঁয় বেগে ঢুকে পড়ল।

কি পাওয়া যাবে? জলদি কর!

সুপ, সস্, টার্কির রোস্ট......

আমাকে সুপ, সস্ রোস্ট জলদি দাও!

পরিচারক তাকিয়ে রইল তার দিকে।

ব্যাপার কি? আলেকজান্দার অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে।

পরিচারক অদৃশ্য হয়ে গেল, পয়লা যে জিনিসটি মনে পড়ল, সেটিই নিয়ে এল। আলেকজান্দার সন্তুষ্ট। শেষ পদটার জন্য বসে না থেকে সে ছুটে বেরিয়ে বাঁধের ধারে এল। একখানা নৌকো আর দুজন মাঝি তার জন্যে অপেক্ষা করছিল সেখানে।

ঘণ্টাখানেক পরে আকাঙ্ক্ষিত ভূমি দেখে সে নৌকোয় উঠে বসে দূরে তাকিয়ে রইল। প্রথমে ভীতি আর উদ্বেগে ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি—ধীরে ধীরে এল সন্দেহ। হঠাৎ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনন্দের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

যেন এক ঝলক রৌদ্র এসে পড়ল, ঝটকে সে চিরপরিচিত বেশের আভাস পেল—তাকে চিনেছে—রুমাল নাড়ছে, তারই প্রতীক্ষায় আছে, হয়তো বহুক্ষণই আছে। তার পায়ের তলা অবধি অধৈর্যে চিন-চিন করে উঠল।

আলেকজান্দার ভাবলে, হায় জলের উপর দিয়ে চলে যাওয়া যদি সম্ভব হত! যত বাজে আবিষ্কার হচ্ছে! কেউ এমন আবিষ্কার করে না কেন?

মাঝিরা ধীরে ধীরে দাঁড় চালাচ্ছে, কলের মতই নিয়মিত তারা। তাদের রৌদ্রদগ্ধ মুখে ঘামের ধারা বইছে। আলেকজান্দারের বুকে যদি প্রচণ্ড আলোড়ন ওঠে—তাতে তাদের কি? যদি তার দৃষ্টি একটি বিন্দুর উপর স্থিরীকৃত

হয়ে যায় আর প্রথমে একখানা পা, পরে আর একখানা নৌকোর বাইরে যাবে —তাতেই বা ওদের কি? ওদের কাছে সবই সমান, আগের মতই নির্বিকারভাবে দাঁড় বাইছে, মাঝে মাঝে অতি উজ্জ্বল মুখ মুছে ফেলছে আস্তিনে।

অলদি! সে চেঁচিয়ে উঠল। তোদকার জন্ম পকাশ কোপেক পাবি।

তারপর কেমন ঝুঁকে পড়ল দাঁড়ের উপর তারা, নিজেদের আসন থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে পড়ছে তারা, ক্লান্তি একেবারে ভুলে গেছে। কোথা থেকে পেল এই শক্তি? দাঁড়গুলি নেচে চলেছে জলের উপরে। যখনি নৌকো এগিয়ে যাচ্ছে—পেছনে পড়ে থাকছে একগজ-পরিমাণ বিস্তৃতি, দাঁড়ের দশটি আঘাতে সমুদ্র জলে অর্ধবৃত্ত এঁকে নীলাভ সহিতে তীরের কাছে এসে পড়েছে। এবার তীরে এসে ভিড়েছে। দূর থেকে আলেকজান্দার আর নাদিয়া পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলে, চোখ আর তারা একে অপরের মুখ থেকে ফেরায় না। আলেকজান্দার একখানা পা জলের ভিতরে দিয়ে পাড়ে এসে উঠল। নাদিয়া হাসছে।

মশাই, হুঁশিয়ার! হাত বাড়িয়ে দেয়া অবধি সবুর করুন, একজন মাঝি বললে। আলেকজান্দার শুকনো পাড়ে উঠে পড়েছে,।

এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে, এই বলেই সে নাদিয়ার কাছে ছুটে গেল।

দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে নাদিয়া, স্নিগ্ধ হাসি তার মুখে। দাঁড়ের প্রতি ক্ষেপনে নৌকো যখন কাছে আসছিল, তার হৃদয়ে উঠছিল প্রচণ্ড স্পন্দন।

নাদেজদা আলেকজান্দ্রোভ্না! সে বললে। আনন্দে বুঝি নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

আলেকজান্দার ফিওদরোভিচ! সে উত্তর দিলে।

প্রবৃত্তির টানে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসতে-আসতে হঠাৎ থেমে গেল। হাসিমুখে একে অপরকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, চোখ সজল, কথা যোগাচ্ছে না মুখে! এমনি করে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

নাদিয়ার দিকে নজর পড়ে নি বলে পিওত্র ইভানিচকে দোষ দেওয়া যায় না। সে সুন্দরী নয়, প্রথম দর্শনে সে আকর্ষণ করে না।

কিন্তু তার চেহারা যদি কাছে গিয়ে খতিয়ে দেখা যায় তখন তো.

দৃষ্টি ফেরানো চলবে না। তার মুখখানা দু'মিনিটও কখনো বিশ্রাম পায় না। অতি-স্পর্শাতুর মনে যে ভাবধারা আর বিচিত্র আবেগ বয়ে যায়, একটার পিছনে আর একটা ছুটে যায়, সেগুলি মিলে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে জাগিয়ে তোলে অপূর্বভাবে, আর প্রতি-মুহূর্তেই তার মুখে এনে দেয় নূতন আর অপ্রত্যাশিত ভাব-ব্যঞ্জনা। চোখ হঠাৎ বিদ্যুতের মত ঝলসে ওঠে, কখনো বা তীব্র দৃষ্টি হানে, কখনো বা দীর্ঘ পক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। পরমুহূর্তেই মুখখানি নিষ্প্রভ স্থির বলে মনে হয়—যেন মর্মর মূর্তি। তারপর আবার তীব্র আলোকের আশা জাগে, কিন্তু তা তো মেলে না! চোখের পাতা ধীরে ধীরে উঠে আসবে, স্নিগ্ধ আলোয় তোমাকে স্নান করিয়ে দেবে, যেন চাঁদ একখণ্ড মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। তোমার হৃদয় তো মৃদু স্পন্দনে সেই দৃষ্টিতে সাড়া না দিয়ে পারবে না। তার গতি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সে বড়ই মনোরম, কিন্তু বায়ুর দেবীর মত তো নয়। এখানে যে বক্রতা আর আকস্মিকতা আছে, প্রকৃতি তা সকলকেই দেন, কিন্তু কলানৈপুণ্যে তা শান্ত হয়ে গেছে—তার শেষ চিহ্নটুকুও দূরীভূত হয়ে গেছে। হয়তো নাদিয়া একটি সুন্দর ভঙ্গীতে বসেছিল, কে জানে অন্তরের কোন এক স্পন্দনে এই সুন্দর ভঙ্গীটি এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত গতি আর তেমনি মনোমুগ্ধকর ভঙ্গীতে ভেঙে গেল। তার কথাবার্তাও এমনি অপ্রত্যাশিতভাবে মোড় ঘুরে যায়। কতগুলি বিজ্ঞ মন্তব্যের পর আসে স্বপ্নালু ভাব, তারপরে কঠোর বিচার, একটু বা ছেলেমানুষি খেয়ালিপনা, সুক্ষ্মতা আর ধূর্ততায় ভরা। সে যা কিছু বলে বা করে তাতে তার ব্যগ্র মন আর ইচ্ছাকৃত অস্থির অনুভূতির পরিচয় মেলে। আলেকজান্দারের মত অনেকেই তার এই মোহে মুগ্ধ হয়েছে। শুধু মুগ্ধ হন নি পিতর ইভানিচই—তাঁর মতো লোক কমই আছে।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলে? ঈশ্বর, আমি কি সুখী!—আলেকজান্দার বলে উঠল।

অপেক্ষা করছিলাম? আমি? একেবারেই নয়, মাথা নেড়ে বললে নাদিয়া—তুমি তো জান, আমি সবসময়েই বাগানে থাকি।

আমার উপর রাগ করেছ? ভীরু স্বরে শুধাল সে।

কেন? কি যে বল!

তাহলে তোমার হাতখানি দাও।

সে তার হাতখানি দিলে, কিন্তু ছুঁতে না ছুঁতেই সরিয়ে নিলে—হঠাৎ পরিবর্তন এল, হাসি মিলিয়ে গেল, মুখে বিরক্তি ফুটে উঠেছে।

তুমি কি দুধ খাচ্ছ? সে জিজ্ঞেস করলে।

নাদিয়ার হাতে একটি পেয়ালা আর একটুকরো রুটি।

আমি রাতের খাবার খাচ্ছি, সে উত্তর দিলে।

ছটার রাতের খাবার, তাও আবার দুধ দিয়ে?

তোমার খুড়োমশায়ের ওখানে একটা বিরাট রাতের ভোজের পরে তুমি অবশ্য দুধের দিকে তাকাতেও পার না—তা জানি। আমরা গেঁয়ো মানুষ—আমাদের ধরণ-ধারন বেশ নীচু দরের।

সে তার সামনের দাঁত দিয়ে রুটি থেকে কয়েক টুকরো খসিয়ে নিয়ে দুধে চুমুক দিতে লাগল মনোরম মুখভঙ্গী করে।

আমার খুড়োমশায়ের সঙ্গে আমি রাতের ভোজ খাইনি, কাল আমি তাঁর নিমন্ত্রণ বাতিল করে দিয়েছি—আলেকজান্দার বললে।

অমন আমাকে গল্প বলছ কি করে? এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

চারটে অবধি অফিসে ছিলাম।

এখন ছটা, আমাকে ওকথা বলো না। স্বীকার কর, ভোজ আর তার সঙ্গীদের লোভে পড়েছিলে। মনে হচ্ছে, চমৎকার সময় কাটিয়েছ!

হলপ করে বলছি, খুড়োর ওখানে যাইনি—আলেকজান্দার প্রতিবাদ করলে অধীরভাবে, যদি যেতাম, এত তাড়াতাড়ি কি করে তোমার কাছে আসা সম্ভব হত!

তোমার কাছে তাড়াতাড়ি মনে হল বুঝি? তুমি দুঘণ্টা পরে এমনি তাড়াতাড়ি এলেই পারতে। নাদিয়া ব্যালে নর্তকীর মত বোঁ করে ওর সুমুখ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। আলেকজান্দার পেছনে অনুসরণ করলে।

আমার কাছে এস না, তাকে হাত নেড়ে ফিরে যেতে বললে, তোমাকে দেখতেও চাইনে।

এসব ভান রাখতো নাদেঙ্কা আলেকজান্দ্রোভনা!

মোটেই ভান নয়, বল তো, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

চারটের অফিস থেকে বেরিয়েছি, আলেকজান্দার শুরু করলে, এখানে আসতে একঘণ্টা লেগে গেল।

তাহলে তো পাঁচটায় এখানে আসতে, আর এখন ছটা, পুরো একঘণ্টা কি করলে? দেখি—কি গল্প তুমি ফাঁদ।

তাড়াতাড়ি একটা রেস্তর্াঁয় খেয়ে নিলাম।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম! শুধু একঘণ্টা লাগল! সে বললে, আহা, বাপু, তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে! একটু দুধ খাবে?

আমাকে পেয়ালাটা দাও! আলেকজান্দার হাত বাড়িয়ে দিলে।

কিন্তু নাদিয়া স্থির, পেয়ালাটা উলটে দিয়েছে, আলেকজান্দারের দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করছে না—শেষ ফোঁটা কয়টা বালির উপর পড়ছে, তাই কৌতূহলভরে দেখছে।

তুমি নিষ্ঠুর! সে বললে—আমাকে এমনি করে ব্যথা দাও কেন বল তো?

দেখ, দেখ আলেকজান্দার ফিওদরীচ, নাদিয়া তার কাজে মত্ত, সে বাধা দিয়ে বলে উঠল, ঐ যে পোকাটা পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে, ওর পায়ে কি এক ফোঁটা ফেলতে পারব। এই তো ফেলেছি। আহা বেচারী মারা যাবে! মায়া হল তার, সে পোকাটাকে নিজের হাতের তালুর উপর তুলে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগল।

তোমার যে পোকাটার উপর বড় দরদ দেখছি—বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল।

আহা বেচারী। দেখ—দেখ—মরে যাবে, বিষণ্ণ হয়ে উঠল নাদিয়া, এ কি করলাম!

কিছুক্ষণ হাতের তালুর উপরে সে রেখে দিলে। পোকাটা নড়ে উঠল, এবার হাতের তালুর উপর সামনে আর পেছনে গুটি গুটি চলতে শুরু করেছে। নাদিয়া চমকে উঠে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পোকাটাকে পা দিয়ে পিষে দিলে। বিশ্রী জিনিস!

আচ্ছা, কোথায় ছিলে বল তো? আবার সে শুধালে।

বলেছি তো—

ও-হো, তোমার খুড়োমশায়ের ওখানে। সেখানে অনেক লোক

ছিল বুঝি? শ্যাম্পেন ছিল? দূর থেকেও শ্যাম্পেনের খোশবাই ছাড়ছে।

কিন্তু খুড়োমশায়ের ওখানে যাইনি। আলেকজান্দার হতাশ হয়ে বাধা দিলে। কে বললে সেখানে গিছলাম?

তুমি নিজেই বলেছ।

আমার তো মনে হয়, এখন ওরা সবে টেবিলে বসেছেন। এই ভোজের ব্যাপার জান না—যেন এক ঘণ্টায় শেষ হল আর কি!

তুমি ভোজের জন্ম দুঘণ্টা পেয়েছিলে—চারটে থেকে ছটা—

তাহলে আমার সময় পেলাম কোথা থেকে?

নাদিয়া উত্তর দিলে না। একটা আকাশিয়ার ডালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। তার পরে পথে ছুটে চলল।

আলেকজান্দার পেছনে।

কোথায় চলেছ। সে শুধালে।

তোমার কি মনে হয়? মার কাছে যাচ্ছি।

কেন? হয়তো আমরা গিয়ে ওঁকে বিরক্ত করব।

না, করবনা।

নাদিয়ার মা মারিয়া মিখাইলোভনা এমন একজন সহজ-সরল সহৃদয়া মা যাঁরা সন্তানের সবকিছুই প্রশংসা করেন। ধরা যাক, মারিয়া মিখাইলোভনা গাড়ি জোতার হুকুম দিতে যাচ্ছেন।

মা মণি, কোথায় যাচ্ছ? নাদিয়া শুধায়।

এই একটু বেড়িয়ে আসি। এমন চমৎকার দিন! মা বলেন।

কিন্তু আলেকজান্দার ফিওদরাচ আসবেন বলেছিলেন।

গাড়ি ফেরত পাঠানো হল।

আবার মারিয়া মিখাইলোভনা বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন আর নক্সি নিচ্ছেন—অন্তহীন মাফলারের উপর কাঁটার টুং টাং বাজছে। তিনি বুনছেন, নয় তো পড়ছেন একখানা ফরাসী উপন্যাস।

মামণি, সাজগোজ করছ না কেন? কঠোর স্বরে শুধায় নাদিয়া।

কেন?

আমরা বেড়াতে যাব না?

বেড়াতে যাবে ?

হ্যাঁ। আলেকজান্দার ফিওদরীচ আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতে আসছেন।

তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি !

আমি তো কিছুই জানিনে।

কি যে হল ? নাদিয়া অসন্তুষ্ট হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

মা এবার বোনা বা বই রেখে দিয়ে সাজসজ্জা করতে যান। নাদিয়া পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করছে, ইচ্ছেমত সে তার নিজের আর মার সময় ব্যয় করে। আবার সে স্নেহময়ী এমন কি কোমলা মেয়েও বটে, কিন্তু বাধ্য তাকে বলা যায় না। সে তো মার বাধ্য নয়, বরং মা-ই' তার বাধ্য।

বল-ঘরের দরজার কাছে এসে নাদিয়া বললে, মার কাছে যাও।

তুমি ?

আমি পরে আসছি।

না, তুমি আগে যাও।

আলেকজান্দার ঢুকে পড়ে আবার সঙ্গে সঙ্গেই পা টিপে টিপে ফিরে এল।

উনি চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছেন, সে ফিস ফিস করে বললে।

তাতে কি, আমরা ভিতরে যাব। মা, মা-মণি !

উঃ ?

আলেকজান্দার ফিওদরীচ এসেছেন।

উঃ

মঁসিয়ে আদুয়েভ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

দেখ—কি গভীর ঘুমে আছেন ! ওঁকে জাগিয়োনা, আলেকজান্দার বললে

আমি জাগাবই। মা !

উঁঃ ?

হুঁ ওঠ—ওঠ এখন ! আলেকজান্দার ফিওদরীচ এসেছেন।

কোথায় আলেকজান্দার ফিওদরীচ ? সোজা তাঁর দিকে তাকিয়ে টুপিটা একপাশে সরে গিয়েছিল, সেটা ঠিক করতে করতে বলে উঠলেন মারিয়া মিখাইলোভনা, ওঃ তুমি—আলেকজান্দার ফিওদরীচ ! এস, এস ! আমি এখানে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কেন জানিনা, তবে মনে হয় আবহাওয়া

এবার মজা হবে। আমার শত্রু সবে পস্তিয়ে উঠেছে—এর মানে তো বুঝি। আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম ইগনাত্তি অতিথির কথা বলছে—কিন্তু তারা কারা ঠাহর পাইনি। তারপরেই নাদিয়া ডাকলে, আর আমিও জেগে উঠলাম। আমার পাতলা ঘুম একটু শব্দ হলেই চোখ খুলে যায়। বোস, আলেকজান্দার কিওদরাচ, তারপর কেমন আছ?

ধন্যবাদ, বেশ ভাল আছি।

পিওত্র ইভানিচ কেমন আছেন?

তিনিও বেশ ভালই আছেন।

তিনি একবার দেখা করতে আসেন না কেন? এই তো কালই ভাবছিলাম উনি একবার এলে পারতেন। কিন্তু উনি তো আবার অতি-ব্যস্ত মানুষ—

খুবই ব্যস্ত, আলেকজান্দার বললে।

আমরা তোমারও ক'দিন দেখা পাইনি মারিয়া বলে চললেন। আজ জেগে উঠেই শুধালাম—নাদিয়া কি করছে? ওরা বললে, এখনো ঘুমোচ্ছে। বললাম, ঘুমোক, সারাদিন বাগানে ছিল, দিনটিও ভাল—ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওদের বয়সে ঘুমটি গাঢ় হয়। আমার বয়সে অবিশ্যি আলাদা ব্যাপার। তুমি বিশ্বাস করবে না—অনিদ্রা রোগে ভুগছি। একেবারে কাবু করে দিয়েছে—স্নায়ুর ব্যারাম না কি কে জানে! ওরা আমাকে কফি এনে দেয়—আমি বিছানায় বসে কফি খাই। কফি খেতে খেতে নিজের মনেই ভাবছিলাম—আলেকজান্দার কিওদরীচকে দেখছি না কেন? অসুখ-বিসুখ করেনি তো। তারপরে উঠে পড়লাম—বেলা এগারোটা বাজেনি তো! চাকর—চাকরাণীগুলো কখনও বলে না! নাদিয়ার ঘরে গেলাম, সে তখনো ঘুমে। ওকে জাগিয়ে দিলাম। বাছা, ওঠ, ওঠ, প্রায় বারোটা বাজে, কি হয়েছে তোমার? ওর কাছেই সারাদিন আছি দাইয়ের মতো, গভর্নেসকে ইচ্ছে করেই চলে যেতে বললাম, বাজে বাজে লোক থাকুক তা চাইনে। একজন অপরিচিতকে বিশ্বাস করলে যে কি হয় ভগবান জানেন! আমি নিজেই ওকে মানুষ করেছি। বড় কড়া ধাতের আমি, কখনো আমার কাছ ছাড়া করিনি। একথা আমি বলব—নাদিয়া আমার ভাল মেয়ে আমার কাছে কিছু লুকায় না। ওকে আমি বেশ ভাল করে জানি।

তারপর সর্দার বাবুর্চি এল, ওর সঙ্গে ঘণ্টা খানেক কথা বললাম। তারপরে পড়তে বসলাম মেমোয়ের স্ত দারাবান—ওই হুলিয়েকে আমার পছন্দ, সুন্দর লেখে। তারপরে পড়শী ইভানোভ্না তার স্বামীকে নিয়ে এলেন। কি করে যে সকালটা কাটল টেরই পেলাম না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি চারটে, ডিনারের সময়। হাঁ, ভালকথা—ডিনারে এলে না কেন? পাঁচটা অব্দি আমরা বসে রইলাম।

পাঁচটা অবধি? আলেকজান্দার আউড়ে গেল—আমি আসতে পারলাম না।

আমিও সেই কথাই বললাম, কিন্তু নাদিয়া বলতে লাগল, আর একটু দেখব আমি।

মা-মণি, কি করে বললে? আমি বলি নি—'মা, এস আমরা ডিনার খেয়ে নিই।' আর তুমি বলতে লাগলে—না, আমরা একটু দেরী করি—আলেকজান্দার বহুদিন আসেনি। ও ঠিক ডিনারে আসবে।

মারিয়া মাথা নেড়ে বললেন, ওর কথা শোন! কি বেহায়া মেয়ে! আমার মুখে ওর নিজের কথা বসিয়ে দিলে! নাদিয়া ফুলগুলোর দিকে ফিরলে, তোড়াটাকে আলাতন করতে লাগল, বললাম, আলেকজান্দার এখন আসবে না, এখন সাড়ে চারটে। কিন্তু ও বলতে লাগল, না, মা-মণি, আমাদের দেরী করতেই হবে, উনি আসবেন। পৌনে পাঁচটার সময় আবার বললাম—নাদিয়া যাই-ই বল, আলেকজান্দার হয়ত আর কোথাও ডিনার খেতে গেছে, আসবে না। আমার খিদে পেয়েছে। কিন্তু না—একটু সবুর করো, পাঁচটা অবধি দেখ—আমাকে ঠায় উপোস করিয়েই রাখলে। কি গো, অস্বীকার করবে?

পলি, পলি—ফুলের ভিতর থেকে বের হয়ে এল—কোথায় ডিনার খেলে,—নানকিস্তে নাকি গো?

ও কি? এখন লুকোচ্ছ? মা বলে উঠলেন, আমার মনে হয়, তুমি দিনের আলোয় দেখা দিতে লজ্জা পাচ্ছ?

একটুও না, নাদিয়া ফুলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে জানালায় বসল।

টেবিলেও বসল না মারিয়া এক পেয়ালা দুধ নিয়ে বাগানে চলে গেল। ডিনার খেলই না। কি হল? ওগো, আমার চোখে চোখে তাকাও তো?

আলেকজান্দার অবাক হয়ে শুনলে সে কাহিনী। নাদিয়ার দিকে সে তাকালে, নাদিয়া তার দিকে পিছন ফিরে আস্তে আইভি পাতা ছিঁড়ছে।

নাদেজদা আলেকজান্দ্রোভনা, সে বললে, আমি কি সত্যিই এমন ভাগ্যবান? সত্যিই কি আমার কথা তুমি ভাব?

আমার কাছে এস না। চেঁচিয়ে উঠল, নিজের চাতুরী ধরা পড়ায় সে বিরক্ত। মা ঠাট্টা করছেন আর তুমি তাই বিশ্বাস করছ?

আলেকজান্দারের জন্য যে স্ট্রবেরী রেখেছিলে সেগুলো কোথায়? মা শুধালেন।

স্ট্রবেরী?

হ্যা স্ট্রবেরী।

সেগুলো তো ডিনারের সময় খেয়েছ, নাদিয়া বললে—

আমি? বলতে লজ্জা করল না—তুমিই তো থামিয়ে রাখলে—আমাকে একটাও দিলে না। বললে আলেকজান্দার আসছেন, উনি এলে তোমাকে কটা দেব, এবার কি বলবে?

আলেকজান্দার নাদিয়ার দিকে তাকাল, প্রেমার্ত তীব্র তার দৃষ্টি। নাদিয়া শরমে রক্তিম।

ও নিজে ছড়া থেকে ছাড়িয়ে রেখেছে আলেকজান্দার, মা হেসে বললেন।

মা-মণি, ওসব বাজে কথা বলছ কেন? আমি ছড়া থেকে দু-তিনটে ছাড়িয়ে নিজে খেয়েছি, ভাসিলিসা আরগুলো ছাড়িয়েছে।

আলেকজান্দার ওর কথায় বিশ্বাস কোরো না—ভ্যাসিলিসাকে খুব ভোরে শহরে পাঠিয়েছি। কেন ভান করছ? আমি জোর দিয়ে বলতে পারি—ভাসিলিসার বদলে তুমি ছাড়িয়েছ শুনলে আলেকজান্দার খুশীই হবে।

নাদিয়া হেসে আবার ফুলগাছগুলির ভিতরে মিলিয়ে গেল, তারপরে এক থালা স্ট্রবেরী নিয়ে ফিরে এল। সে আলেকজান্দারের দিকে বাড়িয়ে দিল থালাখানা, আলেকজান্দার তার হাতে চুমু খেয়ে থালাখানা সৈন্যাধ্যক্ষের ব্যাটনের মতোই গ্রহণ করলে।

নাদিয়া বললে, আমাদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ, তোমার একটাও পাওয়া উচিত নয়, আমি ঘুণ্টা কটকে দাঁড়িয়ে ছিলাম—আর ভাব তো—দূর থেকে দেখলাম—কে যেন আসছে—ভাবলাম, তুমি বুঝি। কপাল

ওড়ালাম, তারপরে দেখি একজন অপরিচিত অফিসার। আর তার কি সাহস, সেও রুমাল ওড়ালে।

অতিথিরা সন্ধ্যায় এলেন, চলে গেলেন। রাত হল, আবার তিনজন একা —মা, মেয়ে আর আলেকজান্দার। এই তিনজনের দলটিও ধীরে ধীরে ভেঙে গেল। নাদিয়া বাগানে চলে গেল, মারিয়া আর আলেকজান্দার তাঁদের থেমে-থাকা দ্বৈত আলাপ আবার শুরু করল। বহুক্ষণ ধরে মারিয়া তাঁর কাল আর আজকেরকাজের ফিরিস্তি দিলেন, আবার আগামী কাল কি করবেন তাও বললেন। আলেকজান্দারের বিরক্তি আর উদ্বেগ। রাত ঘনিয়ে আসছে, এখনো নিভৃতে নাদিয়ার সঙ্গে একটা কথা বলা হল না। সর্দার বাবুর্চি অবশেষে এসে তাকে মুক্তি দিলে। সেই উপকারী বন্ধুটি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে সাপারে মারিয়ারা কি খাবেন। ইতিমধ্যে আলেকজান্দার তার অসহিষ্ণুতা দমনে চেষ্টা করতে লাগল, নৌকোর চেয়েও এখন সে অসহিষ্ণুতা প্রবলতর। টক্‌ দুধ আর মাংসের পিঠের আলোচনার সময়, আলেকজান্দার কৌশলে সরে পড়বার পরিকল্পনা করল। মারিয়ার কাছ থেকে চলে আসবার জন্য অনেক চেষ্টাই সে করলে। প্রথমে জানালার কাছে গিয়ে তাকাল বাইরের দিকে, তার পা তাকে খোলা দরজার কাছে প্রায় টেনে নিয়ে গেল। তারপর উপরে ছুটে না গিয়ে, সে পিয়ানোর কাছে এল, এখানে ওখানে ঘাট টিপলে, স্ট্যাণ্ড থেকে কয়েকটা স্বরলিপির রেকর্ড আঙুলে তুলে নিয়ে দেখে আবার রেখে দিলে। সত্যই তার সে সংযম আছে, সে একটা ফুলের গন্ধ শুঁকলে, তোতাটাকে জাগিয়ে দিলে। এবার অসহিষ্ণুতা চড়ল মাথায়—খোলা দরজা তার পাশেই, কিন্তু পালালে তো চলবে না। মিনিটখানেক কি মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—তার পরে যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বাবুর্চি এরই মধ্যে দু-পা পিছু হটে এসেছে, শেষ কথাটা বলার জন্য। সে চলে যাবে, তারপরে মাদাম লুবেৎস্কিয়া আবার তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ জুড়ে দেবেন। আলেকজান্দারের আর সইছে না, সে সাপের মতো এঁকেবেঁকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, বারান্দার সব চেয়ে উঁচু সিঁড়ি থেকে পড়ল লাফিয়ে তারপর কয়েক লাফে গিয়ে বাগানে একেবারে নাদিয়ার পাশে হাজির।

এতক্ষণে আমাকে মনে পড়ল, ঠাট্টা করে নাদিয়া বললে।

তুমি যদি জানতে আমি কি সয়েছি, আলেকজান্দার উত্তর দিলে, আর তুমি কিনা আমাকে একটুও সাহায্য করলে না!

নাদিয়া তাকে হাতের বইখানি দেখালে।

বললে, তুমি না এলে, তোমাকে আর এক মিনিট পরে এইটের জন্তই ডেকে পাঠাতাম। বোস, মা এখন আসবেন না। ঠাণ্ডায় তাঁর ভয়, উঃ তোমাকে যে কত কথা বলবার আছে!

আমারও আছে!

দুজনে দুজনকে কিছুই বললে না—সত্যি তেমন কিছু না—যে কথা আগেও বিশবার বলেছে, সেই কথাই বলা হল। সেই মামুলি স্বপ্ন, আকাশ, নক্ষত্র, তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি—তাদের সুখ। আলাপ বেশির ভাগই চলছে নাগল চোখের ভাষায়, হাসিতে আর উচ্ছ্বাসে। বইখানা ঘাসের উপর পড়ে রইল। রাত এল—কিন্তু পিটার্সবুর্গের গ্রীষ্মে রাত বলে কিছু আছে কি? রাত নয়, আর একটা নামকরণ তার করতে হয়—গোধূলীর মত কি যেন। চারিদিকে নীরবতা। নেভা যেন ঘুমন্ত, মাঝে মাঝেই যেন ঘুমের ঘোরে এক-একটা ছোট ঢেউ আলতোভাবে তীরে আঘাত করছে। তারপরে সব চুপ। বিলম্বিত বাতাস কোথায় যেন দেখা দেয়, ঘুমন্ত জলকে নাড়া দিয়ে যায়, কিন্তু জাগাতে পারে না, শুধু উপরে তরঙ্গ তোলে, নাদিয়া আর আলেকজান্দারকে তার শীতল নিঃশ্বাস বুলিয়ে দিয়ে যায়—অথবা দূর থেকে গরম হাওয়া ভাসিয়ে আনে। তারপরে আবার সব স্তব্ধ—নেভা ঘুমন্ত মানুষের মতই স্থির, যেন এক মুহূর্তের জন্ত সামান্ত শব্দে জেগে উঠেছিল, আবার তখনি চোখ বুজেছে। তার ভারি চোখের পাতা আরো আঁট হয়ে বুজে গেছে। তারপর যেন সেতুর পরপার থেকে ভেসে এল দূরাগত শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের ঘেউঘেউ—একটু দূরে জাল পাতা হয়েছে খোঁটা দিয়ে—তারই পাহারাদার কুকুরটা। তারপরে সব নীরব। গাছগুলো যেন অন্ধকার বিতানযুক্ত ছাদ, তাদের ডালপালা নিঃশব্দে দুলছে। নদীতীরের গ্রীষ্মাবাসের কুটীরগুলিতে ঝিকমিক করছে আলো।

এমন সময়ে উষ্ণ বাতাস কি মোহ নিয়ে আসে? কি সে রহস্য যা দুলে দুলে, গাছপালায় আর ঘাসে হানা দেয়, আর আত্মা ও মনকে কোমলতায়

ভরে দেয়? যে ভাব ও অনুভূতি হৈ চৈ আর সমাজের পরিবেশ জন্ম দেয় তার চেয়ে ভিন্ন ভাবনা কেন দেখা দেয়? এই ঘুমন্ত প্রকৃতি, এই গোধূলী, এই নিঃশব্দ গাছপালা, সুগন্ধী ফুল, এই নির্জনতা মনে প্রেমের কি এক পরিবেশ সৃষ্টি করে! মন কেমন করে যেন স্বপ্নের সঙ্গে তাল না রেখে পারে না, ঐ যে বিরল অনুভূতিগুলো প্রতিদিনের নিয়মিত কঠোর জীবনে এমন মূল্যহীন, অসঙ্গত, ব্যর্থ বলে মনে হয়—হৃদয় কেমন করে তার সঙ্গে তাল রাখে। তারা অন্তঃসারশূন্য হতে পারে, তবু হৃদয় সেই মুহূর্তগুলিতেই চির আকাঙ্ক্ষিত, চির অপ্রাপ্য সুখের অস্পষ্ট সম্ভাবনার একটুখানি হদিশ পায়।

আলেকজান্দার আর নাদিয়া নদীর কাছে এসে বাগানের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল। নেভার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল নাদিয়া, ভাবনায় সে বিভোর, দূরে তাকিয়ে রইল। আলেকজান্দার তাকিয়ে রইল নাদিয়ার দিকে। আনন্দে কানায় কানায় ভরপুর তাদের আত্মা, হৃদয়ে তাদের ব্যথা —সে ব্যথা মধুর আবার যন্ত্রণাভরা, কিন্তু তারা তাদের শুদ্ধ।

এবার আলেকজান্দার তার কটিতট স্পর্শ করলে, সে অমনি মৃদুভাবেই কনুই দিয়ে হাতখানা সরিয়ে দিলে। সে আবার চেষ্টা করলে, সে আবার তার চেয়েও মৃদুভাবে সরিয়ে দিলে হাতখানা—নদীর দিক থেকে চোখ ফেরালে না। তৃতীয়বার চেষ্টা করতে সে আর হাত সরিয়ে দিলে না।

আলেকজান্দার হাতখানা তুলে নিলে—নাদিয়া ছাড়িয়ে নিলে না। সে হাতে চাপ দিল, জবাব পেল। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল তারা—কিন্তু কি তাদের অনুভূতি।

নাদিয়া—মৃদুস্বরে ডাকলে সে।

নাদিয়া নিরুত্তর।

আলেকজান্দার কম্পিত বক্ষে ঝুঁয়ে পড়ল তার দিকে। নাদিয়া গালে অনুভব করছে তার উষ্ণ নিঃশ্বাস। সে চমকে উঠল, মুখ ফিরিয়ে নিলে—কিন্তু ক্রোধে পিছু হটে গেল না, আর্তনাদও করলে না। আর তো ছলাকলা দেখাতে সে পারছে না, পিছু হটবেও না, প্রেমের জাদু যুক্তির স্বরকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। আলেকজান্দার যখন তার নিজের ঠোঁট দুটো তার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলে, সে চুম্বনে সাড়া দিলে প্রায় নিজেরই অজান্তে, সত্যিই তাই; সাড়া সে দিল।

খুবই অশুচিত—কড়া প্রকৃতির মায়েরা চিৎকার করে উঠবেন—বাগানে একা, মা নেই—এক যুবকের সঙ্গে চুম্বন বিনিময়—কিন্তু, উপায় কি। হয়তো অশুচিত, কিন্তু সে তো চুম্বনে সাড়া দিল।

আলেকজান্দার আবার ঠোঁটের উপর ঝুঁকে পড়ে আপন মনে বললে—মানুষ এত সুমিষ্ট হতে পারে। এবারে তার ঠোঁটের উপর নিজের ঠোঁট কয়েক সেকেণ্ড ধরেই রইল।

নাদিয়া দাঁড়িয়ে আছে, বিবর্ণ, স্থির নাদিয়া—তার চোখের পাশে জল চিকচিক করছে, বুকে উঠছে প্রচণ্ড দোলা।

এ যে স্বপ্ন। আলেকজান্দার ফিসফিসিয়ে বললে।

নাদিয়া হঠাৎ চমকে উঠল, বিস্মৃতির মুহূর্ত চলে গেছে।

তুমি নিজেকে ভুলে গেছ—সে চিৎকার করে তার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি দূরে সরে গেল। মাকে আমি বলে দেব।

আলেকজান্দার আকাশ থেকে যেন পড়ল।

না দেখনা আলেকজান্দ্রোভনা! ভৎর্সনা করে আমার সুখ নষ্ট করে দিয়ো না। তুমিও তাঁর মতো—

নাদিয়া তার দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল, উচ্চ রূপার হাসি। আবার এসে রেলিঙের পাশে দাঁড়াল সে, তার হাত বিশ্বাসভরে তার কাঁধে ন্যস্ত।

এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছে গালে, তা মুছতে মুছতে শুধালে। আমাকে তুমি এত ভালবাস?

আলেকজান্দার এক অনির্বচনীয় সুখরতায় নিজেরই অজ্ঞাতে কাঁধ নাড়লে। পিতর ইভানোভিচ মুখের এই অভিব্যক্তি দেখে হয়ত মূর্খের আখ্যাই দিতেন, হয়তো এ তাই—কিন্তু এই মূর্খতা-ব্যঞ্জক অভিব্যক্তিতে কত আনন্দ কত সুখ।

যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে ওরা জল, আকাশ আর সুদূরে তাকিয়ে রইল। পরস্পরের দিকে তাকাতে ওদের ভয়। অবশেষে যখন ওদের দৃষ্টির মিলন হল, ওরা হাসল। তখনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলে।

নাদিয়া একটু থেমে বললে, পৃথিবীতে কি সত্যিই দুঃখ আছে?

আলেকজান্দার ভাব-গম্ভীর, সে উত্তর দিলে, লোকে তো বলে আছে, কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করিনে।

কি দুঃখ থাকতে পারে?

আমার খুড়োমশাই বলেন—দারিদ্র্য।

দারিদ্র্য! কিন্তু গরীবরা কি আমরা এখন যেমন অনুভব করছি, তেমনি করে না? তাহলে তো তারা আর গরীব নয়!

খুড়োমশায় বলেন, এসব জিনিসের তাদের সময় নেই। তাদের খাওয়া দাওয়ার কথা চিন্তা করতে হয়।

খাওয়ার কথা! তোমার খুড়ো যা বলেন তা সত্যি নয়—খাওয়া ছাড়াও মানুষ সুখী হতে পারে। এই তো আজ আমার ডিনার খাওয়া হয়নি, তবু দেখ আমি কি সুখী।

আলেকজান্দার হাসল।

নাদিয়া বলে চলল, এমন মুহূর্তের জন্য আমি আমার সব কিছু গরীবকে বিলিয়ে দিতে পারি। আসুক না গরীব মানুষ। কেন আমি সবাইকে সান্ত্বনা আর আনন্দ দিতে পারব না, কেন পারব না সুখী করতে?

দেবী, তুমি দেবী! আলেকজান্দার তার হাত চেপে ধরে বললে।

আমাকে ব্যথা দিলে! নাদিয়া কপাল কুঁচকে হাত ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠল।

কিন্তু আলেকজান্দার আবার হাত ধরে তার উপরে চুমু দিতে লাগল।

নাদিয়া বলতে লাগল, এমন সন্ধ্যার জন্য ঈশ্বরকে কি বলে আজ, কাল—আমার সারা জীবন ধরে ধন্যবাদ দেব। আমি কি সুখী!

তুমি?

হঠাৎ ভাবনায় বিভোর হয়ে গেল মেয়ে। তার চোখে ভেসে উঠল আশংকার ছায়া।

শোন, সে বললে, লোকে বলে, কোন-কিছুরই পুনরাবৃত্তি হয়না। তার মানে কি এই—এই মুহূর্তটি আর আসবে না?

না, না, আলেকজান্দার বললে, একথা সত্য নয়! এ তো ফিরে আসবে! এর চেয়েও সুন্দর মুহূর্ত আসবে। হাঁ—আমার বিশ্বাস—

অবিশ্বাস ভরে মাথা দোলালে নাদিয়া। খুড়োমশাইয়ের শিক্ষা মগজে ভেসে উঠল, আলেকজান্দারও হঠাৎ থেমে গেল।

না, সে আপন মনে বললে। না, এ হতে পারে না। আমার খুড়ো-

মশাই এমন সুখ কখনো পাননি, তাই তিনি এমনি কঠোর এমনি অপরের প্রতি সন্দিগ্ধ। আহা বেচারী! তার শীতল কঠোর হৃদয় দেখে আমার করুণা হয়। প্রেমের নেশার কিছুই জানল না। তাই তো জীবন সম্পর্কে পাণ্ডু রোগীর মতো তাঁর ভাবধারা। ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করুন! যদি তিনি আমার এই সুখ দেখতে পেতেন, তাহলে হয়তো তিনিও একে অপমান করতে পারতেন না! আমার তাঁর উপরে করুণাই হয়।

না, না, নাদিয়া, আমরা সুখী হব, সে জোরে বলতে লাগল। চারদিকে তাকাও। আমাদের প্রেমে কি সবকিছু সুখী নয়? ঈশ্বর একে আশীর্বাদ করবেন। আমরা জীবনের পথে হাত ধরাধরি করে কি আনন্দেই না চলব! আমরা কত না গর্ব করব, কত না আমাদের পারস্পরিক এই ভালবাসায়। মহান হয়ে উঠব!

নাদিয়া বাধা দিলে, দূরে তাকিও না—ভবিষ্যদ্বাণী কোরো না! অমন করে যখন বল, আমার কেমন ভয় লাগে। আমার এখনো ভয় আছে।

কিসের ভয়? আমাদের নিজেদের প্রতি নিশ্চয়ই বিশ্বাস রাখার অধিকার আছে?

না, না,—নাদিয়া মাথা নাড়লে।

আলেকজান্দার তার দিকে তাকিয়ে ভাবলে ও বললে—কেন নয়?

আমাদের এই সুখ কিসে ধ্বংস হতে পারে? আমরা কি করি না করি—তাতে কার কি? আমরা সবসময়েই একা থাকব—অপরকে দূরে সরিয়ে রাখব—তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? তাদেরই বা আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক কি? আমাদের কথা কেউ ভাববে না, আমরা বিস্মৃত হয়ে যাব, দুঃখ আর দুর্ভাগ্যের গুজবে আমরা বিচলিত হব না। এইখানে, এই বাগানে আমরা থাকব, এই পবিত্র নীরবতা কোন শব্দ এসে ভেঙে দেবে না—

নাদিয়া! আলেকজান্দার! হঠাৎ বারান্দা থেকে ভেসে এল স্বর, তোমরা কোথায়?

শুনছ? নাদিয়া ভবিষ্যৎবক্তার স্বরে বললে, ঐ নিয়তির ইঙ্গিত—এই মুহূর্ত আর ফিরে আসবে না। আমার তাই মনে হচ্ছে।

নাদিয়া তার হাত ধরে চাপ দিলে, তার দিকে অদ্ভুত বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে

তাকিয়ে হঠাৎ গলির অন্ধকারে ডুবে গেল। সে একা, আবার তার ভাবনা তাকে ঘিরে ধরেছে।

বারান্দা থেকে আবার ভেসে এল স্বর—আলেকজান্দার! বহুক্ষণ হল টেবিলে চৈ পড়ে আছে।

সে ঘাড় নেড়ে বাড়ির দিকে চলল এবং নাদিয়াকে বলল—ঐ সুখের মুহূর্তের পর—হঠাৎ দইয়ের কথা! জীবন কি সত্যিই এমনি!

যতক্ষণ না এর চেয়েও খারাপ না হয়, ততক্ষণ এমনি, নাদিয়া উত্তর দিলে, চৈ খেতে ভাল, বিশেষ করে যার ডিনার খাওয়া হয়নি তার কাছে তো বটেই।

নাদিয়া সুখে উজ্জ্বল। তার গালে রক্তিমাভা, চোখ জ্বলছে অস্বাভাবিক আলোয়। কি করুণাময়ী গৃহকর্ত্রী, কি সরস কথাই না বলে! ক্ষণিকের বিষণ্ণতার চিহ্নও আর নেই। সব ডুবে গেছে আনন্দে।

আলেকজান্দার যখন এসে নৌকোয় উঠল, তখন উষা এসে আকাশের ছাদঘরের অর্ধেক ঢেকে দিয়েছে। মাঝিরা প্রতিশ্রুত পুরস্কারের আশায় হাতের চেটোয় থুথু ফেলে আবার নিজেদের জায়গায় উঠতে আর বসে পড়তে লাগল, প্রাণপণে বাইলে দাঁড়।

অত তাড়াতাড়ি নয়, আলেকজান্দার বললে, ভদ্‌কার জন্যে আরো পঞ্চাশ কোপেক দেব!

তারা ওর দিকে তাকাল, তারপরে পরস্পরের দিকে। একজন বুক আঁচড়ালে, আর একজন পিঠ চুলকালে—আবার প্রায় নিঃশব্দে বাইছে, জল ছুঁয়ে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। নৌকো রাজহাঁসের মত ভেসে চলেছে।

আমার খুড়োমশায় আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সুখ একটা মরীচিকা, এই জীবনে কোন কিছুকেই একেবারে বিশ্বাস করতে নেই—তাঁর নিজের জন্য লজ্জিত হওয়াই উচিত। এ বড় খারাপ কথা! তিনি আমাকে কেন নিষ্ঠুর ভাবে বঞ্চিত করতে চাইছেন। এজীবনেরই আমি কল্পনা করেছিলাম। এমনিই তো হওয়া উচিত, আর তা হয়েছেও, হবেও, নইলে তো জীবনই থাকে না।

প্রভাতের বিশুদ্ধ বাতাস উত্তর থেকে বয়ে এল। বাতাস আর স্মৃতি আলেকজান্দারকে সচকিত করে তুলেছে, এবার সে হাই তুলে ছোট্ট কোট গায়ে জড়িয়ে দিবাস্বপ্নে মশগুল হয়ে গেল।

পাঁচ

আলেকজান্দার এখন সুখের উচ্চে। আর তার কোন কামনা নেই, তার কাজ, তার সাংবাদিকতার পরিশ্রম এখন বিস্মৃত, পরিত্যক্ত। অফিসে তাকে ছিড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে লক্ষ্যও করে না। আর খুড়োমশাই বললে তবে তা তার নজরে পড়ে। পিওত্র ইভানীচ তাকে পরামর্শ দিয়েছেন—তুচ্ছ ব্যাপারে সে যেন সময় নষ্ট করা এখন থামিয়ে দেয়। কিন্তু 'তুচ্ছ' কথাটায় আলেকজান্দার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়েছে, করুণাভরে হেসেছে আর তেমন কিছু বলেওনি। খুড়োমশাই যখন দেখলেন, তাঁর পরামর্শ দেওয়া বৃথা, তিনিও কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে করুণ হাসি হেসে কিছু বলেন নি। কিন্তু এই কথাটা বলতে চাচ্ছেন নি, তোমার নিজের মত চলচ চল, কিন্তু নোংরা টাকাকড়ি যেন আমার কাছে চাইতে এস না।

আলেকজান্দার উত্তর দিয়েছে। কাকা, সে ভাবনা নেই। কম টাকা থাকাটা দুর্ভাগ্য বই কি—আমার বেশি চাহিদা নেই—যথেষ্টই আছে।

তাহলে আমি তোমাকে শুধু অভিনন্দন জানাতে পারি, পাল্টা জবাব দিলেন পিওত্র ইভানীচ।

আলেকজান্দার স্পষ্টই তাঁকে এড়িয়ে চলছে। খুড়োর উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু প্রেমের প্রতি তাঁর উদাসীনতায় বিশেষতঃ নাদিয়ার প্রতি তাঁর ভাইপোর অনুরাগের প্রতি অপমানকর ইঙ্গিতেই তার ভয়।

খুড়োমশায়ের প্রেমের বিশ্লেষণ সে শুনতে পারে না। সকলের প্রতি যে আইন-কানুন প্রযোজ্য সেইটেই শান্তভাবে তিনি ভাইপোর প্রেমের উপরেও প্রয়োগ করলেন, আলেকজান্দার যাকে মহান আর পবিত্র বলে মনে করে তাকে এমনি করে অপবিত্র করে তোলেন। সে তার আবেগ তার বিশ্বাস গোলাপী সুখময় ভবিষ্যতে লুকিয়ে রাখে, তার মনে হয় তার খুড়োর বিশ্লেষণের স্পর্শে ঐ গোলাপেরও পাপড়ি খসে পড়বে, মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। প্রথমে তার খুড়োমশাই তাকে এড়িয়ে চললেন। তিনি ভাবলেন, ছোকরা কুঁড়েমি করবে, নিজের সবকিছু খোয়াবে, তারপর আসবে তাঁর কাছে টাকা চাইতে। তাঁর উপরে এক বোঝা হয়ে থাকবে।

আলেকজান্ডারের ভঙ্গীতে, তাহার বাহ্যিক চেহারায় কি এক গভীর আর মহত্ত্বের আবেশ ছিল। বড় পুঁজিপতি যেমন ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের প্রতি সবিনয় ব্যবহার করেন, তেমনি ব্যবহার সে করতে লাগল সকলের সঙ্গে। মনে মনে ভাবে সে—আহা বেচারীরা, আমার মত ধনদৌলত তোমাদের কার আছে? আমার মত অনুভূতি কার আছে? এমন আত্মার দৃঢ়তাই বা কার—ইত্যাদি। তার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে সেই একমাত্র মানুষ, যে ভালবেসেছে এবং গভীর ভালবাসা পেয়েছে।

শুধু বুড়োকেই নয়, যাদের জনতা বলে তাদেরও সে এড়িয়ে চলতে লাগল। হয় সে তার দেবীর মন্দিরে পূজা দেয়, নয়ত নিজের ঘরে একা সুখে বিভোর হয়ে বসে তারই বিশ্লেষণ করে, তাকে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুতে ভাগ করে। একেই সে বলে নিজের জগৎ সৃষ্টি করা। নির্জনে বসে বসে সে সত্যই নিজের জন্য পৃথিবীর মত একটা কিছু সৃষ্টি করে বসল, সেখানেই প্রধানতঃ তার বসবাস। অনিচ্ছাসত্ত্বে কখনো-সখনো সে অফিসে যেতে লাগল—তার নাম দিলে সে তিক্ততাময় প্রয়োজন, এক আবশ্যক মন্দ বা নিরানন্দ গল্প। বহু নামকরণ সে করলে। সম্পাদক এবং তার বন্ধুদের কাছে সে গেলই না।

নিজের অহং-এর সঙ্গে আলাপে সে পেত পরম আনন্দ। মাঝে মাঝে সময় করে যে গল্পটা লিখছিল সে তাতে জুড়ে দিল 'একমাত্র একাকী থাকলেই মানুষ আপনার মতো নিজেকে দেখতে পায়। শুধু তখনই সে মানুষের মহত্ত্ব আর আত্মসম্মানে বিশ্বাস করতে শেখে! নিজের আত্মিক শক্তিগুলির সঙ্গে এই আলাপ কি চমৎকার! নেতার মতো তাদের সে তীব্র সমালোচনা করে, দেখে, অতি যুক্তিপূর্ণ পরিকল্পনা অনুসারে তাদের সাজায়, তাদের নায়ক হিসেবে সে সামনে এগিয়ে যায়, কাজ করে, সৃষ্টি করে। আর অন্য দিকে যে মানুষ নিজের সঙ্গ এড়িয়ে চলে একা থাকতে ভয় পায়, যারা তার মনের সঙ্গে অপরিচিত তাদেরই সঙ্গ খোঁজে—সে কি করুণার পাত্র…।' আপনার তাকে দেখে মনে হবে সে পৃথিবীর কাঠামো সম্বন্ধে অথবা মানবতার জীবন সম্বন্ধে নতুন আইন কানুন আবিষ্কারের ভাবনায় পড়েছে আসলে সে একজন মানুষ যে প্রেমে পড়েছে।

তাকে তার পিঠ-উঁচু চেয়ারে আসীন দেখুন—তার সুমুখে এক তা কাগজে

কয়েকটা পংক্তি লেখা। এবার সে কিছু সংশোধনের বা কয়েক লাইন বাড়াবার জন্য ঝুঁকে পড়ল কাগজখানির উপর। এখন সে চেয়ারে ভাবনার জন্যে এলিয়ে পড়েছে। তার ঠোঁটে হাসির ঝলক—এটা তো স্পষ্টই বোঝা যায় স্বপ্নের কানায় কানায় ভরা পাত্র থেকে সে এইটুকু সবে সরিয়ে এনেছে। তার চোখ পরম আরামে বোজা, যেন সে বিষণ্ণ বিড়ালটি—অথবা চোখে হঠাৎ ঝলসে উঠছে অন্তরের আবেগের আগুন।

চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু শোনা যায় দূরে কর্মব্যস্ত পথে গাড়ির গুঞ্জনধ্বনি, মাঝে মাঝে ইভেন্সী জুতো সাফ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বেশ জোরেই ভাবছে: কুলোলে চলবে না—জিনিসপত্রের জন্য এক, আর বাঁধাকপির জন্য পাঁচ কোপেক ধারি। কাল দিয়ে দিতে হবে, নইলে আর কোনো সময় দোকানী ধার দেবে না। পশু কোথাকার! এমন করে রুটি মাপে—যেন একটা আকাশের বজ্র—এ এক বিশ্রী কাণ্ড! হাঃ ঈশ্বর, বড়ই ধকল গেল! এইবার জুতো সাফ করা শেষ করে একটু ঘুমোতে হবে। গাঁয়েতে অনেকক্ষণ আগে নিশ্চয় সবাই ঘুমিয়ে গেছে, এখানকার মত নয়! হা ঈশ্বর, কবে আবার দেখব!

ইভেন্সী জোরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, জুতোর উপরই ফেলে, আবার ব্রুশ ঘসতে থাকে। একমাত্র না হোক, এটাকেই সে প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে। জুতো সাফাইয়ের দক্ষতা দিয়েই সে ভৃত্য বা অন্য মানুষকে বিচার করে, এক অক্লান্ত উৎসাহ নিয়েই সে সাফ করে জুতো।

ইভেন্সী, থামাও তো ওসব, তোমার ঐ বাজে ব্যাপার আমার কাজে বাধা দিচ্ছে—আলেকজান্দার চেঁচিয়ে উঠল।

বাজে ব্যাপার? ইভেন্সী ঘোঁত ঘোঁত করতে লাগল। বাজে ব্যাপার! তুমিই বাজে ব্যাপারে সময় নষ্ট করছ—আমি সাচ্চা কাজ করছি। দেখ তো কেমন নোংরা করে রেখেছ জুতোগুলো, আমার সাধ্যমত সাফ করছি।

টেবিলের উপরে জুতো রেখে আরশীর মতো চামড়ার দিকে প্রেমার্ত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

দেখ তো, এমন সাফ করতে কেউ পারবে কি! বাজে ব্যাপারই বটে!

আলেকজান্দার নাদিয়ার স্বপ্নে নিমগ্ন হয়ে গেছে। গভীর হতে গভীরতর তার সেই নিমজ্জন—আর সেই স্বপ্ন ধীরে ধীরে এসে কবিতা রচনার স্বপ্নে মিলে-মিশে গেছে।

তার টেবিলে কিছু নেই। তার আগেকার অফিসের কাজের বা সাংবাদিকতার কোনো স্মৃতিই স্তূপীকৃত হয়ে নেই টেবিলে, আলমারীর তাকে বা খাটের নিচে।

সে বলে, ঐ জঞ্জাল দেখলেই সৃষ্টির ভাবনা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, যেমন পথে তেল না দেওয়া গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনে গাছপালার ভেতর থেকে হঠাৎ পালায় নাইটিঙ্গেল।

ভোরে দেখা যায়, সে লিখছে কোন প্রশস্তি। লুবেৎস্কায়াদের ওখানে যে সময়টুকু কাটায় সেটুকু ছাড়া আর সবখানি সময় তার কবিতা রচনায় নিবেদিত। কবিতা লেখে, নাদিয়াকে পড়ে শোনায়। নাদিয়া এক তা সুন্দর কাগজে সেটি নকল করে মুখস্থ করে। আলেকজান্দার কবির সেরা আনন্দে আনন্দিত—সে প্রিয়ার ঠোঁট থেকে শুনতে পায় তার কবিতা।

বলে, তুমি আমার কাব্যলক্ষ্মী। আমার বুকে যে পবিত্র শিখা জ্বলছে তুমি হও সেই পবিত্রতার দেবী, তেজের দেবদাসী, যদি তুমি অবহেলা কর, সে তো চিরদিনের জন্য নিবে যাবে।

সে ছদ্মনামে কাগজে কাগজে কবিতা পাঠাতে লাগল। সেগুলি ছাপাও হল, মন্দ নয় বলেই হল, সেখানে উদ্দীপনার অভাব নেই, আছে একাগ্র অনুভূতি—আবার ছন্দের গতিও ব্যাহত হয় না।

নাদিয়া তার প্রেমে মহিমময়ী, তাকে 'আমার কবি' বলে ডাকে।

সে বলে, হাঁ, তোমার, চিরদিনের জন্যই আমি তোমার। মহিমা হাসিমুখে তার জন্য প্রতীক্ষা করে, আর সে-মহিমা তো নাদিয়া। সে ভাবে, তার জন্য সে লরেলপাতার মালা গাঁথবে, লরেলপাতার সঙ্গে এখানে-ওখানে মিশিয়ে দেবে মার্টেল পাতা, তার পরেই বলে ওঠে—জীবন, আহা তুমি কি সুন্দর! আর আমার কাকা? আমার আত্মার শান্তি তিনি কেন নষ্ট করতে চান? আমার নিয়তি-প্রেরিত দানব কি তিনি নন? কেন তিনি আমার আনন্দ বিষাক্ত করে দেন তাঁর হলাহলে! এ তো ঈর্ষা নয়, তাঁর হৃদয় তো এই পূত আনন্দের খবর রাখে না, না এ এক ক্ষতি করার বীভৎস কামনা—আমি তাঁর কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে থাকব। আমার প্রেমময় আত্মাকে তিনি হত্যা করবেন, নিজের ঘৃণা দিয়ে তাকে সংক্রামিত করবেন, তিনি তাকে বিষাক্ত করে দেবেন।

খুড়োর কাছ থেকে সে পালিয়ে রইল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাঁর সঙ্গে দেখা করল না। কখনো যদি বা দেখা হয়ে যায় তো আলাপ অনুভূতির পথ ধরে চলতে থাকে, আলেকজান্দার হয় চুপ করে থাকে, নয় এমনভাবে শোনে মনে হয় তার দৃঢ় বিশ্বাস শত যুক্তিতেও টলবে না। সে তার নিজের বিশ্বাসকে অভ্রান্ত বলেই মনে করে, নিজের মত আর অনুভূতি তার কাছে অপরিবর্তনীয়—সে ঠিক করেছে এখন থেকে তাদের নির্দেশেই শুধু চলবে। সে তো আর ছেলেমানুষ নয় আর অন্যের মতই শুধু পবিত্র হবে তারও কোন কারণ নেই।

কিন্তু খুড়োমশাই যেমনিই আছেন, তিনি ভাইপোকে কিছুই জিজ্ঞেস করেন না। হয়তো তিনি লক্ষ্য করছেন না, নয়তো তার ব্যবহারকে পরোয়া করেন না। আলেকজান্দার নিজের যুক্তি অনুসারেই আগের মত চলছে, তাঁর কাছে টাকাও চায় না। পিতর ইভানীচ তাই আগের মতোই স্নেহময় আছেন, তাঁর কাছে কালে-ভদ্রে আসে বলে হেসে হেসে ভর্ৎসনাও করেন।

বলেন, আমার স্ত্রী তো তোমার উপর চটে গেছেন। তিনি তোমাকে আত্মীয় বলে মনে করেন। আমরা রাতের ভোজ বাড়িতেই খাই—তুমি এসো!

শুধু মাত্র এই। কিন্তু আলেকজান্দার প্রায়ই যায় না, তার সময় নেই। সকাল কাটে অফিসে, বিকেল থেকে সন্ধ্যে লুবেৎকায়ায়! শুধু রাতটুকু বাকি থাকে। রাতে সে স্বরচিত পৃথিবীতে গিয়ে আশ্রয় নেয় আর সাহিত্য রচনা করে। আবার একটু ঘুমোতেও তো হবে।

গদ্য রচনায় সে তত সফল হয় নি। একটা মিলনান্ত নাটক, দুটি গল্প, একটি প্রবন্ধ আর একখানা ভ্রমণকাহিনী লিখেছে। তার কর্মশক্তি তারিফ করার মত, কলম কাগজের উপর কর্ষণ করে চলেছে ভালই। প্রথমে খুড়োমশাইকে নাটকখানা আর একটা গল্প দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সেগুলি ঠিক হয়েছে কি না। খুড়োমশাই এখানে সেখানে কয়েক পাতা উল্টে চোখ বুলিয়ে সেগুলি ফেরত দেন, উপরে মন্তব্য ছিল—পার্টিশনে লাগাবার কাগজ হিসেবে ব্যবহার করা চলবে।

আলেকজান্দার চটে গিয়েছিল, সে পাণ্ডুলিপিগুলি একটা পত্রিকায় পাঠিয়ে

দিল কিন্তু তারা দুটোই ফেরত পাঠাল। নাটকের মার্জিনে পেন্সিলে দু জায়গায় মন্তব্য ছিল—মন্দ নয়। শুধু এইটুকু। উপন্যাসের ধারে ধারে এমনি মন্তব্য প্রায়ই দেখা যায়—দুর্বল, মিথ্যে কথা, কাঁচা, পঙ্গু, অপরিণত ইত্যাদি, ইত্যাদি—আর সব শেষের কথা—সব জড়িয়ে দেখলে এতে মনুষ্য হৃদয়ের অজ্ঞতাই প্রকাশ পেয়েছে…অস্বাভাবিক, একঘেয়ে, কোন সত্যিকারের চরিত্র নেই, নায়ক অদ্ভুত, অমন লোক পৃথিবীতে নেই…ছাপার অযোগ্য। কিন্তু লেখকের একেবারে প্রতিভা নেই বলে মনে হয় না। তাঁকে লিখে যেতে হবে।

আলেকজান্দার দুঃখিত, আর বিস্মিত, অমন লোক নেই! কি করে তা হয়? কেন, নায়ক তো আমি স্বয়ং। প্রতিদিন, প্রতি পদে যে সব বাজে লোকের সঙ্গে দেখা হয়, আমাকে তাদের আবিষ্কার করতে হয় নি, জনতার মত ভাবতে বা অনুভব করতে হয় নি, সবাই যা করে তাও করতে হয় নি। বিয়োগান্ত আর মিলনান্ত নাটকের হতভাগ্য চরিত্রগুলির কোন কি বিশেষত্ব নেই—শিল্পকলা কি এতদূর নেমে যাবে?

সে তার শিল্পমতের পবিত্রতাকে বায়রণের আত্মা জাগিয়ে তুলে দৃঢ়ীভূত করতে চায়, গোটে আর শিলারের কথাও বলে। সে উপন্যাস বা নাটকের নায়করূপে করসেয়ার ছাড়া অন্য কাউকে কল্পনা করতে পারে না। করসেয়ার ছিলেন মহাকবি, একজন বিখ্যাত শিল্পী নিজে যা করেন, যা অনুভব করেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রও তাই করে।

সে তার একখানা উপন্যাসের ঘটনাস্থল করেছে আমেরিকায়। পটভূমি একেবারে অদ্ভুত—আমেরিকার দৃশ্য, পর্বতমালা আর তার ভিতরে একজন নির্বাসিত মানুষ তার প্রিয়াকে হরণ করে নিয়ে গেল। সমস্ত পৃথিবী তাদের ভুলে গেল। তারা তখন নিজেদের আর প্রকৃতিকে প্রশংসা করে দিন কাটায়। যেদিন তাদের নির্বাসন মকুবের খবর এল, তারা তখন স্বদেশে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু তারা যেতে চাইল না। বিশ বছর পরে একজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে শিকারে এসে পাহাড়ের উপর একটি কুটীর আর সেখানে একটি কংকাল দেখতে পেল। এই ইউরোপীয়টি ছিল নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী। উপন্যাস সম্পর্কে কি উঁচু ধারণাই ছিল আলেকজান্দারের। কি উৎসাহ নিয়েই না সে নাদিয়ার কাছে শীতের সন্ধ্যাগুলিতে তা পড়ে

শোনাত! আর কি বাস্তবেই না ছিল নাদিয়া! এমন একখানা উপন্যাস কি করে বাতিল হল?

নাদিয়াকে এই ব্যর্থতার কথা সে একেবারেই বলে নি। এই আঘাত সে নিঃশব্দে সহ্য করেছে আর বিস্মৃতির গর্ভে সঁপে দিতে চেয়েছে। নাদিয়া জানে—তোমার উপন্যাসের খবর কি? ওটা ছাপা হয়েছে? সে বলে, না, ওটা চলবে না। ওতে এমন বহু জিনিস আছে যা আমাদের দেশের মানুষদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়।

যদি সে জানত, সত্যি কথাই সে বলছে! যদিও তার কথার অন্য ব্যাখ্যা হতে পারে এ সম্পর্কে সে সচেতনই ছিল না।

কাজ করার কথাই তার কাছে এখন অদ্ভুত ঠেকে। সে ভাবে—প্রতিভা কিসের জন্য? যারা সাধারণ শ্রমিক তারা কাজ করে। প্রতিভা অনায়াসে আর স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করে। কিন্তু যখনি মনে হয়, তার কৃষি সম্পর্কে প্রবন্ধে এমন কি তার গল্পগুলিতেও প্রথমে বিশেষত্ব কিছু ছিল না, ধীরে ধীরে সেগুলির চর্চিত হয়েছে এবং মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তখনি সে ভাবতে বসে আর নিজের এই সিদ্ধান্তের ভুল বুঝতে পারে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তার রচনা স্থগিত রাখে। যখন তার হৃদয়ের স্পন্দনের প্রচণ্ডতা কমে যাবে, তার চিন্তাধারায় পারম্পর্য দেখা দেবে—সে শপথ করে তখনই সে আবার ঠিক ভাবে কাজ করবে।

দিনের পর দিন যায়, আলেকজান্দারের এ যেন বিরতিহীন আনন্দ। নাদিয়ার আঙুলের ডগায় যখন চুমু খায় তখন সে সুখী, তার পাশে ছবির মত দু ঘণ্টা ধরে বসে থাকে, মুখ থেকে চোখ ফেরায় না, আত্মা চঞ্চল হয়ে ওঠে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কালোপযোগী পদ্য বলে যায়।

সত্যি কথা বলতে গেলে নাদিয়াও মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাসে পদ্য শুনে হাই তুলে জবাব দেয়। ওটা তো আশ্চর্য নয়—তার হৃদয় ব্যাপৃত কিন্তু মন এখনও অলস। আলেকজান্দার তার মনের খাদ্য যোগাবার চেষ্টা করে না। নাদিয়া যে শিক্ষানবিশীর সময় দিয়েছিল, তাও অতিক্রান্ত। আবার সেই গ্রামের বাড়িতে মার সঙ্গে ফিরে এসেছে। আলেকজান্দার তাকে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার মার কাছে কথা বলার অনুমতি

চাইবে। নাদিয়া চায় শহরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সেটা মুলতুবি রাখবে, কিন্তু আলেকজান্দার পীড়াপীড়ি শুরু করলে।

একদিন বিদায়ের সময় সে আলেকজান্দারকে বললে, কাল সে তার মার সঙ্গে কথা বলতে পারে।

আলেকজান্দার সারা রাত ঘুমোল না, কাজেও গেল না। আগামী কালের ভাবনা তখন তার মাথায় পাক খাচ্ছে। সে ভাবছে—কি বলবে মারিয়া মিখাইলোভনাকে, সে বক্তব্য তৈরী করে নিলে। কিন্তু যখনি তার মনে পড়ল এটা নাদিয়ার পাণিপ্রার্থনার প্রস্তাব, সে স্বপ্নে বিভোর হয়ে সব ভুলে গেল। একেবারে প্রস্তুত না হয়েই সে সন্ধ্যাবেলা তাদের গ্রাম্য আবাসে গিয়ে পৌছল। নাদিয়া চিরাচরিত ভাবেই বাগানে তার সঙ্গে দেখা করল। তার চোখে ভাবনার ছায়া, মুখে হাসি নেই—কেমন যেন আনমনা।

সে বললে, আজ মার সঙ্গে কথা বলো না। ঐ হতভাগা কাউন্টটা এসেছে।

কাউন্ট? কোন কাউন্ট?

তুমি যেন কাউন্টকে জান না! কাউন্ট নোভিনস্কী, আমাদের পড়শী গো। ঐ তো ওখানে তার বাড়ি, ওর বাগানের তো কতবার প্রশংসা করেছ।

আলেকজান্দার অবাক হয়ে গেল—কাউন্ট নোভিনস্কী! এখানে? কেন?

জানি না, নাদিয়া উত্তর দিলে। তুমি যে বইখানা দিয়েছ সেখানা এখানে বসে পড়ছিলাম, মা গিয়েছিলেন মারিয়া ইভানোভনাদের ওখানে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, আমি বাড়ির ভিতরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একখানা গাড়ি এসে বারান্দায় থামল। নীল গাড়ি, সাদা কুশন দেওয়া, ঐ যে গো, যে গাড়িটা আমাদের পাশ দিয়ে যায়, তুমি যার তারিফও কর, মনে পড়ছে না? আমি তাকিয়ে আছি, এমন সময় মা কয়েকজন লোক নিয়ে সেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। ওরা ভিতরে গেলেন! মা বললেন, কাউন্ট, এই আমার মেয়ে। আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই। তিনি অভিবাদন করলেন, আমিও। আমি লজ্জায় লাল হয়ে নিজের ঘরে পালিয়ে গেলাম। মার স্বর শুনলাম—কিছু মনে করবেন না কাউন্ট ও একেবারে অসভ্য! তার পরে আঁচ করে নিলাম—এ আমাদের পড়শী কাউন্ট নোভিনস্কী। মারিয়া ইভানোভনার ওখান থেকে হয়ত মাকে বৃষ্টির জন্ম গাড়িতে নিয়ে এসেছেন।

উনি কি খুব বুড়ো? আলেকজান্দার জানতে চাইল।

বুড়ো? মোটেই না। তিনি সুন্দর আর সুশ্রী।

তাহলে তুমি আবিষ্কার করে ফেলেছ, তিনি সুশ্রী—আলেকজান্দার বিরক্ত হয়ে বলে উঠল।

সে আবার কি কথা। দেখতে আবার কতক্ষণ লাগে? এমন কি আমি ওর সঙ্গে কথাও বলেছি। ওঃ, তিনি ভারি ভদ্র। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করি—গান-বাজনার কথা বললেন, গান করতেও বললেন, কিন্তু আমি করি নি। আমি তো গাইতেই পারি না। এবার শীতে যাকে বলে ভাল একজন গানের মাষ্টার রাখতেই হবে। কাউন্ট বললেন, এখন গান-বাজনারই রেওয়াজ হয়েছে।

বেশ উৎসাহে সব বলে গেল নাদিয়া।

নাদেজদা আলেকজান্দ্রোভনা, আমি তো ভেবেছিলাম এই শীতে অন্য কিছু তোমাকে করতে হবে—আলেকজান্দার মন্তব্য করলে।

কি?

কি? আলেকজান্দার ভর্ৎসনা করে বললে।

ও সেই কথা! তুমি কি নৌকোয় এলে?

আলেকজান্দার নীরবে তাকিয়ে রইল তার দিকে। নাদিয়া মুখ ফিরিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

তেমন সহজভাবে আলেকজান্দার বসবার ঘরে ঢুকতে পারল না। কাউন্টটি কে? তার সামনে কেমন ব্যবহার সে করবে! কি হবে তার ব্যবহার! গর্বিত? না উপেক্ষা করবে! আলেকজান্দার ঢুকে পড়ল ঘরে। কাউন্ট অমনি উঠে পড়ে আনত হল ভদ্রভাবে। আলেকজান্দার কষ্ট করে কৌতুক অভিবাদন জানালে। গৃহকর্ত্রী আলাপ করিয়ে দিলেন। আলেকজান্দারের কাউন্টকে কেমন যেন ভাল লাগল না। যদিও সুশ্রী মানুষটি, লম্বা ছিপছিপে চেহারা, সুন্দর চুল, দুটি ভাবময় বড় বড় চোখ আর সুন্দর হাসি। তার ব্যবহারও সহজ আর মধুর, আবার বিশুদ্ধও বটে। তাঁকে দেখেই মনে হয়, যে তিনি ভালবাসা পাবার উপযুক্ত। কিন্তু আলেকজান্দারকে তিনি জয় করতে পারলেন না।

যদিও মারিয়া তাঁর কাছে তাকে বসতে বললেন, আলেকজান্দার ঘরের

এক কোণে গিয়ে বসে পড়ে একখানা বই তুলে নিলে। এটা নিতান্তই অভদ্র, বিশ্রী এবং খারাপ ব্যবহার।

নাদিয়া মার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কাউন্টকে আগ্রহভরে দেখছিল, তিনি কি বলছেন, কি ভাবে বলছেন শুনছিল। তিনি যেন তার কাছে নতুন জীব!

আলেকজান্দার যে কাউন্টকে পছন্দ করে না, সেটা সে লুকোতে পারলে না। কিন্তু কাউন্ট যেন তার এই অভদ্রতা লক্ষ্য করলেন না। তিনি অতি ভদ্রলোক। যখনি কথা বলেছিলেন, আলেকজান্দারের দিকে তাকিয়েই বলেছিলেন। আলাপটা সাধারণ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সবই বৃথা হল। আলেকজান্দার কিছুই জিজ্ঞেস করল না, শুধু হাঁ, হুঁ করে একাক্ষরিক উত্তর দিলে।

যখন মাদাম লুবেৎস্কায়া তার নাম বললেন, কাউন্ট জিজ্ঞেস করলেন সে পিওত্র ইভানোভিচের আত্মীয় কিনা।

তিনি আমার কাকা—সংক্ষেপে বলল আলেকজান্দার।

আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, কাউন্ট বললেন।

তা তো হবেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলে আলেকজান্দার।

কাউন্ট একটু ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপলেন। নাদিয়ার মার সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিলে।

আপনার খুড়ো মশাই বেশ পছন্দসই মানুষ, বেশ চতুর, কাউন্ট হালকা বিদ্রূপভরে মন্তব্য করলেন।

আলেকজান্দার নিরুত্তর।

নিজেকে সংযত করতে না পেরে নাদিয়া তার মার সঙ্গে কাউন্টের আলাপ আলোচনার সুযোগে আলেকজান্দারের কাছে গিয়ে কানে কানে বললে, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, কাউন্ট এমন ভদ্র ব্যবহার করছেন, আর তুমি!

ভদ্র ব্যবহার! আলেকজান্দার স্পষ্টই বলে ফেলল, আমার তো তাঁর ভদ্র ব্যবহারের দরকার নেই, ওকথা বোলো না।

নাদিয়া তাড়াতাড়ি তার কাছ থেকে সরে এসে একটু দূর থেকে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। চোখ তার বিস্ফারিত। আবার

মার চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল, আলেকজান্দারের দিকে আর নজরই দিলে না।

কিন্তু আলেকজান্দার কাউন্টের বিদায়ের অপেক্ষায় রইল, নাদিয়ার মার কাছে সে কথাটা আজ পাড়বেই। দশটা বাজল, এগারোটা, কাউন্ট বিদায় নেওয়া তো দূরের কথা বকেই চললেন।

পরিচয়ের শুরুতে যে সব বিষয় নিয়ে আলাপ হয়, সব ফুরিয়ে গেলে কাউন্ট এবার ঠাট্টা-তামাসা শুরু করে দিলেন। বেশ বলেন বটে, কই কল্পনার চিহ্নমাত্র নেই। বেশ রসিকতা আছে তাঁর কথায়। বিশেষ এক ধরণের শ্রোতাদের কাছে নতুন ঘটনা বলে আবার হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কথা বলে গুরু গম্ভীর জিনিসকে হাসির খোরাকে দাঁড় করায়।

তাঁর ঠাট্টা-তামাসায় মা আর মেয়ে একেবারে পুরোপুরি ডুবে গেছেন, আলেকজান্দারকেও নিজের অজান্তে বই আড়াল করে হাসি লুকোতে হয়েছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ফুলে উঠছে।

কাউন্ট সব কিছুই সমান দক্ষতায়, সমান নিপুণতায় আলোচনা করছেন সংগীত, মানুষ, বিদেশ—সবকিছু। এবার কথা পুরুষ আর নারীর দিকে মোড় ঘুরল। তিনি নিজেকে শুদ্ধ জড়িয়ে পুরুষদের সমালোচনা করতে লাগলেন—মেয়েদের প্রশংসা শুরু হল। বিশেষ করে গৃহকর্ত্রীকে তো কয়েকটা প্রশংসাসূচক বিশেষণেই সম্বোধিত করলেন।

আলেকজান্দারের সাহিত্য প্রচেষ্টা, নিজের কবিতার কথা মনে পড়ে গেল। সে আপন মনে বললে, এখানে আমি ওকে ছাড়িয়ে যেতে পারব। সাহিত্যের দিকে আলাপের মোড় ঘুরল। মা আর মেয়ে জানালেন আলেকজান্দার একজন লেখক।

আলেকজান্দার ভাবলে, এবার ও নরম হবে।

কিন্তু মোটেই তা নয়। কাউন্ট এমনভাবে সাহিত্যের কথা বললেন, যেন তিনি ওটি ছাড়া আর কিছুই করেন নি। তিনি রুশ আর ফরাসী শিল্পীদের সম্পর্কে কয়েকটি উটকো অথচ খাঁটি মন্তব্য করলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, তিনি বিখ্যাত রুশ লেখকদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্যারীতে থাকার সময় কয়েকজন ফরাসী লেখকের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়েছিল। কয়েকজনের কথা বেশ শ্রদ্ধা সহকারেই বললেন, আবার কয়েকজনকে একটু বিদ্রূপই

করলেন। তিনি জানালেন, আলেকজান্দারের কবিতা তিনি পড়েন নি, কখনো তার গানও শোনে নি।

নাদিয়া এমন অদ্ভুতভাবে আলেকজান্দারের দিকে তাকাল, যেন সে জিজ্ঞেস করছে, কি গো বন্ধু? তুমি বেশি দূরে যেতে পার নি—

আলেকজান্দার লজ্জিত। তার উদ্ধত, রুক্ষ অভিব্যক্তি এবার হতাশায় পর্যবসিত। সে যেন ছিন্ন ল্যাজওয়ালা মোরগ, একটা সামিয়ানার তলায় বৃষ্টি থেকে ঠাঁই নিতে চায়।

খাবার ঘর থেকে ভেসে আসছে গেলাস আর চামচের শব্দ, সেখানে টেবিল সাজানো হচ্ছে। কাউন্ট তবু বসে আছেন। সব আশা গেল যখন তিনি সহাস্যে মাদাম লুবেৎস্কায়ার খেয়ে যাবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

কাউন্ট মই খান, আলেকজান্দার তার দিকে বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিড়বিড় করে বললে। কাউন্ট বেশ দিব্যি নিয়েই খাচ্ছেন, হাসি-তামাসাও করছেন, যেন বেশ সহজ ভাবেই খাচ্ছেন।

আগে কখনো এ-বাড়ি মাড়ায় নি, আর এখন তিনজনের খাওয়া একমনে গিলছে, আলেকজান্দার নাদিয়ার কানে কানে বললে।

ওর খিদে পেয়েছে, সহজভাবেই উত্তর দিলে নাদিয়া।

অবশেষে কাউন্ট চলে গেলেন, কিন্তু গুরু-গম্ভীর কথার আর সময় নেই। আলেকজান্দার টুপি তুলে নিয়ে পালাল। নাদিয়া তার পিছু-পিছু গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলে।

তাহলে কাল? আলেকজান্দার বললে।

কালতো, আমরা বাড়ি থাকব না।

তাহলে পরশু।

ওরা বিদায় নিলে।

আলেকজান্দার নির্ধারিত দিনে যে সময় রোজ আসে, তার চেয়ে সকালেই এল। সে বাগানে ঢুকতেই বাড়ির ভিতর থেকে অপরিচিত শব্দ শুনতে পেল। কার স্বর? কাছে আসতেই পুরুষের স্বর বলে বুঝতে পারল— কি স্বর! সজীব স্বর, নারী হৃদয়ে সোজা গিয়ে প্রবেশ করবে এমনি স্বর। কিন্তু আলেকজান্দারের হৃদয়ে তো অন্য ভাবেই প্রবেশ করলে, শিলীভূত

হয়ে গেল হৃদয়, ব্যথিয়ে উঠল ঈর্ষায় ঘৃণায় আর আশ্চর্য তিক্ততার এক আশংকায়। আলেকজান্দার পেছন দিক দিয়ে এসে হলঘরে ঢুকে পড়ল।

কে আছেন? দারোয়ানকে শুধালে।

কাউন্ট নোভনস্কী।

অনেকক্ষণ আছেন নাকি?

ছটা থেকে আছেন।

মিস নাদেজদাকে চুপিচুপি গিয়ে বল, আমি এসেছিলাম, পরে আবার আসব।

যে আজ্ঞে।

আলেকজান্দার ফিরে চলল। সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কোথায় চলেছে, নিজেই লক্ষ্য করলে না। দু ঘন্টা পরে ফিরে এল।

এখনো আছেন? সে শুধালে।

হাঁ, কাউন্ট বোধহয় রাতের শেষ খাওয়া অবধি থাকবেন। ঠাকরুণ প্যাট্রিজের রোস্ট করতে হুকুম দিয়েছেন।

মিস নাদেজদাকে বলেছিলে, আমি এসেছিলাম?

হাঁ হুজুর!

শুনে কি বললে।

কিছুই বলেন নি।

আলেকজান্দার বাড়ি ফিরে গেল। দুদিন আর তার দেখা মিলল না। কে জানে এই সময়ে কি ছিল তার ভাবনা আর অনুভূতি। আবার সে এল। নৌকোর উপর দাঁড়িয়ে রোদ বাঁচাবার জন্ত হাত দিয়ে চোখ ঢেকে সে সমুখের দিকে তাকালে। নীল পোশাক গাছপালার আড়ালে উড়ে যাচ্ছে—নাদিয়াকে খুব মানায় এই পোশাকে। নীল রং এমন মানিয়ে যায়। যখন আলেকজান্দারের প্রশংসা সে পেতে চায়, এই পোশাকই সে পরে। বুক থেকে যেন ভার নেমে গেল।

সে আপন মনে বললে, শুধু এই ক্ষণিকের অনিচ্ছাকৃত অবহেলার জন্ত আমাকে সান্ত্বনা দিতে চায়। এ তো আমারই দোষ, তার তো নয়। আমার ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য। শুধু মানুষকে শত্রু করে তোলা। একজন

অপরিচিত নতুন আলাপী। বৃহকত্রীর পক্ষে এটা তো স্বাভাবিক—ঐ যে ঐ সরু পথটার পাশের ঝোপের আড়াল থেকে সে বেরিয়ে এল। রেলিংয়ের ধারে, ওখানে গিয়ে ও অপেক্ষা করবে।

ঐ যে চওড়া পথটায় এসে দাঁড়াল—কিন্তু ওর সঙ্গে কে? কাউন্ট! আলেকজান্দার রাগে চিৎকার করে উঠল, নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। কি? একজন পুরুষের সঙ্গে বাগানে একা! যেমন আমার সঙ্গে থাকত আলেকজান্দার বিড়বিড় করে বললে।

নাদিয়া আর কাউন্ট ফটকের কাছে এল, নদীর দিকে একবারও না তাকিয়ে গলিতে বেড়াতে লাগল। কাউন্ট ঝুঁকে পড়েছেন নাদিয়ার কাছে, মৃদু স্বরে কথা বলছেন। নাদিয়া মাথা নিচু করে তার পাশে পাশে বেড়াচ্ছে আলেকজান্দার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে নৌকায় দাঁড়িয়ে রইল, তার হাত তীরের দিকে বাড়ানো। তারপরে হাত নামিয়ে বসে পড়ল। মাঝিরা নৌকো বেয়ে চলল, আলেকজান্দার ভীষণ চিৎকার করে উঠল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ, ফের।

ওর দিকে তাকিয়ে একজন মাঝি অবাক হয়ে শুধালে, আমরা ফিরে যাব?

হাঁ বলছি যাও। তোমরা কালা নও নিশ্চয়ই—কালা নাকি?

ওখানে আমরা যাব না?

অন্য মাঝিটি নিঃশব্দে দ্রুততালে দাঁড় বাইতে লাগল। আলেকজান্দার দুঃখ চিন্তায় ডুবে গেল।

তার পরে এক পক্ষকাল সে আর লুবেৎস্কায়ায় যায় নি।

দু সপ্তাহ। প্রেমিকের পক্ষে কি দীর্ঘকাল! কিন্তু তবু সে অপেক্ষায় রইল তাঁরা নিশ্চয়ই কাউকে তার খবর নিতে পাঠাবেন। তার তো অসুখও হতে পারে। তাঁরা আগে তো তা করেছেন। যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ত, না বলে চলে আসত, নাদিয়া মার নাম করে খোঁজ নিত, তারপরে নিজের নামেই চালাত তদন্ত। মধুর ভৎর্সনা, স্নেহময় উদ্বেগ, অধৈর্যতা!

আমি এবার আর সহজে গলে যাব না, আলেকজান্দার আপন মনে বললে। ওকে একটু জ্বালাব। অপরিচিতের সঙ্গে কি করে ব্যবহার করতে হয় শিখিয়ে দেব। পুনর্মিলন অতো সোজা হবে না।

প্রতিশোধের এক নির্মম পরিকল্পনা সে ছকে ফেলল। নাদিয়ার অনুতাপ আর নিজের মহান ক্ষমাশীলতার স্বপ্ন দেখতে লাগল, ভাবল কি তিরস্কারই না সে করবে। কিন্তু কেউ তার কাছে এল না, কেউ নিয়ে এল না ক্ষমা করার জন্য আবেদন। ওঁদের কাছে তার যেন অস্তিত্বই আর নেই।

সে বিবর্ণ কৃশ হয়ে গেল। ঈর্ষা সবচেয়ে পীড়াদায়ক রোগ, বিশেষ করে যখন তা অমূলক সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত! যখন প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন ঈর্ষার শেষ হয় আর ভালবাসারও তখন অনেকখানি নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন প্রেমিক অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারে তার কি করা উচিত, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তো শুধু জ্বালা। আলেকজান্দার পূর্ণভাবে সে জ্বালা ভোগ করল।

অবশেষে সে ঠিক করল, সকাল বেলার দিকে সেখানে যাবে। নাদিয়াকে তখন একা পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে সে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলবে।

সে গিয়ে হাজির হল। বাগানে কেউ নেই, হলে বা বসবার ঘরেও কেউ নেই। সে হলঘরে গিয়ে পেছনের দরজা খুলে ফেললে…

কি দৃশ্য দেখল উঠোনে! কাউন্টের তকমা আঁটা দুজন সহিস সাজ-পরানো ঘোড়া দুটোকে ধরে আছে। একটায় একটি পরিচারক নাদিয়াকে উঠতে সাহায্য করছে, আর একটি স্বয়ং কাউন্টের জন্য প্রস্তুত। বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন মারিয়া। তিনি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে দৃশ্যটা দেখছেন, তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত।

নাদিয়া, বেশ শক্ত হয়ে বোস, তিনি বললেন, দোহাই ঈশ্বরের, কাউন্ট ওকে দেখবেন! আমার বড় ভয় করছে। ঘোড়ার কানটা চেপে ধর নাদিয়া, দেখ কি পাজি, লাটিমের মত ঘুরপাক খাচ্ছে।

মা, সব ঠিক আছে, নাদিয়া আনন্দে উচ্ছল হয়ে বললে, আমি ঘোড়ায় চড়তে জানি, দেখ।

সে চাবুক মারলে ঘোড়াকে, আর ঘোড়া অমনি সামনে ঝুঁকে পড়ল।

আরে, আরে! টেনে ফেরাও! মারিয়া হতাশ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, থামো, থামো, তোমাকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু নাদিয়া লাগাম ধরে ঝাঁকুনি দিতেই ঘোড়া স্তব্ধ হয়ে গেল।

দেখ, কেমন আমার বাধ্য, নাদিয়া ঘোড়ার গলা চাপড়ে বললে।

আলেকজান্দারের দিকে কারো লক্ষ্য নেই। বিবর্ণ, স্তব্ধ হয়ে সে নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। নাদিয়া যেন তাকে বিদ্রূপ করতেই এত সুন্দর হয়ে উঠেছে। ঐ ঘোড়ায়-চড়ার পোশাক, ঐ টুপি আর সবুজ ওড়নায় তাকে কেমন মানিয়েছে! তার মুখ সলজ্জ গর্ব আর নূতনত্বের আনন্দে ভরা। লজ্জার রক্তিমতা গালে দেখা দিচ্ছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে, এত সুখী সে! ঘোড়াটা একটা ছোট্ট লাফ দিলে, এই তন্বী সওয়ারকে সে লীলাভরে ঝুয়ে পড়তে বাধ্য করলে, আবার সে পিছনে হেলে পড়ল। ফুলের ডাঁটা যেমন হাওয়ায় দোলে, তেমনি দুলছে তার দেহ। এবার সহিস কাউন্টের ঘোড়াটা নিয়ে এল।

কাউন্ট, আবার কি আমরা গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটব? নাদিয়া শুধালে।

আবার! আলেকজান্দার ভাবলে।

ভারি চমৎকার হবে, কাউন্ট উত্তর দিলে।

ঘোড়া দুটি ছুটল।

আলেকজান্দার হঠাৎ উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল—নাদেজদা আলেকজান্দ্রোভ্না!

সবাই স্তব্ধ, যেন প্রস্তরীভূত হয়ে গেছে, বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে আলেকজান্দারের দিকে। প্রায় এক মিনিট রইল এই বিস্ময়।

মারিয়াই প্রথম উপস্থিতবুদ্ধি ফিরে পেলেন, তিনি বললেন, আরে আলেকজান্দার ফিওদরীচ যে! কাউন্ট ভদ্রভাবে অভিবাদন জানালেন। নাদিয়া মুখের ওড়না ফেলে তার দিকে ভীত দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল। তার ছোট্ট মুখখানি আধ-খোলা—তারপরে সে তাড়াতাড়ি ফিরে ঘোড়ায় চাবুক লাগাতেই ঘোড়াটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কয়েক লাফে ফটক পেরিয়ে মিলিয়ে গেল। কাউন্ট তাকে অনুসরণ করলেন।

দোহাই ঈশ্বরের, অতো জোরে নয়! মা পিছনে চেঁচাচ্ছেন। কানটা চেপে ধর! হা ঈশ্বর! হা প্রভু! ঠিক পড়বে—জানি পড়ে যাবে! কি হল ওর?

সব শেষ, শুধু খুরের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না, পথ থেকে উঠে আসা ধুলার স্তম্ভ ছাড়া আর কিছু দেখাও যাচ্ছে না। আলেকজান্দার মাদাম লুবেৎস্কায়ার কাছে একা আছে। সে নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকাল,

যেন জিজ্ঞেস করছে, এ সবের মানে কি? তিনি উত্তর দিতে দেরি করলেন না।

বললেন, ওরা চলে গেল, কোন চিহ্নও নেই। তা যৌবনের ধর্মই তো এই, এবার তুমি আর আমি আলাপ করতে পারি আলেকজান্দার ফিওদরীচ। এই হপ্তাহ তোমার দেখা নেই কেন? আমাদের কি আর তোমার ভাল লাগে না?

আমার অসুখ করেছিল, বিষন্ন স্বরে উত্তর দিল সে।

সেজন্যেই মনে হচ্ছে, তুমি এমন ফ্যাকাশে আর রোগা হয়ে গেছ। বোসো, বসে একটু জিরিয়ে নাও, নরম করে ডিম সেদ্ধ করে আনতে বলব? এখনো ডিনারের ঢের দেরী!

ধন্যবাদ, আমার কিছুই চাই না।

কেন নয়? এক মিনিটে হয়ে যাবে, ভারি চমৎকার ডিম। এইতো আজ একটি ফিনল্যাণ্ডের চাষী নিয়ে এসেছিল।

না, থাক!

কি হল তোমার। আমি তো বসে বসে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি এর মানে কি? তুমি আসছ না, ফরাসী নভেল এনেও দিচ্ছ না, মনে নেই পিউ ভ সাহেব না অমনি একখানা বই এনে দেবে বলেছিলে? আমি তো বসে বসে সারা, কিন্তু না, আলেকজান্দার ফিওদরীচ আমাদের আর ভালবাসে না, শেষে নিজেই ভাবলাম—সত্যিই বাসে না।

নাম্বিয়া মিখাইলোভনা, আমার ভয় হচ্ছে আপনিই আর আমাকে ভালবাসেন না।

আলেকজান্দার ফিওদরীচ, ওকথা বলাও পাপ, আমার নিজের ছেলের মতো তোমাকে ভালবাসি। আমি নাম্বিয়ার কথা জানি না। ও এখনো ছেলেমানুষ, কি বা বোঝে? লোকের গুণের ও কি করেই বা তারিফ করবে? ওকে রোজ বলি, আলেকজান্দার ফিওদরীচকে আর দেখছি নে কেন, সে আসছে না কেন? আর তুমি আসবে আশা করি। বিশ্বাস কর আর না কর, আমি পাঁচটার আগে কখনো ডিনারে বসি নি, খালি ভেবেছি, তুমি যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। নাম্বিয়া মাঝে মাঝে বলেছে—কার জন্যে বসে আছ মা? আমার খিদে পেয়েছে, মনে হয় কাউন্টেরও পেয়েছে।

কাউন্ট কি এখানে ঘন ঘন আসেন? আলেকজান্দার শুধালে।

প্রায় রোজই কখনো বা দুবারও। এমন ভাল ছেলে, আমাদের এত ভালবাসে। নাদিয়া বলে, আমার খিদে পেয়েছে, এখন খেতে বসার সময়। কিন্তু যদি আলেকজান্দার আসে, ও তখন বলে, সে আসবে না, আমি বাজি রাখতে পারি, বসে থাকা বৃথা। মাদাম দুবেৎস্কায়ার কথা যেন ছুরির মতো আলেকজান্দারের বুকে বিঁধল।

ও এই বলে নাকি, কাষ্ঠ হাসি হেসে আলেকজান্দার জিজ্ঞেস করলে।

হুঁ, অবিকল ঐ কথা—আমাকে অমনি করেই তাড়া দেয়। ভালমানুষ দেখলে কি হবে, আমি ভারি কড়া। ওকে বকেছি, অনেক সময় তো পাঁচটা অবধি ডিনার না খেয়ে ওর জন্যে বসে থাক, আবার অনেক সময় একেবারেই বসে থাকতে চাও না! দুষ্টু মেয়ে! ওটা ভাল নয়। আলেক-জান্দার ফিওদরীচ আমাদের পুরনো বন্ধু, সে আমাদের ভালবাসে। তার কাকা পিতর ইভানীচ আমাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করে থাকেন। তাকে অবহেলা করা তো উচিত নয়। সে হয়ত চটে গিয়ে আর আমাদের এখানে আসবেই না।

ও কি বললে?—আলেকজান্দার জিজ্ঞেস করলে।

কিছু না। জান তো কি চঞ্চল মেয়ে—লাফায়-ঝাঁপায়, গান গায়, আমার কাছে ছুটে এসে বলে, যদি আসতে চায় তো আসবে। কি পাগলের মত কথা! আমি ভাবলাম, ঠিক আসবে। আরও একদিন কাটল, তুমি এলে না। আবার বললাম, আলেকজান্দার ভাল আছে তো নাদিয়া? সে বললে, জানি নে তো মা, আমি কি করে জানব! কাউকে পাঠিয়ে খোঁজ নেওয়া যাক, কেমন আছে, আমরা লোক পাঠাবার কথাই বলাবলি করেছি, কিন্তু পাঠাই নি, ভুলে গেছি। ওর উপরে ভরসা করেছিলাম। তার চেয়ে হাওয়ার উপরে ভরসা করা ভাল! এখন তো ঘোড়ায় চড়ার বাতিক হয়েছে। একদিন জানালা দিয়ে কাউন্টকে ঘোড়ার পিঠে দেখেছিল, সেই থেকে খালি আমাকে বলছে—আমি ঘোড়ায় চড়ব। অনেক থামাবার চেষ্টা করেছি, তবু বলে—আমি চড়তে চাই! পাগলী। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন তো ঘোড়ায় চড়ি নি। আমরা ওভাবে মানুষ হই নি। কিন্তু আজকাল—উঃ কি যে কাণ্ড! মহিলারা সত্যিই ধূমপান করতে শুরু করেছেন! ঐ

তো ওখানে একটি অল্পবয়েসী বিধবা থাকে সে তো সারাদিনই জানালায় বসে বসে সিগ্রেট খায়। লোক পাশ দিয়ে হেঁটে যায়, গাড়ি করে যায়, সে একটু গ্রাহ্যও করে না। আর আমার ছেলেবেলায় কোন ভদ্রলোক যদি বসবার ঘরে তামাকের একটু গন্ধও পেতেন—

বহুদিন ধরে কি এসব চলছে? আলেকজান্দার জিজ্ঞেস করলে।

জানি না। লোকে বলে পাঁচ-ছ' বছর হল এটা ফ্যাশান হয়েছে, সব ফরাসী দেশ থেকে এসেছে।

না, আমি বলছি নাকেবল। আলেকজান্দ্রোভনা কি অনেকদিন ধরে ঘোড়ায় চড়ছে?

এই তো প্রায় দিন দশেক হল। কাউন্ট এমন ভাল, এত বাধ্য। তিনি আমাদের জন্য কি না করতে চান! ওকে তো মাটি করে দিচ্ছেন। ঐ ফুলগুলো দেখ—ওগুলো সব তাঁর বাগানের। মাঝে মাঝে লজ্জাই হয়। বলি কাউন্ট, আপনি ওকে আদর দিয়ে এমন মাটি করছেন কেন? ওকে আর শীগগির থামানো যাবে না। আমি আর মারিয়া ইভানোভ্‌না ওকে তিরস্কার করেছি। ওর উপরে সব সময়েই আমার নজর আছে। দাস-ই হোক মার মতো তো আর কেউ মেয়ের খবরদারী করতে পারবে না। আমি ওকে মানুষ করেছি আর একথা গর্ব না করেই বলতে পারি—অমন মেয়ে খুব বেশি নেই। নাদিয়া আমাদের সামনে ঘোড়ায় চড়া শিখেছে। কাউন্টের বাগানে গিয়ে আমরা লাঞ্চও খেয়েছি। এখন ওরা রোজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়ায়। কি সুন্দর বাড়িখানি কাউন্টের! আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি—কি রুচি, কি বিলাসিতা!

রোজই!—আলেকজান্দার অর্ধগত উক্তি করে দমল।

কেন বেড়াবে না? আমিও তো এক সময়ে ছোট ছিলাম···আমার মাঝে মাঝে···

অনেকক্ষণ বুঝি ওরা বাইরে থাকে?

ঘণ্টা তিনেকের মত হবে। বল তো, তোমার কি হয়েছে?

জানি না! বুকে একটা ব্যথা আছে, বুকে হাত চেপে বললে।

কোন চিকিৎসা করছ না?

না।

তোমরা ছেলেরা কি রকম! সবকিছুতেই বল, কিছু না, কিন্তু দিন তো আসছে—হঠাৎ তখন বুঝবে—সময় কি করে যায়। ওটা কি কুরে-খাওয়া ব্যথা না খোঁচানো ব্যথা?

কুরে খায়, খোঁচাও মারে। আলেকজান্দার আনমনে বললে।

ঠাণ্ডা লেগেছে। দোহাই ঈশ্বরের, অবহেলা কোরো না অসুখে পড়বে। নিউমোনিয়াও হতে পারে। ওষুধ খাও নি? আমি বলতে পারি কি করবে—অপোডেলডক দিয়ে রোজ রাত্রে যতক্ষণ না চামড়া লাল হয়ে যায় ততক্ষণ মালিশ করবে এবং চা খাবে না। শাক-সবজী সেদ্ধ খাবে। আমি একটা ওষুধ বলে দিচ্ছি।

নাদিয়া ক্লান্তিতে বিবর্ণ হয়ে ফিরে এল। সে সোফায় এলিয়ে পড়ল, নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ।

ওর দিকে চেয়ে দেখ, মারিয়া মেয়ের কপালে হাত রেখে বললেন, এমন ক্লান্ত, নিঃশ্বাস নিতেই পারছে না। জল খাও আর কর্সেটটা ঢিলে করে দাও। ঘোড়ায় চড়ে কোন লাভই নেই।

আলেকজান্দার আর কাউন্ট সারাদিন রইলেন। কাউন্ট তেমনি অভ্রান্তভাবেই ভদ্রতা করলেন, আলেকজান্দারের প্রতি বেশ মনোযোগী হলেন, তাকে নিজের বাগান দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন, চড়ার জন্য ঘোড়াও দিতে চাইলেন।

আমি তো চড়তে জানি না, আলেকজান্দার নিরাসক্ত স্বরে উত্তর দিলে।

তুমি পার না? নাদিয়া শুধালে, ও: কি মজা! আমরা কাল আবার বেরুব, তাই না কাউন্ট?

কাউন্ট মাথা নোয়ালেন।

মা বললেন, থাক হয়েছে! কাউন্টকে তুমি ব্যতিব্যস্ত করে তুলছ।

কাউন্ট আর নাদিয়ার ভিতর যে কোনো বিশেষ সম্পর্কের অস্তিত্ব আছে তা কিছুতেই বোঝা যায় না। মা আর মেয়ে দুজনের প্রতিই তাঁর সমান ভদ্র ব্যবহার, নাদিয়ার সঙ্গে একা থাকবার কোনো সুযোগ নেন না, তার পিছু পিছু বাগানে আসেন না। মার দিকে যেমন করে তাকান, তেমনি করেই তাকান নাদিয়ার দিকে। নাদিয়াও তাঁর সঙ্গে সহজ-স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করে। রোজ যে অশ্বারোহণ করে, সেগুলিকে তার দিক থেকে দেখলে,

অস্থির চিত্তের লক্ষণ বলেই ধরা যায়, হয়তো বা সারল্যের একটু বাড়াবাড়ি, শিক্ষার অভাব বা সমাজের রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাও বলা যায়। আর তার বাবার কথা যদি ধরা যায়, এ হয়তো তাঁর দুর্বলতা আর দূরদৃষ্টির অভাব। কাউন্টের শিষ্টাচার আর আনুগত্য, তাঁর প্রাত্যহিক আসা-যাওয়া আর লুবেৎস্কীকে সাদর অভ্যর্থনার কারণ দুই ব্যক্তির নৈকট্য বলেও মনে করা যায়।

সাদা চোখে ব্যাপারটা বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হবে। কিন্তু আলেকজান্দার আতস কাচ দিয়ে দেখলে—সাদা চোখে যা দেখা যায় না, তার চেয়ে বেশিই সে দেখে নিলে।

সে আপন মনে ভাবলে, কেন তার প্রতি নাদিয়ার ব্যবহারের এমন পরিবর্তন হল? আর তো তার জন্যে বাগানে প্রতীক্ষায় থাকে না নাদিয়া—দেখা হলে হাসির বদলে ভ্রূকুটি পায়, আর ইদানীং যেন পোশাক সম্পর্কে একটু বেশি সচেতন হয়েছে। ব্যবহারে পরিচিতির লেশমাত্র নেই। সে এখন যা কিছু করে, সে সম্পর্কে খুব সতর্ক—মনে হয় যেন আগেকার চেয়ে বিজ্ঞ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই তার চোখে আর কথায় আড়ালে এমন কিছু থাকে, যা মনে হয় গোপনীয়। কোথায় সেই মধুর খেয়ালীপনা, সেই চপলতা, সেই ঠাট্টা-তামাসা, সেই ছেলেমানুষী? সব উবে গেছে, সে এখন গম্ভীর, ভাবময়ী, নীরব। তার মনে কি যে লুকিয়ে রয়েছে! এখন সে আর-আর মেয়েদের মতই ছলনাময়ী। তেমনি মিছে কথা বলে. শরীর সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে—তার প্রতি ভদ্র ব্যবহারই করে, আর কার প্রতি? হা ঈশ্বর!

সে বুকে ব্যথা পেলে।

এদুয়েরই কিছু মানে আছে, সে আপন মনে বললে, চোখে যা দেখা যায়, তার চেয়েও অনেক বেশি। এর মানে কি আমি যেভাবেই হোক খুঁজে বার করব. তারপরে তো অভিশাপ দেব—

ঐ দুই প্রলোভনকারীকে
আর ঐ নারকীয় ছলাকলায়
দেব না এক সরল তরুণী-হৃদয়কে
বিষাক্ত করে দিতে,

ঐ দুর্নায়ক যে তার বিষময় ক্ষমতা জাহির করে
চেষ্টা করবে এক অর্ধস্ফুট পুষ্পকে দংশন করে
দিতে—তার লাবণ্য চিরতরে বিনষ্ট করে দেবে—
তা হতে দেব না।

আর সেইদিনই কাউন্ট চলে যেতেই আলেকজান্দার নাদিয়ার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার অছিলা খুঁজতে লাগল। কি না সে করল? যে বইখানির সাহায্যে আগে নাদিয়া মার কাছ থেকে তাকে নিয়ে এসেছিল, সেখানি সে তুলে নিলে, তাকে দেখাবার জন্য সেখানি তুলে ধরল, তারপর চলে গেল নদীর ধারে—ভাবলে, ও পেছনে ছুটতে ছুটতে আসবে, কিন্তু সে শুধু প্রতীক্ষায়ই রইল, নাদিয়া এল না। সে আবার বাড়ির ভিতরে ফিরে গেল। নাদিয়া বসে বই পড়ছে, ফিরেও তাকালে না। সে এসে বসল তার পাশে। নাদিয়া চোখ তুললে না, শুধু সহজ স্বরে জিজ্ঞেস করলে, সে কিছু লিখছে কিনা, নতুন কিছু বেরিয়েছে কিনা। অতীতের একটা কথাও নয়!

আলেকজান্দার মার সঙ্গে আলাপ করতে লাগল। নাদিয়া চলে গেল বাগানে। মা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে আলেকজান্দারও ছুটে এল বাগানে। তাকে দেখে নাদিয়া বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ল, বাগানের চারদিকে ঘেরা পথ দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। যেন এড়িয়ে চলতে চায়। আলেকজান্দার পা চালাতেই সেও পা চালালে।

নাদেজদা, দূর থেকে ডাকলে, তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।

বাড়ির ভিতরে এস, এখানে ঠাণ্ডা, সে বললে।

ফিরে এসে মার পাশেই আবার বসে পড়ল। আলেকজান্দারের মনে হল, সে মূর্ছা যাবে।

কবে থেকে ঠাণ্ডায় ভয় পাচ্ছ? সে ঈর্ষান্বিত হয়ে বললে।

সন্ধ্যেগুলো আজকাল এমন আঁধার আর ঠাণ্ডা, সে হাই তুলে বললে।

মা বললেন, আমরা শীগগিরই শহরে ফিরে যাচ্ছি, আলেকজান্দার, তুমি কি অনুগ্রহ করে আমাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে বাড়িওলাকে দরজার তালা দুটো আর নাদিয়ার শোবার ঘরের শার্সিখানা মেরামত করে দেবার কথা বলবে? সে তো বলেছিল করে দেবে, কিন্তু নিশ্চয়ই ভুলে গেছে, ওরা সবাই সমান—টাকার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না।

আলেকজান্দার বিদায় নেবার জন্ত উঠে দাঁড়াল।

মনে রেখ, এবার যেন অতো দেরী কোরো না, মারিয়া বললেন।

নাদিয়া কিছু বললে না।

দরজার কাছে এসে সে ফিরে তাকাল, নাদিয়া কয়েক পা তার দিকে এগিয়ে গেল। নেচে উঠল হৃদয়।

অবশেষে—সে ভাবলে।

কাল আসছ? নিরুত্তাপ তার স্বর, কিন্তু তার উপর চোখ ও কৌতূহলে নিবদ্ধ।

জানি না। কেন বলতো?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম, আসছ তো?

তুমি কি তাই চাও?

কাল আসছ কিনা বল? তেমনি নিরুত্তাপ স্বর, কিন্তু অসহিষ্ণুতায় আরো বেশি আবেগ।

সে রাগ করে উত্তর দিলে, না।

পরশু?

না, এক হপ্তা কি দু'হপ্তা···হয়তো বহুদিন আসা হবে না। সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তার উত্তরের প্রত্যুত্তর সে তার চোখে পড়তে চেষ্টা করলে শুধু।

নাদিয়া কিছু বললে না, তার উত্তর শুনে চোখ নামিয়ে নিলে। কি ছিল সেই চোখে—দুঃখে কি নিষ্প্রভ ছিল চোখ দুটি, না এক ঝলক আনন্দ তাকে মুহূর্তের জন্ম আলোকিত করে দিয়েছিল? কিন্তু ঐ সুন্দর মর্মর মুখে তো কিছু পড়াই সম্ভব নয়।

আলেকজান্দার টুপিটা হাতে চেপে ধরে বেরিয়ে গেল।

মারিয়া পিছনে ডেকে বললেন, অপোডেলডক দিয়ে বুকে মালিশ করতে ভুলো না।

আবার আলেকজান্দার সমস্যার সম্মুখীন, নাদিয়ার প্রশ্নের অর্থ আবিষ্কারেরই এই সমস্যা! কি ছিল এর আড়ালে—ওকে দেখার আকাঙ্ক্ষা না ভীতি? এ যন্ত্রণা! যন্ত্রণা! আলেকজান্দার হতাশাভরে আর্তনাদ করে উঠল।

সে আর পারলে না। তিন দিন পরে আবার গেল। নৌকো যখন

এগিয়ে আসছিল, নাদিয়া ঝটকে দাঁড়িয়ে ছিল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল সে, কিন্তু তীরের কাছে আসতেই নাদিয়া মুখ ফিরিয়ে তাকে না দেখার ভাণ করলে। যেন বেড়াতে বেরিয়েছে, এমনি ভাব দেখিয়ে সে কয়েক পা এগোল, তারপর বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

আলেকজান্দার তাকে দেখলে মার কাছে, শহর থেকে সামান্য কয়েকজন অতিথি এসেছেন, পড়শী মারিয়া ইভানোভনা আছেন, আর আছেন অবজ্ঞাবী কাউন্ট। আলেকজান্দারের দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল, অতিথিদের সম্বন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। যত বাজে জিনিস নিয়ে শান্ত হয়ে গল্প করে, তর্ক ঠাট্টা-তামাসা আর অবিরাম হাসি তো আছেই!

নাদিয়া যখন আমার কাছে বদলে গেছে তখন ওরা হাসতে পারে। ওদের তো কিছুই নয়। খুঁতখুঁতে হতভাগা আত্মার দল সব কিছুতেই ওদের আমোদ।

নাদিয়া বাগানে চলে গেল, কাউন্ট তার পেছু ছুটলেন না। পরে কদিন হল তিনি আর নাদিয়া পরস্পরকে এড়িয়ে চলছেন আলেকজান্দারের সমুখে। সে কখনো কখনো তাদের বাগানে, কি ঘরে একা দেখতে পায়, কিন্তু তারা তখনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে থাকা অবধি আর দুজনের মিলন হয় না। এ যেন আলেকজান্দারের কাছে এক নতুন আর ভয়ানক আবিষ্কার—ওরা যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারই চিহ্ন।

অতিথিরা চলে গেলেন। কাউন্টও গেলেন, নাদিয়া বাগানে ছিল, টের পায় নি তাই বাড়িতে তাড়াতাড়ি ছুটে আসে নি। আলেকজান্দার না বলে মারিয়ার কাছ থেকে বাগানে চলে এল। রেলিঙ ধরে তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল নাদিয়া, তার মাথাটা হেলানো—সেই অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার মতো, সে তাকে দেখতে পেলে না, তার এগিয়ে আসার শব্দও শুনতে পেলে না।

সে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। বুকে কি স্পন্দন উঠছে! নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল।

· নাদেঙ্কা, সে বললে। তার স্বর উত্তেজনায় অস্পষ্ট।

যেন তার কাছে কে পিস্তল ছুঁড়লো, এমনি চমকে উঠল নাদিয়া, কয়েক পা পিছিয়েও গেল। সে অপ্রতিভ হয়ে নদীর অপর পাড়ের দিকে তাড়াতাড়ি

দেখিয়ে দিয়ে বললে, দেখ, কি ধোঁয়া? ওখানে কি আগুন লেগেছে, না কারখানার চুল্লী।

আলেকজান্দার তার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

আমি তো ভেবেছিলাম আগুন লেগেছে, সত্যিই তাই। তুমি এমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন, আমার কথায় বুঝি বিশ্বাস হল না?

নাদিয়া থামল।

তুমিও, সে শুরু করলে, ঠিক আর সবার মতোই! ছমাস আগে কে একথা ভাবতে পারত?

তার মানে? তোমার কথা বুঝতে পারছি না, সে বলে উঠল।

দাঁড়াও নাদেজদা, আমি এ জ্বালা আর সইতে পারছি না।

কি জ্বালা? আমি তো সত্যিই জানি না।

দেখ ভাণ কোরো না, বল তো তুমি কি সেই? যেমনটি ছিলে তেমনি কি এখনো আছ?

তেমনিই আছি, সে মৃদুস্বরে বললে।

কি? আমার কাছে তুমি বদলে যাও নি?

না। তোমার সঙ্গে আগে যেমন মিষ্ট ব্যবহার করতাম, তেমনিই করছি। তোমাকে দেখলে আমি খুশীই হই।

তেমনি খুশী হও! তাহলে বেড়ার উপর থেকে পালিয়ে এলে কেন?

আমি পালিয়ে এলাম! এর পরে কি বলবে? আমি রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আর তুমি বলছ পালিয়ে এসেছি?

সে কাষ্ঠ হাসি হাসলে।

নাদেজদা, এই ছলনা থামাও তো, আলেকজান্দার বললে।

ছলনা? তুমি আমাকে এমন জ্বালাচ্ছ কেন?

একি সেই তুমি! হা ঈশ্বর! ছ সপ্তাহ আগে—ঠিক এইখানে—

ওখানে ধোঁয়া উঠছে কেন, আমি জানতে চেয়েছি।

কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! আলেকজান্দার বলে উঠল।

আচ্ছা বলতো আমি তোমার কি করেছি? তুমি আমাদের এখানে আর

আস না, সে তোমার ব্যাপার, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তো তোমাকে আটকে রাখতে চায় না, নাদিয়া বললে।

সব সময়েই ভাণ করছ! আমি কেন আসি না, তুমি যেন জান না!

অন্যদিকে তাকিয়ে নাদিয়া মাথা নাড়লে।

আর এই কাউন্ট? সে এমন স্বরে বললে, যেন ভয় দেখাচ্ছে!

কোন কাউন্ট? মুখ ভঙ্গী করলে নাদিয়া—এমন ভাব দেখালে যেন কাউন্টের নামই শোনে নি।

আচ্ছা—তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে সে বললে—তুমি কি বলবে, ওর প্রতি তুমি উদাসীন?

তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছ, সে ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে বলল।

তুমি খুব একটা ভুল কর নি, সে বলে চলল, আমার বিচার-বুদ্ধি দিন দিন কমে আসছে। যে তোমাকে সমস্ত পৃথিবীর চেয়েও বেশী ভালবেসেছিল, যে তোমার জন্যে সব ভুলে গিয়েছিল, তুমি কি করে তার সঙ্গে এমন অকৃতজ্ঞের মত ব্যবহার করলে...সে তো জীবনে সুখী হবার আশা করেছিল —আর তুমি···

আমার সম্পর্কে কি?—সে তার কাচ থেকে আরো দূরে সরে গেল।

তোমার সম্পর্কে? তুমি কি ভুলে গেছ? আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি—এইখানে—ঠিক এই জায়গায়, তুমি সহস্র শপথ করে বলেছিলে তুমি আমার, ঈশ্বর এই শপথ শুনেছেন। হাঁ, তিনি শুনেছিলেন বৈকি। এই আকাশ, এই গাছপালা, প্রতিটি ঘাসের সুমুখে তোমাকে লজ্জিত হতে হবে। সবাই তো সেদিন আমাদের সেই সুখের সাক্ষী ছিল। এখানকার প্রতিটি বালুকণা আমাদের প্রেমের সাক্ষ্য দিচ্ছে। দেখ—চারিদিকে তাকিয়ে দেখ। তুমি মিথ্যাশপথকারী।

সে ভীত হয়ে তাকালে। আলেকজান্দারের চোখ জলজল করছে, ঠোঁট দুটি ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

তুমি কি নিষ্ঠুর, নাদিয়া ভীরু স্বরে বললে। কেন তুমি রাগ করছ? আমি তো তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি নি, তুমি তো এখনো মা'র সঙ্গে কথা বল নি...কি করে জানলে?

তুমি যা করেছ তার পরে কি আর কথা বলা যায়?

কি করেছি? জানি না তো।

আমাকে বলতে দাও। এই যে কাউন্টের সঙ্গে মাখামাখি, ঘোড়ায় চড়া—এসবের মানে কি?

মা যখন ঘরের বাইরে থাকেন, তখন কি ওঁর কাছ থেকে পালিয়ে যাব? আর ঘোড়ায় চড়ার মানে—আমি ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসি—কি মজাই যে লাগে। যখন লাফিয়ে চলে, উঃ কি যে ভাল ঘোড়া লুসি। দেখেছ ওকে? এরই মধ্যে আমাকে সে চিনে ফেলেছে।

আর আমার প্রতি তোমার ব্যবহারের পরিবর্তন? কেন কাউন্ট সকাল থেকে রাত অবধি তোমাদের বাড়িতে থাকে?

আমি কি করে জানব। তুমি কি অদ্ভুত! মার ভাল লাগে তাই।

ওটা না হয় হল, তোমার যা ভাল লাগে, তোমার মারও তাই ভাল লাগে। ঐ সব উপহার—স্বরলিপি, অ্যালবাম, ফুল—সব বুঝি মার জন্যে?

হাঁ, মা ফুল ভালবাসেন। মালীর কাছ থেকে কাল কিছু ফুল কিনেছেন।

ওঁর কানে কানে সারাক্ষণ তুমি কি বল?—আলেকজান্দার তার কথায় কান না দিয়ে বললে। দেখ, দেখ, অমনি তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেল। নিজেকে দোষী ঠাওরাচ্ছ। একজনের সুখ মাটি করে দেওয়া, ভুলে যাওয়া, এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে যাওয়া—এত সহজে—এত ভণ্ডামি, অকৃতজ্ঞতা, মিথ্যা কথা—বিশ্বাসঘাতকতা—হাঁ, বিশ্বাসঘাতকতা বই কি। এত নীচে নেমে গেলে কি করে? ধনী কাউন্ট, সমাজের কেষ্টবিষ্টু তিনি। তোমার দিকে একবার অনুরাগের একটু চোখ দেখাতেই গলে গেলে, আর অন্তঃসার শূন্য মূর্খের পায়ে লুটিয়ে পড়লে! তোমার লজ্জা কোথায় গেল? কাউন্ট আর এখানে আসতে পারবে না। সে এক নিঃশ্বাসে বলে গেল। শুনছ আমার কথা? তাকে ত্যাগ কর, তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে দাও। তোমাদের বাড়ির পথ সে ভুলে যাক। আমি এসব সহ্য করব না।

সে উত্তেজনায় ও জোরে নাদিয়ার হাত চেপে ধরল।

মা, মা, মা, এদিকে এস—নাদিয়া জোরে চিৎকার করে উঠল। তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে বাড়ির দিকে ছুটে গেল।

আলেকজান্দার বেঞ্চিতে বসে পড়ে মাথা চেপে ধরল হাত দিয়ে।

নাদিয়া ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে, বিবর্ণ, ভীত নাদিয়া, একখানা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

কি ব্যাপার! চেঁচাচ্ছিলে কেন? মা ছুটে এসে শুধালেন।

আলেকজান্দার অসুস্থ—অস্পষ্টভাবে সে বললে।

তুমি এমন ভয় পেলে কেন?

ক্ষেপে আছে সে, ওকে আমার কাছে আসতে দিও না, ঈশ্বরের দোহাই!

পাগলী, কি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি। ওর যদি অসুখ করে তো তাতে হয়েছে কি? জানি, ওর বুকে একরকম ব্যথা আছে। তাতে ভয়ানকটা কি হল। এ তো আর স্নায়ুরোগ নয়। ওপোডেলডক মালিশ করলেই সেরে যাবে, আমার মনে হয় ও আমার কথা শোনে নি, মালিশ করে নি।

আলেকজান্দারের চৈতন্য ফিরে এল! জ্বরের ঘোর কেটে গেছে, কিন্তু ব্যথা এখন চতুর্গুণ। নিজের সন্দেহের কোন নিরসন হয় নি। শুধু নাদিয়াকে ভয়ই পাইয়ে দিয়েছে, এখন তো আর ওর কাছে কোন উত্তর পাবার আশাই নেই। সে ঠিক ভাবে ব্যাপারটার সুরাহা করতে পারে নি। প্রেমিক যেমন করে তেমনি সে হঠাৎ নিজেকে শুধালে—ধর, ওর কোন দোষ নেই, হয়তো ও কাউন্টকে গ্রাহ্যই করে না। ওর নির্বোধ মা কাউন্টকে রোজ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে, ও কি করবে। দুনিয়ার হালচাল জানা মানুষ হিসেবে কাউন্ট ভদ্র খুব। নাদিয়া একটি সুন্দরী মেয়ে। সে হয়তো ওকে তার সঙ্গে প্রেমে পড়াতে চায়, কিন্তু এর মানে তো মোটেই এই নয় যে, নাদিয়া তাকে ভালবাসে। হয়তো ফুল আর ঘোড়ায় চড়া—এই নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ সে ভালবাসে, কাউন্টকে ভালবাসে না। যদি স্বীকার করা যায় যে, এতে একটু-আধটু ছেনালীপনা আছে, তাহলেও এটা কি ক্ষমার যোগ্য নয়? ওর চেয়ে বড় যারা তারাও এসব করে থাকে।

সে বিশ্রাম করতে বসল। তার মনে সুখের একটি রশ্মি ঝিলমিল করে উঠল। প্রেমিকরা তো এমনিই—পর্যায়ক্রমে অন্ধ এবং উগ্র বিশ্লেষণকারী! প্রিয়াকে রেহাই দিয়েই কত আনন্দ।

কিন্তু আমার সম্পর্কে ওর ব্যবহারের এই পরিবর্তন হল কেন? হঠাৎ আপন মনে জিজ্ঞেস করে আবার ম্লান হয়ে গেল! কেন আমাকে এড়িয়ে

চলে, কথা বলে না। লজ্জিত বলে কেন মনে হয়? কাল অমন সেজেছিল কেন? কোন অতিথি আসার কথা তো ছিল না। কাউন্ট ছাড়া কেউ আসে নি। কেন সে বললে, ব্যালের সময় কি শীগ্‌গীরই আসছে? একেবারে সরল প্রশ্ন। কিন্তু আলেকজান্দারের মনে পড়ল, কথায় কথায় কাউন্ট বলেছিলেন, প্রতিটি অভিনয় রজনীর জন্য একটি বক্স রাখবেন যতই কষ্টকর হোক তিনি তাদের সঙ্গে যাবেন। কাল নাদিয়া বাগান থেকে চলে এল কেন? কেন বাগানে গেল না। কেন সে এটাওটা প্রশ্ন করলে না?

আবার যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহে সে ডুবে গেল। আবার ব্যথা, শেষে সিদ্ধান্তে এল নাদিয়া তাকে কোনদিনই ভালবাসে নি।

সে হতাশ হয়ে আর্তনাদ করে উঠল—ঈশ্বর, ঈশ্বর, জীবন কি কঠোর, কি তিক্ত। আমাকে তার চেয়ে মৃত্যুর শান্তি এনে দাও, আত্মার সেই চির নিদ্রা এনে দাও...

পনেরো মিনিট পরে সে বিষণ্ণ শঙ্কাকুল চিত্তে বাড়ির ভিতরে এল।

নাদিয়া, ভীরুস্বরে সে বললে।

চোখ না তুলেই নাদিয়া হঠাৎ বলে উঠল, এসো!

আবার কবে আসব?

যখনই তুমি ইচ্ছা কর, কিন্তু হ্যাঁ আগামী সপ্তাহে আমরা শহরে চলে যাব, আমরা তোমাকে জানাব।

সে বিদায় নিলে। দুসপ্তাহেরও বেশি অতিক্রান্ত, সবাই শহরে গেছে। আবার অভিজাতমণ্ডলী ঝকঝকিয়ে উঠেছে। হোমরা-চোমরারা বসবার ঘরে জ্বালাচ্ছেন ঝাড়লণ্ঠনের আলোগুলি, কিনে এনেছেন মোম, দুখানা তাসের টেবিল পাতা হয়েছে স্পেনের ইতালীচ আর ইভান স্পেনীচের আগমনের আশায়। স্ত্রীকে বলছেন—তাঁদের অতিথিদের নিমন্ত্রণ মঙ্গলবারে।

আলেকজান্দার এখনো লুবেৎস্কী থেকে নিমন্ত্রণ পায় নি। একদিন ওদের বাবুর্চি আর ঝির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ঝি তাকে দেখে পালিয়ে গেল; সে তার অজ্ঞানী কয়েদীর মত ব্যবহার করলে। বাবুর্চি থেমে পড়ল।

হুজুর কি আমাদের ভুলে গেছেন, সে জানে, আমরা এক হপ্তা হল এসেছি।

[illegible] নি বোধ হয়, কেউ আসছে না নিশ্চয়ই।

হাঁ হুজুর, আপনি ছাড়া সবাই আসছেন। কর্ত্রী তো বলছেন, আপনি কেন এলেন না। কাউন্ট তো রোজই আসেন, আহা কি ভদ্র লোক। হিজিবিজির কাছ থেকে একখানা ছোট্ট নোটবুক সেদিন তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম তিনি আমাকে মোটা বকশিস করলেন।

বোকা কোথাকার! আলেকজান্দার এই বলে বাক্যবাগীশের কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় সে সুবেৎস্কীদের বাড়ির সামনে দিয়ে গেল। খাসা আলো জ্বলছে। দরজায় গাড়ি।

কার গাড়ি? সে শুধালে।

কাউন্ট নোভিনস্কির।

পরদিন, তার পরের দিনও একই ব্যাপার। অবশেষে সে দেখা করতে এল। মা সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, গরহাজিরার জন্য ভর্ৎসনা করলেন, অপোস্তেলভক মালিশ করে নি বলেও বকলেন। নাদিয়া ধীর স্থির, কাউন্ট ভদ্র—আলাপ থেমে গেল।

দু-তিনবার সে সেখানে গেল। নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল, বাঙ্ময় দৃষ্টিতে। সে যেন তার দৃষ্টি দেখেও দেখলে না। অথচ আগে কি ভাবেই না সে তাকে লক্ষ্য করত। যখন সে মারিয়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলত, নাদিয়া গিয়ে দাঁড়াত মার চেয়ারের পিছনে—মুখভঙ্গী করত, তাকে হাসাতে, বোকা বানাতে চেষ্টা করত।

সে অসহনীয় ব্যথায় ডুবে গেল। যে ক্লেশ সে বহন করছে তা ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্তেই তার ভাবনা। এসবের মানে কি সে জানতে চায়।

সে নিজেকে বোঝাল, জবাব যাই-ই হোক—সন্দেহ এর সত্যে পরিণত হবে। এ-অবস্থায় কি করবে তাও বহু সময় ভাবলে। তারপর স্থির সিদ্ধান্তে এল, এবার সে গেল সুবেৎস্কী ভবনে।

সব কিছুই তার অনুকূল। দরজায় গাড়ি নেই। বলনাচের ঘরের ভিতর দিয়ে সে নিঃশব্দে এল, বসবার ঘরের দরজায় একবার দাঁড়ালে নিজেকে সামলে নেবার জন্ত। নাদিয়া পিয়ানোর কাছে বসে বাজাচ্ছে। ঘরের অপর পাশে মা সোফায় বসে স্কার্ফ বুনছেন। নাদিয়া বলনাচের ঘরে পায়ের শব্দ শুনে আরো আস্তে বাজাচ্ছে, মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, হাসিমুখে অতিথির

প্রত্যাশায় সে আছে! অতিথি এল, অতিথিকে দেখে হাসি অমনি মিলিয়ে গেল। মুখের চেহারা একটু পালটে গেল, সে উঠে পড়ল। এই অতিথিকে তো সে আশা করে নি।

আলেকজান্দার নিঃশব্দে অভিবাদন করে ছায়ার মত মার কাছে চলে এল। উপরে চলেছে সে, আগের সে আত্মবিশ্বাস আর নেই, মাথা নোয়ানো। নাদিয়া বসে বাজাতে লাগল এবং উদ্বিগ্নভাবে মাঝে মাঝে ফিরে তাকাতে লাগল।

আধঘণ্টা পরে মা কেন যেন ঘরের বাইরে গেলেন। তখন আলেকজান্দার নাদিয়ার কাছে এল। কিন্তু নাদিয়া যেন চলে যাবার জন্য ব্যস্ত।

নাদেজদা, শোকার্ত তার স্বর, একটু দাঁড়াও, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও তার বেশি তো চাই না।

তোমার কথা আমি শুনতে চাই না, সে বললে, শেষবারে তুমি যা—

আমি ভুল করেছিলাম। এখন আমি ভিন্ন মানুষ। তোমাকে কথা দিচ্ছি আর একটাও ভর্ৎসনার কথা শুনবে না, আমার কথা শুনতে অস্বীকার কোরো না—হয়তো এই-ই শেষবার, একটা বোঝাপড়া দরকার। তুমি বলেছিলে তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমি তোমার মাকে বলতে পারি। তারপরে কত কি ঘটে গেল…এক কথায় আমার সেই প্রশ্নটাই আবার আউড়ে যেতে হবে. বোসো, বসে বাজাও। তোমার মার না শোনাই ভাল, তুমি তো জান, এই প্রথম নয়।

যন্ত্রচালিতের মতো নাদিয়া তার কথা শুনলে, একটু লাল হয়ে সে কয়েকটা রীড টিপল, উদ্বিগ্ন আশায় সে তার দিকে চেয়ে রইল।

মা তার জায়গায় ফিরে গিয়ে শুধালেন, আলেকজান্দার কোথায় গেল?

নাদেজদার সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে কথা বলতে চাই, সে উত্তর দিলে।

বেশ, বল, বহুদিন তো তোমাদের আলাপ হয় নি।

সে নিচু গলায় বললে, আমাকে শুধু একটা প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দাও। আমাদের বোঝাপড়া তাহলেই শেষ হয়। আমাকে কি আর ভালবাস না?

বিব্রত হয়ে নাদিয়া উত্তর দিলে, মা আর আমার কাছে তোমার বন্ধুত্বের কতখানি দাম তাতো তুমি জান...তোমাকে দেখে আমরা কত খুশী হতাম।

আলেকজান্দার তার দিকে তাকিয়ে ভাবলে, এই কি সেই দিল-খোলা

ছুই্ মেয়ে, এই কি সেই দিলদরিয়া গেছো মেয়ে—যাকে আমি চিনতাম! কি তাড়াতাড়িই না ওর এই পরিবর্তন হল! কি দ্রুতই না নারী-প্রবৃত্তি জেগে উঠল! ঐ যে খামখেয়ালিপনা, ও কি ছলনা আর চাতুরীর উৎস? দেখ—কত দ্রুত মেয়েটি নারীতে পরিণত হল। আমার খুড়োর প্রক্রিয়ার দরকারও হল না! এ তো কাউন্টেরই শিক্ষা আর মাত্র দু-এক মাসের ব্যাপার। কাকা, কাকা, আপনার কথা কি নির্মম সত্য।

শোন, সে এমন স্বরে বললে যাতে এই ক্ষুদ্র ছলনাময়ী নারীর মুখোস এক মুহূর্তে খসে পড়ল। যার কথা ভেবো না এক মুহূর্তের জন্য সেই আগেকার নাদিয়া হয়ে ওঠ, যে আমাকে একটু ভালবাসত, স্পষ্ট উত্তর দাও। ঈশ্বরের দোহাই, আমি জানতে চাই।

কিছু বললে না নাদিয়া, স্বরলিপি বদলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে একটা শক্ত গৎ বাজাতে লাগল।

বেশ, আমি অন্যভাবেই প্রশ্নটি করছি, আলেকজান্দার বললে, বল, অন্য কেউ—যে নামহীন হয়েই থাকবে—অন্য কেউ কি তোমার বুকে আমার জায়গা জুড়ে বসে নি?

মোমবাতির শীষ কেটে দিয়ে লম্বা পলতেটি নিয়ে খেলা করতে লাগল নাদিয়া, কিছু বললে না।

উত্তর দাও নাদেজদা, একটা কথায় আমার এই জ্বালা জুড়োবে। তোমাকে অপ্রিয় ব্যাখ্যাও করতে হবে না।

দোহাই ঈশ্বরের, তুমি থাম! তোমাকে কি বলব, আমার তো কিছু বলার নেই, সে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলে।

অন্য লোক হলে এ উত্তরে সন্তুষ্ট হত। তার আর কিছু করবার নেই, এই কথাতেই সব বুঝত। নাদিয়ার মুখের এই মূক দুঃখের ছাপ দেখে তার ভাবভঙ্গী দেখে সব বুঝে ফেলত, কিন্তু আলেকজান্দার তো সন্তুষ্ট হল না। জল্লাদের মতই সে তার শিকারের উপর অত্যাচার শুরু করলে, কি এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর হতাশ কামনায় সে দুঃখের পাত্রের সবটুকু চুমুক দিয়ে পান করতে চাইলে।

বল, সে বললে, আজই এই জ্বালার শেষ করে দাও। সন্দেহ, নিদারুণ সন্দেহ আমার মনকে অস্থির করে তুলেছে, আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে, আমি

আছে। এই ব্যথায় হয়তো আমার বুকখানা খান্‌খান হয়ে যাবে। আমার সন্দেহ দূর করার অন্য উপায় তো নেই। তোমার একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে, নইলে তো আমি শান্তি পাব না।

প্রত্যাশায় সে তাকাল তার দিকে। নাদিয়া নিরুত্তর।

আমাকে দয়া কর, সে আবার বলতে লাগল, আমার দিকে তাকাও, আমি কি আগের মত আছি? মানুষ শিউরে ওঠে, আমাকে দেখে চিনতে পারে না। সবাই করুণা করে—একমাত্র তুমি—

সহসাই তার চোখ ঝলসে উঠল। সে ক্ষীণ, ম্লান, কপালে তার স্বেদ বিন্দু।

অপাঙ্গে সে তাকাল তার দিকে, করুণার মত কি যেন তার দৃষ্টিতে চিকচিকিয়ে উঠল. সে সহসাই তার হাতখানা তুলে নিয়েই আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে নীরবে।

বল? সে শুধালে।

আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও, আর্ত স্বরে নাদিয়া বললে, তুমি আমাকে প্রশ্ন করে ব্যথা দিচ্ছ।

দোহাই ঈশ্বরের আমি অনুনয় করছি। সব কিছু এক কথায় শেষ করে দাও। এই গোপনীয়তার কি প্রয়োজন? নির্বোধ আশার এক কণা এখনো আছে, আমি তো থামতে পারব না। রোজ তোমার কাছে এমনি ম্লান হয়ে, এমনি উত্তেজনা নিয়ে দেখা দেব—তোমাকে দুঃখ দেব। আমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দাও। আমি তোমার জানালার তলায় ঘুরে বেড়াব, থিয়েটারে, পথে, সর্বত্র ভূতের মতো তোমার সঙ্গে দেখা করব। এ হতে পারে মূর্খতা, হাসির ব্যাপার। কারো কারো কাছে এ অদ্ভুত মনে হতেও পারে, কিন্তু আমার কাছে এ বড়ই দুঃখের ব্যাপার আবেগের কি মানে তুমি জান না, সে কোথায় নিয়ে যেতে পারে—তাও জান না। ভগবান করুন, তোমাকে যেন কোনোদিন জানতেও না হয়! লাভ কি বল? সোজা বলে ফেলাই ভাল নয় কি?

কি তুমি জানতে চাও? নাদিয়া চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বললে, আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, মন যেন কুয়াশায় ছেয়ে গেছে।

কপালে সে হাত চেপে ধরে আবার তখনি নামিয়ে নিলে। এ যেন তার জ্বরের ঘোর।

আমি জিজ্ঞেস করি—তোমার হৃদয়ে কি অন্য কেউ আমার জায়গা জুড়ে বসেছে? শুধু একটা কথা—হাঁ, কি না—তাতেই সব চুকে যাবে। ওটা বলতে নিশ্চয়ই বেশি সময় লাগবে না।

নাদিয়া কি যেন বলতে চাইলে, পারলে না। চোখ নামিয়ে চাবি টিপলে আঙুল দিয়ে বার বার। তার হৃদয়ে চলেছে ভীষণ সংগ্রাম তা বোঝা যায়। অবশেষে আর্তস্বরে বলে উঠল—উঃ আলেকজান্দার। রুমাল দিয়ে তার কপাল মুছলে।

হাঁ কি না, বল? নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আলেকজান্দার বললে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল।

হাঁ কি না বল?

হাঁ, নাদিয়া একরকম অস্পষ্ট স্বরেই বললে। তার মাথা পিয়ানোর উপর নুয়ে পড়েছে, যেন স্বপ্নে বাজাচ্ছে, 'হাঁ' শব্দটা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসের চেয়ে খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু আলেকজান্দার কালা হয়ে গেল। হৃদয় যেন মূল থেকে উপড়ে গেছে, হাঁটু কাঁপছে, সে পিয়ানোর পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়ল তার মুখে কথা নেই।

নাদিয়া সভয়ে তার দিকে তাকাল। আলেকজান্দার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

আলেকজান্দার ফিওদরীচ! মা ঘর থেকে হঠাৎ ডাকলেন। বলতো কোন কানটা ভন ভন করছে?

সে নিরুত্তর।

মা তোমাকে ডাকছেন, নাদিয়া বললে।

হ্যাঁ?

কোনটা বাজছে? মা বলে উঠলেন, তাড়াতাড়ি বল!

ডানটাই, আলেকজান্দার গম্ভীর হয়ে বললে।

আঃ কি যে বল—নিশ্চয়ই বাঁ কান! আমি ভাবছিলাম কাউণ্ট আজ আসবেন কি না।

কাউণ্ট! আলেকজান্দার আওড়ালে কথাটা।

নাদিয়া তার কাছে ছুটে গিয়ে মিনতির স্বরে বললে আমাকে ক্ষমা কর, আমি নিজেকে বুঝতে পারি না। সব কিছুই হঠাৎ আসে, আমার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে আসে। কেমন করে জানিনা এমন হয়, তোমাকে আমি ঠকাতে চাই না।

আমার কথা রাখবে নাদেজদা, সে বললে, তোমাকে একটুও ভর্ৎসনা করব না। তোমার এই সরলতার জন্তে ধন্তবাদ। তুমি আজ অনেকখানি করলে, আমার পক্ষে ঐ 'হাঁ' কথাটি শোনা বড়ই শক্ত কিন্তু তোমার পক্ষে তা বলা তো আরো শক্ত। বিদায়—আমাকে আর দেখতে পাবে না, সেই হবে তোমার সরলতার পুরস্কার। কিন্তু ঐ কাউন্ট—কাউন্ট!

দাঁতে দাঁত চেপে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এসে বললে, কিন্তু এর শেষ কোথায়? কাউন্ট তো তোমাকে বিয়ে করবে না, তার অভিসন্ধি কি?

জানি না, দুঃখে মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল নাদিয়া!

হা ঈশ্বর, তুমি কি অন্ধ। আলেকজান্দার ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

তার অভিপ্রায় তো মন্দ হতে পারে না—ক্ষীণ নাদিয়ার স্বর।

সাবধান নাদেজদা!

সে তার হাতখানা নিয়ে চুমু খেয়ে স্খলিতপদে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। এক করুণ দৃশ্য। নাদিয়া তার জায়গাটিতে বসে আছে।

নাদিয়া, তুমি বাজাচ্ছ না কেন? কয়েক মিনিট পরে মা বললেন।

নাদিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, যেন গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠেছে।

এক মিনিট সবুর করো মামণি! সে এক পাশে বিষণ্ণভাবে মাথা এলিয়ে কয়েকটা স্বরলিপি বাজাতে লাগল। আঙুল কাঁপছে, অনুশোচনায় নিশ্চয়ই সে অধীর, সাবধান কথাটিতে সন্দেহও জেগেছে মনে। কাউন্ট যখন এল তখন সে ম্রিয়মানা, মিতভাষিণী, তার ভাবভঙ্গী যেন কষ্টকল্পিত, মাথা ধরার অছিলায় সে সকাল-সকাল তার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেরাত্রে জীবন তার কাছে তিক্ত হয়েই দেখা দিল।

সিঁড়ির তলা অবধি যেতে না যেতে আলেকজান্দারের সব শক্তি উবে গেল। শেষ ধাপে সে বসে পড়ে রুমাল চোখে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অশ্রুহীন সশব্দ তার ক্রন্দন।

এই সময় দরোয়ান বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল।

মার্থা, এদিকে এস তো। এসে শুনে যাও! কে যেন ষাঁড়ের মতো ঘোঁতঘোঁত করছে। আমাদের আরশকা বুঝি শিকল ছিঁড়লে ভাবলাম কিন্তু আরশকা তো নয়।

না, আরশকা নয়, মার্থা শুনে বললে, তবে ওটা কি?

যাও—লণ্ঠনটা নিয়ে এস—উনুনের পিছনে ঝোলানো আছে।

মার্থা লণ্ঠন নিয়ে এল।

এখনো কাঁদছে না কি? সে শুধালে।

হাঁ, হাঁ, তবে কি চোর ঢুকেছে না কি রে?

কে রে? দরোয়ান হাঁক পাড়লে।

কোনো উত্তর নেই।

কে রে ওখানে? মার্থা প্রতিধ্বনি করলে।

ফোঁপানি চলতে লাগল। হঠাৎ দুজনেই ভিতরে এল। তাদের দেখে আলেকজান্দার ছুটে পালাল বাড়ি থেকে।

আরে এযে এক ভদ্দর লোক, মার্থা তার দিকে তাকিয়ে বললে। তুমি চোর ভেবেছিলে। এর চেয়ে আর ভাল কি ভাবতে পার! চোর কেন অচেনা মানুষের বারান্দায় বসে কাঁদবে গো।

তাহলে ও মাতাল।

ভাল, আরো ভাল! মার্থা বললে, নিজের মতোই সবাইকে ভাব কি না! সব মাতাল তোমার মতো কাঁদে না।

তাহলে ওর ব্যাপারটা কি—ওর নিশ্চয়ই খিদেও পায়নি, রাগ করে বললে দরোয়ান।

কি বললে? মার্থা তার দিকে তাকালে, উত্তর সে খুঁজে পাচ্ছে না। কে বলতে পারে—হয়তো কিছু হারিয়েছে—টাকাকড়ি…

দুজনেই বসে পড়ে লণ্ঠনের আলোয় বারান্দার কোণ-কানাচ হাতড়াতে লাগল।

হারিয়েছে! দরোয়ান লণ্ঠনটা মেঝের উপর নীচু করে দিয়ে ঘোঁত করে উঠল—কি করে হারাবে, সিঁড়িখানা পাথরের তৈরি, পরিষ্কার—একটা ছুঁচ পড়লেও দেখা যায়। পড়লে শুনতেও পাবে। ঝনঝন করে বেজে উঠতো। আর ও অমনি তুলে নিত—কি বলল নিত না? আর এখানে কি হারাতে

পারে? কিছুই তো নেই। হারাবে-হারাবে!—তাই বলে! অমন মানুষ কিছু ফেলে দেয় না। এসব লোক নিজের পকেটে জিনিস রাখতে জানে। ফেলে দিয়েছে! আমি ওদের চিনি—বড পাজি! ফেলে দিয়েছে বইকি! কোথায় ফেলবে বলতো?

বহুক্ষণ ধরে ওরা হাতড়ে বেড়াল টাকার সন্ধানে।

নিশ্চয়ই নেই—দরোয়ান অবশেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল। সে ফুঁ দিয়ে লণ্ঠন নিবিয়ে দিলে পলতেটাকে দু আঙুলের ভিতরে চেপে ধরে, তারপর ভেড়ার চামড়ায় ফতুয়ায় মুছে নিলে আঙুল।

ছয়

সেই রাত্রে—প্রায় বারোটার সময় পিতর ইভানীচ যখন একহাতে মোম আর একখানা বই নিয়ে আর একহাতে ড্রেসিংগাউনের প্রান্ত ধরে পড়ার ঘর থেকে শোবার ঘরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পরিচারক এসে জানালে আলেকজান্দার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। পিতর ভ্রূ কুঁচকে এক মুহূর্ত কি ভেবে বললো, তাকে পড়ার ঘরে নিয়ে এস। আমি আসছি।

পড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে তিনি বললেন, এই যে, আলেকজান্দার! বহুদিন তোমাকে দেখিনি! প্রতিদিনই ভেবেছি, তুমি আসবে, আজ হঠাৎ রাত্রে এসে উদয় হলে। এত রাত্রে কেন? কি হয়েছে তোমার? ভীষণ খারাপ দেখাচ্ছে তোমার চেহারা!

আলেকজান্দার উত্তর না দিয়ে একখানা চেয়ারে ভেঙে পড়ল। পিতর ইভানীচ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

আলেকজান্দার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

ভাল আছ তো? পিতর ইভানীচ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

হাঁ, ধন্যবাদ, আলেকজান্দারের উচ্চারণ অস্পষ্ট। আমি চলছি-ফিরছি, খাচ্ছি, পান করছি—সুতরাং ভালই আছি।

না, না ঠাট্টা নয়, তোমায় একজন ডাক্তার দেখানো উচিত।

বহু লোক ও পরামর্শ দিয়েছে। ডাক্তার বা বাদ্যিদের ওষুধে আমার কিছু হবে না। আমার রোগ শারীরিক নয়।

কি ব্যাপার? তুমি জুয়ো খেলছ না টাকা হারিয়েছ? পিতর ইভানীচ ব্যগ্র হয়ে শুধালেন।

আপনি তো টাকার সম্পর্কে ছাড়া অন্য দুঃখের কল্পনা করতেই পারেন না। সে হাসবার চেষ্টা করলে।

দুঃখের যদি কানাকড়িও দাম না হয়, তাহলে সে কেমন দুঃখ?

আমি যে দুঃখ সইছি-এ সেই দুঃখ। আমার বর্তমান দুঃখ কি আপনি জানেন?

দুঃখ? তোমার বাড়িতে সবই ঠিক আছে—তোমার মা যে মাসে একখানা করে চিঠি লেখেন, তাতে জানি। অফিসে যা হয়েছে, তার চেয়ে আর কি খারাপ হবে। তোমার নিচের লোক উপরে ওঠে গেছে—এটা কিন্তু সত্যি খারাপ। তুমি বলছ ভাল আছ, জুয়ো খেলনি টাকা খোয়াওনি—এইগুলিই তো আসল দুঃখ—তাছাড়া যে-দুঃখ মানুষ সেগুলো এঁটে উঠতে পারে। তারপরে তো আছে প্রেমের মতো যতো সব বাজে ব্যাপার।

হাঁ, প্রেম, আপনি কি জানেন আমার কি হয়েছে? জানলে আর অমন করে তা উড়িয়ে দিতে পারতেন না হয়তো, বরং শিউরে উঠবেন।

তাহলে বল, বহুদিন শিউরে উঠিনি, খুড়ো বসে পড়ে বললেন। কিন্তু আঁচ করা তেমন শক্ত কিছু নয়। তুমি হয়ত প্রতারিত হয়েছ বা বোকা বনেছ।

আলেকজান্দার লাফিয়ে উঠে কি যেন বলতে গেল, কিন্তু কিছু না বলেই বসে পড়ল।

তাহলে এটা সত্যি কথা! দেখছ তো! আমি তোমাকে ও-কথা, বলেছিলাম কিন্তু তুমি বলেছিলে না, না, সে তো কখনো হবে না।

আমি কি করে তা কল্পনা করব? আলেকজান্দার বললে, এত সব কিছুর পরে—

তোমার কল্পনা করার দরকার ছিল না, তোমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকা উচিত ছিল—তার মানে জানা উচিত ছিল যে এমনিই হয়—আর সেইমত কাজ করাও উচিত ছিল।

কাকা, আমার যখন এই দশা আপনি তখন এমন ধীরে সুস্থে যুক্তি দেখাতে পারছেন?—আলেকজান্দার বললে।

আমার কাছে এর দাম কি?

ওঃ ভুলে গেছলাম, যদি সারা শহর পুড়ে যায়, মাটির ভেতরে সেঁধিয়ে যায় আপনি ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

মাপ কর, আমার কারখানার কি হবে?

আপনি ঠাট্টা করছেন, আর আমি সত্যিই কষ্ট পাচ্ছি, আমি অসুখী, রোগীর মত আমার দশা।

সত্যিই কি প্রেমে এমনি রোগা হয়ে গেছ? এতো কেলেঙ্কারী কাণ্ড! না, না! তোমার অসুখ করেছিল, এখন সুস্থ হচ্ছ। এই বোকামি আঠারো মাস ধরে চলছে—সেটা তো আর ঠাট্টা নয়, আর একটু বেশি হলে, আমিই হয় তো অপরিবর্তনীয় চিরন্তন প্রেমে বিশ্বাস করে বসতাম।

কাকা, আলেকজান্দার বললে, আমাকে দয়া করুন! আমি নরকভোগ করছি।

বেশ—ব্যাপারটা কি?

আলেকজান্দার চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের কাছে বসল, তার খুড়ো মশাই অমনি দোয়াত, কাগজ-চাপা আর অন্যান্য জিনিস ভাইপোর কাছ থেকে সরিয়ে রাখলেন।

আপন মনে তিনি বললেন—রাতে এলো, বলছে নরকভোগ করছে, নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ভাঙবে।

আপনার কাছ থেকে সান্ত্বনা পাব না জানি, আলেকজান্দার শুরু করলে, তা আমি দাবিও করি না। শুধু কাকা আর আত্মীয় হিসেবে আপনার সাহায্য চাই। ......আমাকে দেখে আপনার উপহাসের বস্তু বলে মনে হচ্ছে—তাই না?

হাঁ, যদি অমন করুণার পাত্র না হতে।

তা হলে আমাকে আপনি করুণা করেন।

যথেষ্টই করি, আমি পাথরে তৈরী নই নিশ্চয়ই। ভাল ছেলে, চতুর, ভালভাবে লালিত-পালিত সে—বিনা কারণে দুঃখ ভোগ করছে—কি জন্যে? না যত সব বাজে ব্যাপারের জন্য।

আপনি যে আমাকে করুণা করেন তা প্রমাণ করে দেখান।

কি করে? তুমি তো বলছ—টাকায় তোমার দরকার নেই।

টাকা—টাকা! যদি আমার এই দুর্ভাগ্য টাকার অভাবে হোত, আমি খুশী হতাম।

ওকথা বোলো না, ইভানীচ গম্ভীরভাবে বললেন, তুমি যুবক—তুমি তখন ভাগ্যকে আশীর্বাদ করতে না অভিশাপ দিতে। আমি বহুবার আমার ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়েছি।

আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনুন।

আলেকজান্দার, তুমি কি বেশিক্ষণ থাকবে? খুড়োমশায় বললেন।

হাঁ, আমি আপনার সাহায্য চাই, কেন ওকথা বলছেন।

দেখ, আমার রাতের খাওয়া খেতে হবে। আমি না খেয়েই শুতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ এখানে বসতে হবে। এস, খেয়ে নিই। এক বোতল মদও পান করা যাবে, তুমি তখন আমাকে সব কথা বলতে পারবে।

আপনি খেতে পারবেন? আলেকজান্দার অবাক হয়ে বললে।

নিশ্চয়ই পারব। তুমি পারবে না?

আমি? খাব? যখন আমার জীবন-মরণ সমস্যার কথা শুনবেন. আপনিও একটু গিলতে পারবেন না।

জীবন-মরণ সমস্যা? খুড়ো মশায় আউড়ে গেলেন, অবশ্যই ব্যাপারটা জরুরী, তবু চেষ্টা করা যাক—একটু হয়তো খাওয়া যাবে।

তিনি ঘণ্টি বাজালেন।

সাপারের জন্ত কি আছে জিজ্ঞেস কর—ভৃত্য ডাক শুনে আসতেই তাকে বললেন—ওদের সবুজ লেবেল ওয়ালা এক বোতল লেফাইট বার করতে বল।

ভৃত্য চলে গেল।

কাকা, আমার দুঃখের কাহিনী শোনার মত মন আপনার নেই, আলেকজান্দার টুপি তুলে নিয়ে বললে, বরং কাল আসব।

না, না, পিভর ইভানীচ তাড়াতাড়ি ভাইপোর হাত ধরে বললেন। আমার মন সব সময়েই এক রকম, কাল এলে দেখবে, আমি প্রাতরাশ খাচ্ছি, নয়তো তার চেয়েও কোনো নিকৃষ্ট কাজে ব্যস্ত আছি, তার চেয়ে এখনি বলে

কেন। সাপার কিছু নষ্ট করবে না বরং ভাল বুঝতে পারব, খুড় পেটে তা সহজ নয়।

সাপার এল।

আলেকজান্দার এস, পিত্তর ইভানীচ বললেন।

কাকা, আমি তো কিছু খেতে পারছি না আলেকজান্দার অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল। তার খুড়োমশাই যখন টেবিলে খেতে ব্যস্ত, সে তখন কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে তাকিয়ে আছে।

এক গেলাস মদ অন্ততঃ খাও—মদ খারাপ নয়।

আলেকজান্দার মাথা নাড়লে।

তাহলে একটা চুরুট নাও এবং বলে যাও, আমি সর্বক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনব।

একটু থেমে আলেকজান্দার বললে, আপনি কাউন্ট নোভিনস্কীকে চেনেন ?

কে—কাউন্ট—প্রাতন ?

হাঁ।

তিনি আমার বন্ধু, কি ব্যাপারটা বল ?

আপনার বদমায়েস বন্ধুর জন্ত আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পিত্তর ইভানীচ হঠাৎ অবাক হয়ে ভাইপোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বেশ, বেশ. তা তুমি কি ওঁকে চেন নাকি ?

বেশ ভাল করে চিনি।

বহুদিন থেকেই চেন ?

তিন মাস হ'ল চেনা।

কি ব্যাপার ? আমি পাঁচ বছর ধরে চিনি, আর সব সময়েই তাকে ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছে। যাকে জিজ্ঞেস করবে, সে-ই ওকে ভাল বলবে। আর তুমি হঠাৎ ওঁকে নস্যাৎ করতে এসেছ !

কাকা আপনি কতদিন থেকে লোকের হয়ে ওকালতি করতে শুরু করেছেন ? আপনি তো—

ভদ্রলোকের জন্ত সব সময়েই ওকালতি করে থাকি, কিন্তু তুমি আগে

তো সবাইকে দেবতা বলতে তার বদলে কবে থেকে তাদের গালমন্দ দিতে শুরু করেছ?

তা যখন আমি তাদের জানতাম না। কিন্তু এখন—হায় মানুষ, অসুখী জাত —রসিকতা আর অশ্রুপাতের যোগ্য আধারই বটে। আমি স্বীকার করছি, আপনি যখন সকলের সম্বন্ধে সতর্ক হতে বলেছিলেন, তখন আপনার কথা না শুনে খুবই দোষ করেছি।

আমি এখনো সেই পরামর্শই দিই, হুঁশিয়ার থাকায় ক্ষতি নেই। যদি কেউ পাজী হয়, তোমার তাতে ক্ষতি হবে না, আর যদি কেউ ভদ্র হয়ে দেখা দেয়, তুমি শুধু একটু হতাশ হবে মাত্র, তাও আবার খুশীর হতাশা।

আলেকজান্দার বিদ্রূপের সুরে বললে, ভদ্রলোক কোথায় আছে দেখিয়ে দিন।

তুমি আমি তো আছি - আমরা কি ভদ্রলোক নই? তুমি যার কথা বলছ, সেই কাউণ্টও ভদ্রলোক, আরো ভদ্রলোক আছে। সকলের ভিতরেই কিছুটা মন্দ আছে, কিন্তু সবাই একেবারে মন্দ নয়।

সবাই—সবাই! আলেকজান্দার দৃঢ় স্বরে বললে।

তোমার নিজের সম্বন্ধে কি ধারণা?

আমি? এই ভিড়ের মধ্যে আমার অন্ততঃ এই মন আছে, যদিও সে-মন ভেঙে গেছে, তবু নীচতা থেকে সে মুক্ত, ব্যথাভরা আত্মা—কিন্তু কেউ তাকে মিথ্যা ও ছলনা বা বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিতে পারবে না। আমি তো সংক্রামিত হইনি।

বেশ—দেখা যাবে. কিন্তু কাউণ্ট তোমার কি করলেন?

কি করেছেন? তিনি আমার সর্বস্ব চুরি করে নিয়েছেন

আর একটু সোজা করে বল, সর্বস্ব বলতে কি বোঝায় ঈশ্বর জানেন— হয়তো টাকাকড়ি, তিনি তো তা করবেন না।

আমার কাছে পৃথিবীর সব ধনরত্নের চেয়ে প্রিয় যা তাই নিয়েছেন, আলেকজান্দার বললে।

সে জিনিসটি কি হতে পারে বল তো?

সর্বস্ব—সুখ, জীবন, সব!

কিন্তু তুমি তো বেঁচে আছ।

দুর্ভাগ্য আমার, তাই বেঁচে আছি, কিন্তু এ জীবন মৃত্যুর চেয়েও খারাপ।

সোজাসুজি বল তো বাপু, কি হয়েছে?

সে এক ভয়ানক ব্যাপার, আলেকজান্দার বললে, ঈশ্বর, হা ঈশ্বর।

ওঃ, আমার তো মনে হয় তোমার সুন্দরীকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কি যেন তার নাম? লোকটা এদিকে ভারি পটু, ওর সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে না। পিতর ইভানীচ এক টুকরো টার্কীর মাংস মুখে পুরতে পুরতে বললেন।

এই পটুতার জন্য তাকে ভুগতে হবে, আলেকজান্দার রেগে বলল। আমি না লড়ে ছাড়ব না। মৃত্যুই ঠিক করবে কে নাদিয়াকে পাবে। এই সস্তা নারী-প্রেমিককে আমি পিষে মারব। ওকে বাঁচতে দেব না, ও চুরি করা ধন ভোগ করতে পারবে না। আমি ওকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলব।

পিতর ইভানীচ হেসে উঠলেন।

উঃ কি গ্রাম্য প্রভাব! আচ্ছা কাউন্টের কথায় আসা যাক, আলেকজান্দার, তিনি কি তোমাকে বলেছেন, বিদেশ থেকে কিছু চিনেমাটির বাসন পেয়েছেন? বসন্তকালে একটা ফরমায়েস দিয়েছিলেন। আমার তা দেখার ইচ্ছে আছে।

চীনে মাটির বাসনের ব্যাপার নয় কাকা, আমি কি বললাম, আপনি কি শোনেন নি?

হুঁ—খুড়োমশাই একখানা হাড়ে কামড় দিতে দিতে বললেন।

আপনি এ সম্পর্কে কি বলতে চান?

কিছুই না, তোমার কথা শুনে যাচ্ছি।

জীবনে একবার অন্ততঃ আমার কথা মন দিয়ে শুনুন, আমি একটি গুরুতর ব্যাপারেই আপনার কাছে এসেছি. আমি প্রকৃতিস্থ হতে চাই—লাখো লাখো যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছে, আমি তার উত্তর পেতে চাই। আমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে, কি করছি নিজেই জানিনা। আমাকে সাহায্য করুন।

সব সময়েই তো আমি তোমার কাজের জন্য প্রস্তুত আছি। শুধু বল, কি চাও, যদি বাজে কোন ব্যাপারে না হয়, টাকা দিতেও রাজী আছি।

বাজে ব্যাপার! হয়তো আর কয়েক ঘণ্টা পরে আমি আর বেঁচে

থাকব না, হয়তো খুনী হব—এটা তো বাজে ব্যাপার নয়,……আর আপনি হাসছেন, ধীরেসুস্থে রাতের খাবার খাচ্ছেন।

তোমার কাছে মাপ চাইছি, খুব সম্ভব তুমি রাতের খাওয়া খেয়েই এসেছ, এবং আমাকে খেতে দিতে চাইছ না।

দুদিন ধরে কিছুই খাই না।

তা হলে তো সত্যিই জরুরী ব্যাপার!

একটা কথা বলুন—আমাকে কি চরম অনুগ্রহ করবেন?

কি?

আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাথী হবেন?

কাটলেটগুলো একেবারে ঠাণ্ডা, পিতর ইভানীচ থালাটা দূরে সরিয়ে রেখে বিরক্ত হয়ে বললেন।

কাকা, আপনি ঠাট্টা করতে পারছেন?

আমি জিজ্ঞেস করি তোমার এমন বাজে কথা শুনি কি করে? আমাকে তোমার সাথী হতে বলছ?

আপনি হবেন না?

নিশ্চয়ই নয়!

বেশ, আর একজন খুঁজে নেওয়া যাবে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হব একজন অপরিচিতই তা দেখুক! আপনাকে শুধু বলছি, আপনি কাউন্টকে জিজ্ঞেস করুন—শর্তগুলি কি হবে।

আমি তা পারব না। আমি তাকে এসব প্রস্তাব করার মত বোকামি করতে পারব না।

তাহলে চলি, আলেকজান্দার টুপি হাতে নিয়ে বললে।

কি, চললে নাকি? একপাত্র মদ খেয়ে যাবে না?

আলেকজান্দার যেন চলেই যাবে এমনি তার ভাবখানা, কিন্তু দরজার কাছে একখানা চেয়ারে গভীর বিষাদে এলিয়ে পড়ল।

কার কাছে যাব, কোথায় গিয়ে পাব সহানুভূতি—মৃদুস্বরে সে বললে।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে, এবং চেয়ারখানা ভাইপোর কাছে সরিয়ে নিয়ে বললেন, আলেকজান্দার শোনো, দেখছি সত্যিই তোমার সঙ্গে কাজের কথাই বলতে হবে, তাহলে বলা যাক, তুমি আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছ

আমি তোমাকে সাহায্য করব। কিন্তু তুমি যা ভাবছ সেভাবে নয়, আর এক শর্তে যে আমার কথা শুনতে হবে। কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সাক্ষী হতে বলবে না —ওতে কোন লাভ নেই। তিনকে তুমি তাল করছ, গল্পটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে—তুমি হাস্যাস্পদ হবে, নয়তো তার চেয়েও খারাপ হবে—তুমি হবে অপমানিত। কেউ এভাবে আসবে না, যদি কোন পাগলকে শেষ পর্যন্ত রাজী করাতে পার কাউন্ট লড়াই করবেন না। আমি তাকে জানি।

তাহলে ওর স্বভাবে কোন আভিজাত্য নেই, আলেকজান্দার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল—ও যে এত হীন তা তো জানতাম না।

হীন নয় তিনি বুদ্ধিমান।

আর আপনার মতে আমি নির্বোধ।

না, না—তুমি প্রেমে পড়েছ—টেনে টেনে বললেন পিওত্র ইভানীচ।

কাকা, যদি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের নির্বুদ্ধিতার কথা বোঝাতে চান, আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তাহলে বৃথা সময় নষ্ট হবে, আমি টলব না।

আমি তা করব না, অনেকদিন থেকেই এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, নীতি হিসাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করাটা বোকামি। তবু লোকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে। বোকা লোকের ত অভাব নেই, তাদের বোঝান যায় না, তবে আমি তোমাকে বলতে চাই যে তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা উচিত নয়।

আমি দেখতে চাই, কি করে আপনি আমাকে বোঝান!

তাহলে শোন। বল তো—কার উপরে তোমার বেশী রাগ, কাউন্টের উপরে, না তার উপরে কি যেন তার নাম—আনিউতা না?

একে আমি ঘৃণা করি, আর তাকে আমি অবজ্ঞা করি, আলেকজান্দার বলে উঠল।

তাহলে কাউন্টকে দিয়েই শুরু করা যাক। ধর, তোমার আহ্বান তিনি গ্রহণ করবেন, এমন কি তুমি একটা বোকা সাক্ষীও জোটাবে—তারপরে! মাছির মতোই তোমাকে কাউন্ট খুন করে ফেলবেন, আর সবাই তখন হাসবে। চমৎকার প্রতিহিংসা! তুমি তো তা নিশ্চয়ই চাও না? তুমি চাও কাউন্টকে ধ্বংস করতে।

কে জানে, কে কাকে হত্যা করবে? আলেকজান্দার বললে।

তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে হত্যা করবেন। আমি যতদূর জানি, তুমি গুলী ছুঁড়তেই জান না, আর নিয়ম অনুসারে তিনিই প্রথম গুলী ছুঁড়বেন।

ভগবান নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করে দেবেন।

যা খুশি বলতে পার—তবে নিশ্চয় ভগবান কাউণ্টের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত করবেন। লোকে বলে পনেরো পা এগিয়ে পিছিয়ে ছুটে যেভাবে হোক একটা লক্ষ্যকে তিনি বার বার বিঁধতে পারেন, আর তুমি ভাবছ ইচ্ছে করে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন, তাই ধর মেনে নিলাম—তুমি তাঁকে হত্যা করলে—তারপর? তাতে কি মেয়েটির প্রেম ফিরে পাবে? না। সে তোমাকে ঘৃণা করবে। তোমাকে পণ্টনে চালান দেবে। আর সব চেয়ে বড় কথা, পরদিন তুমি অনুতাপে চুল ছিঁড়বে, আর তুমি তোমার প্রিয়া সম্পর্কে একেবারে উদাসীন হয়ে যাবে।

আলেকজান্দার বিদ্রূপভরে কাঁধে ঝাঁকুনি দিলে।

কাকা, সে থাকগে, আপনি যখন সবই জানেন, বলুন তো এ অবস্থায় আমি কি করি?

কিছু না, যেমনটি সব আছে তেমনি থাকুক। যে কারণেই হোক সব মাটি হয়ে গেছে।

আমার সুখ তার হাতে ছেড়ে দেব, সে হবে গর্বিত মালিক! কিসের ভয়ে আমি বিরত হব? আমার জ্বালা তো আপনি জানেন না। আমাকে এমন উদাসীন নীতিকথা বলে যদি থামাতে চান, তাহলে বুঝব আপনি কখনো ভালবাসেন নি। আপনার শিরায় শিরায় দুধ বয়, রক্ত বয়ে যায় না।

বাজে কথা থামাও তো! যেন তোমার ঐ মারিয়া আর সোফিয়া যাই-ই বলনা কেন—ওদের মতো গাদা গাদা মেয়ে আর নেই।

ওর নাম নাদেজদা।

নাদেজদা না কি? সোফিয়াটি কে?

সোফিয়া গ্রামে আছে, আলেকজান্দার অনিচ্ছাসত্ত্বে বললে।

তার খুড়োমশাই বলে চললেন, দেখ তাহলে—ওখানে সোফিয়া, এখানে নাদেজদা। আবার আর কোথাও হয়তো মারিয়া আছে। হৃদয় যেন গভীর কূপ—ওর তলায় পৌঁছতে অনেক সময় লাগে। বুড়ো বয়স অবধি শুধু প্রেম করেই যায়।

না, হৃদয় শুধু একবারই প্রেমে পড়ে।

অজ্ঞদের কাছে যা শুনেছ, সেই কথাই তুমি আওড়াচ্ছ। হৃদয় ততদিনই ভালবাসে, যতদিন তার শক্তিগুলি শেষ না হয়ে যায়। তার নিজেরও একটা জীবন আছে—মানুষের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো—তারও যৌবন আছে, বার্ধক্য আছে। যদি ভালবাসা একটি দুর্ভাগ্য আনে, হৃদয় চুপ করে পরেরটির জন্য অপেক্ষা করে। যদি সেটাও না উতরে যায়, যদি প্রেমিক-প্রেমিকাদের বিচ্ছেদ হয়—প্রেমের শক্তি তৃতীয় বা চতুর্থবারের জন্য তেমনি অটুট থাকে, অবশেষে হৃদয় তার সমগ্র শক্তি আর একটি আনন্দিত সাক্ষাৎকারের সময় উজাড় করে দেয়—সেখানে আর বাঁধন থাকে না। তার পরে ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে জুড়িয়ে যায়। প্রথম প্রেমেই কারো কারো সৌভাগ্য দেখা দেয়, তারাই জোর গলায় বলে—একবারই মানুষ ভালবাসে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বুড়ো না হয়েছে যতক্ষণ তার স্বাস্থ্য আছে—

সবসময়ে যৌবনের কথা, দৈহিক ভালবাসার কথাই বলছেন কাকা।

আমি যৌবনের কথা বলছি, তার কারণ জরাগ্রস্ত প্রেম তো এক ভুল, এক খেয়াল। আর দেহজ প্রেম কি? ও জিনিস নেই—যদি থাকে সেটা প্রেম নয়—ঠিক যেমন বিশুদ্ধ আদর্শ প্রেম বলে কিছু নেই। প্রেমে দেহ আর আত্মা সমান ভূমিকা গ্রহণ করে। নয়তো প্রেম পূর্ণ হতে পারে না। আমরা কেউ অশরীরী বা পশু নই। তুমি নিজেই তো বললে—শিরায় দুধ বয়, রক্ত নয়! তাহলে দেখ—একদিকে আমাদের শিরায় রক্ত বয়ে যায় সেটা দৈহিক ব্যাপার; আর একদিকে অহংকার, অভ্যাস, ওগুলো হল আত্মিক। তোমার জন্যে এই তো প্রেম! কি যেন বলছিলাম—ও, হাঁ—তোমাকে পল্টনে চালান দেবে। তাছাড়া, এত হট্টগোলের পরে তোমার তরুণী তোমাকে কাছে ঘেঁসতেও দেবে না। তুমি শুধু তাকে এবং নিজেকে আঘাত করবে—তুমি কি তা বুঝতে পার না? আমার বিশ্বাস প্রশ্নের এই দিকটা বেশ খতিয়েই দেখা গেল। এবার—

পিওতর ইভানীচ খানিকটা মদ ঢেলে পান করলেন।

মূর্খ কোথাকার! আদিয়েভের মদ তো হিম হয়ে গেছে।

আলেকজান্দার নীরব, তার মাথা আনত।

এবার বল তো, দুহাতে গেলাসটা ঘসে-ঘসে গরম করতে-করতে বলে

চললেন, কি কারণে তুমি কাউন্টকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাও?

আমি তো বলেছি, আমার সুখ কি সে ধ্বংস করেনি? সে এক বর্বর পশুর মতো এসে পড়ল—

পাছে, বাধা দিলেন খুড়োমশাই।

আর এসে সব চুরি করে নিয়ে গেল, আলেকজান্দার বললে।

চুরি করেননি, তিনি এলেন, যা চান তা-ই নিয়ে নিলেন। তোমার সুন্দরী কুমারীটি মুক্ত কিনা সে কথা তিনি কেন জানতে চাইবেন? সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ প্রেমিক প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি যে ক্রুদ্ধ হয়ে যে বোকামি করে আসছে, আমি তার মানে বুঝতে পারি না। ধরাপৃষ্ঠ থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেব—এর চেয়ে বোকামি আর কি হতে পারে? কেন? সহজ কথা হচ্ছে, তিনি জানেন কি করে প্রিয় হতে হয়। এ যেন তাঁরই দোষ, তাঁকে শাস্তি দিয়েই যেন ব্যাপারটার সুরাহা হবে। আর তোমার কি যেন নাম—কাতিয়েস্কা না?—সে কি তাঁকে বাধা দিয়েছিল? সে কি বিপদ এড়াবার কোন চেষ্টা করেছিল? স্বেচ্ছায় সে ধরা দিয়েছে, তোমার ভালবাসা ভুলে গেছে। তাহলে আর তর্ক করে লাভ কি? অতীতকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। তোমার দাবির জন্ত জেদ করা তো একগুঁয়েমি ছাড়া আর কিছুই নয়। স্ত্রীর কাছ থেকে বিশ্বস্ততা দাবি করার তবু মানে আছে—একটা শপথ গ্রহণ করা হয়েছে, পরিবারের মঙ্গল তার উপর নির্ভর করছে। কিন্তু সেখানেও মানুষ দাবি করতে পারে না যে, স্ত্রী আর কাউকে ভালবাসবে না, শুধু এই দাবি করতে পারে যে তার ভালবাসা উচিত নয়, তুমি তো এ সবই জান। তুমি কি নিজে তাকে কাউন্টের হাতে তুলে দাওনি? তাকে ফিরে পেতে চেষ্টা করেছ কি?

আমি তাই-ই চাই, আলেকজান্দার লাফিয়ে উঠে বললে, আর আপনি আমার এই মহৎ ইচ্ছাকে বাধা দিচ্ছেন।

খুড়োমশাই বলে উঠলেন, হাতে লাঠি নিয়ে তাকে ফিরে পেতে চাও? আমরা তো কিরঘিজের তৃণভূমিতে বাস করিনা, সভ্য পৃথিবীর অন্ত হাতিয়ার আছে, সময় থাকতে তোমার সেটা তুলে নেওয়া উচিত ছিল—আর সম্পূর্ণ

অন্ত ভাবে—কাউন্টের সঙ্গে অত রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা উচিৎ ছিল এবং সেটা তোমার প্রিয়ার সামনে।

আলেকজান্দার খুড়োমশাইয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কি রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ? সে শুধাল।

মিনিট-খানেকের ভিতরেই বলছি, এতদিন কি রকম ব্যবহার করেছ?

অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সব রকম ঘটনা বর্ণনা করে, মুখভঙ্গী করে আলেকজান্দার তাঁকে সম্পূর্ণ কাহিনীটি বর্ণনা করল।

দেখছ তো? তোমারই সব দোষ, পিওত্র ইভানীচ বললেন তুমি কত বোকামি করেছ! আলেকজান্দার, কেন তুমি এখানে এলে? এরই জন্ত কি আসা উচিত হয়েছে? লেকের পারে মামীর সঙ্গে বাড়িতে বসেও এসব করতে পারতে। কি করে এমন ছেলেমানুষী করলে—উঃ আজকাল কে এরকম করে, যদি তোমার—কি যেন নাম তার—জুলিয়া না—কাউন্টকে সে যদি সব বলে থাকে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—সে ভয় নেই, সে নিশ্চয়ই যথেষ্ট চতুর, যখন কাউন্ট তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন হয়তো তাঁকে বলেছে—

কি বলবে? আলেকজান্দার তাড়াতাড়ি বললে।

যে সে তোমাকে বোকা বোনিয়েছে, তুমি যে তাকে ভালবাস, তুমি একটা উপদ্রব-বিশেষ, ওকে শুধু-শুধু বিরক্ত কর—ওরা এমনি বলে থাকে তা জানো বোধ হয়।

আপনি কি মনে করেন সে একথা বলেছে? আলেকজান্দার বিবর্ণ হয়ে শুধালে।

নিশ্চয়ই, তোমরা দুজনে বাগানে কি করে হলুদ ফুল তুলেছিল সেকথা বলবে বলে ভেবো না? উঃ তুমি কি বোকা!

কিন্তু কাউন্টের সঙ্গে কি রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আমি করব? আলেকজান্দার অধৈর্য হয়ে বলল।

বলছি, তুমি ওঁকে এড়িয়ে যাবে না, ওকে দেখে মুখ বাঁকাবে না, বরং ওর ভদ্রতার উত্তরে দ্বিগুণ, তিনগুণ, দশগুণ ভদ্রতা করবে......আর তুমি—তাকে চটিয়ে দেবে না তোমার কি যেন তার নাম—নাদিয়া না। (এবার ঠিক বলেছি—তাই না?) গালাগাল করে উপহাস করে বরং তার খেয়াল-খুশি

মতো চলতে—এমন ভান করতে যেন কিছুই লক্ষ্য করছ না, কোন সন্দেহ করছ না, ও জিনিসটাকে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে করছ। ওদের এমন করে অন্তরঙ্গ হতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি—ওদের বিশ্রাম্ভালাপে তোমার বাধা দেওয়া উচিত ছিল—সর্বত্র হঠাৎ ওদের সঙ্গে গিয়ে জুটতে—ওরা যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেত, কৌশলে ওর সামনেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধং দেহি বলে আহ্বান করতে—একেবারে যুক্তি আর কৌশলের তোড় বইয়ে দিতে—তারপরে প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্বল স্থানে আঘাত করে তাকে প্রকাশ করে দিতে—কিন্তু কখনো দেখাতে না যে কিছু মনে করে এসব করছ - ভালমানুষের মতো, এমন কি অনিচ্ছাসত্ত্বেই করছ এই ভান করে সুন্দরী মেয়ের কাছে একজন তরুণ যে আড়ম্বরের গুমোর দেখায়, আস্তে আস্তে সে গুমোর ভেঙে দিতে। তোমার নজর রাখা উচিত ছিল—তার কোন গুণ মেয়েটির মনে ধরেছে, তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে—তারপরে সেই গুলোর উপরই আক্রমণ চালাতে, ওগুলো সাধারণ গুণ বই কিছুই নয় প্রমাণ করে দিতে—ওকে হেয় করে দিতে—দেখিয়ে দিতে যে নতুন এই নায়কটির বিশেষত্ব কিছুই নাই, শুধু তার সুমুখে জাঁক করে বেড়াচ্ছে। এসব ব্যাপার ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ধৈর্য ধরে নিপুণভাবে করা উচিত ছিল——আমাদের যুগে এইটেই সত্যিকারের দ্বন্দ্বযুদ্ধ, কিন্তু তুমি সে যুদ্ধে অক্ষম।

এই বলে পিতর ইভানীচ মদের পাত্র নিঃশেষ করে, আর এক গেলাস ঢেলে নিলেন।

এতো হীন চাতুরী! ছলনা দিয়ে নারীকে জয় করার চেষ্টা করতে হবে—আলেকজান্দার ক্রুদ্ধ হয়ে বলল।

লাঠিবাজি করা কি এর চেয়ে ভাল? ছল করে ভালবাসা রাখা যায়—জোর করে নয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছেটার কথা বুঝতে পারি। যে-মেয়েকে ভালবাসা যায়, তাকে ধরে রাখার চেষ্টা তো স্বাভাবিকই বটে, এবং আশংকা করে সর্বনাশকে বাধা দেওয়া চেষ্টা করা অন্যায়ও নয়। কিন্তু আর একজন প্রেম সঞ্চার করেছে বলে তাকে পিটানো তো যে জিনিসে তুমি ধাক্কা খেয়ে আহত হলে, তাকে আঘাত করার সামিল যেমন ছেলেপিলেরা করে থাকে। তুমি যাই-ই বল না কেন,

কাউকে কোনো অন্যায়ই করেন নি। আমি যতদূর বুঝি—তুমি প্রেমের রহস্য সম্পর্কে কিছুই জান না তাই তোমার প্রেমের ব্যাপার আর উপন্যাস দুই-ই নিকৃষ্ট।

প্রেমের ব্যাপার, আলেকজান্দার বিদ্রূপভরে মাথা নাড়ল, যে প্রেম কৌশলের দ্বারা অনুপ্রাণিত, তা কি মধুর বা স্থায়ী হতে পারে?

জানিনা মধুর কিনা, তুমি কি রকম ভাবছ তারই উপর সেটা নির্ভর করে। আমি সেটা ভাবিই না। তুমি তো জান ভালবাসা সম্পর্কে আমার খুব একটা উঁচু ধারণা নেই। আমি প্রেম ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু এটা যে বেশী স্থায়ী তা সত্যি। হৃদয়ের ব্যাপারে তোমাকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে, তাতে দোষের কিছু নেই। যন্ত্রটা ভারী কোমল, কি করে বাজাতে হবে জানা না থাকলে কি সুর যে বের হবে একমাত্র ভগবান জানেন। যে ভাবে ইচ্ছা ভালবাসা প্রকার কর কিন্তু তাকে রাখতে হবে মনের সাহায্যে। মনেরই একটা বৃত্তি হল চাতুরী তাতে ঘৃণার কিছু নেই। তুমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপমান করবে না—তার নিন্দেও কোরো না—তাতে তোমার প্রেমিকাকে তোমার বিরুদ্ধেই নিয়ে যাওয়া হবে। তোমার প্রেমিকাকে যেসব জাঁক দেখিয়ে সে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, সেগুলি খসিয়ে ফেলতে হবে, যাতে মেয়েটিকে দেখাতে পার যে লোকটা একটা সাধারণ মানুষ, নায়ক নয়। নিজের সম্পত্তি কৌশলে রক্ষা করা তো ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে হয়। যুদ্ধে এ সব ব্যাপার অন্যায় নয়। তুমি বিয়ে করতে চাও—স্বামী হিসেবে তুমি চমৎকারই হবে, স্ত্রীকে দিয়ে আচ্ছা সব কাণ্ড করাবে—আর প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের সামনে লাঠি ঘুরাবে—সেটা তো বোকামী।

পিতর ইভানীচ হাত দিয়ে কপালে টোকা দিলেন।

তোমার ভেরেকা তোমার চেয়ে শতগুণে বুদ্ধিমতী মনে হয় তাই এক বছর অপেক্ষা করার কথা বলেছিল।

কিন্তু কৌশল জানলেই কি আমি তা ব্যবহার করতে পারতাম? আমার মত এমন করে যেন কেউ ভালবাসে না। এমন অনেক মানুষ আছে যারা মাঝে মাঝে উদাসীন হবার ভান করতে পারে, যারা ইচ্ছে করেই কয়েকদিন আসে না—তাতে কাজও হয় কিন্তু আমি তো তা পারি না।

ভান আর গণনা কি করে করব, যখন তাকে দেখা মাত্র আমার নিশ্বাস ফুরিয়ে যায়, আমার হাঁটু থর থর করে কাঁপতে থাকে, যাকে দেখার জন্য যে কোনো যন্ত্রণা আমি সইতে রাজী। না, আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে আত্মার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসায় যে আনন্দ তাতে যদি দুঃখও পেতে হয় সেও ভাল—কিন্তু নিজে ভাল না বেসে ভালবাসা পাব, নয়তো নিজের আমোদের জন্য ভালবাসব তা হবে না। সে এক হীন পদ্ধতি যেমন পোষা-কুকুরের সঙ্গে মানুষ খেলা করে, তেমনি একটি মেয়ের সঙ্গে খেলা করব, তারপরে তাকে প্রত্যাখ্যান করব—তা হয় না।

পিতর ইভানীচ কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন।

তিনি বললেন, যদি তাতে আনন্দই পাও তবে দুঃখ ভোগ কর। উঃ গ্রামগুলো কি! হায় এশিয়া! তোমার প্রাচ্যে বাস করা উচিত ছিল, ওরা এখনো মেয়েদের কাকে ভালবাসতে হবে বলে দেয়—যদি তারা অসম্মত হয় তাদের ডুবিয়ে মারে। কিন্তু এখানে—আপন মনেই সব তিনি বলে চললেন—যদি কোন মেয়েকে নিয়ে সুখী হতে চাও, অবশ্য তোমার মত সুখী নয়—পাগলের মতো নয়—বুদ্ধিমানের মতো, তাহলে বহু জিনিসের দরকার। আগে থেকে ভাবা ছক অনুসারে সুশৃঙ্খল ভাবে একটি মেয়েকে বালিকা থেকে নারীতে পরিণত করতে জানতে হবে। যদি তার প্রেমের পরিণতি এনে দিতে চাও, তাকে এক যাদুবৃত্তে ঘিরে রাখ, সেটা খুব সংকীর্ণ হলে চলবে না। তার সীমানা যেন নজরে না পড়ে। শুধু নিপুণতার সঙ্গে তার হৃদয় অধিকার করলেই চলবে না—সেটা কিছুই নয়, অনিশ্চিত ব্যাপার স্থায়ীও নয়—তার মনকেও দখল করতে হবে, তার ইচ্ছাশক্তিকেও জয় করতে হবে—তোমার নিজের ছাঁচে রাখতে হবে তার রুচি আর নীতিবোধ, যাতে সে তোমার চোখ দিয়ে দেখতে পায়, তোমার মন দিয়ে ভাবতে পারে।

অন্য কথায়, তাকে স্বামীর হাতের পুতুল বা একান্তবাধ্য দাসী করে তোলা হোক। আলেকজান্দার বাধা দিয়ে বলল—

তা কেন? এমন ভাবে কাজ করবে, যাতে তার নারীত্ব বা তার গুণগুলি বদলে না যায়। তার নিজের গণ্ডীতে তাকে স্বাধীন থাকতে দাও, কিন্তু দেখবে যাতে তোমার অনুসন্ধানী মন ওর প্রতিটি গতি, তার দীর্ঘনিশ্বাস, তার কাজ, তার প্রতিটি স্পন্দন, প্রতিটি ইচ্ছা, আবেগের প্রতিটি

লক্ষ্য সর্বত্র সবসময় বাইরে উদাসীন কিন্তু ভিতরে স্বামীর সজাগ দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। বিন্দুমাত্র উৎপীড়ন না করে চিরস্থায়ী শাসনে রাখতে হবে। কিন্তু কৌশলে তার অলক্ষ্যে তাকে নিজের ইচ্ছামতো চালাবে। তার জন্যে চাই বিজ্ঞ বেদনাদায়ক শৃংখলা—তিনি অর্ধপূর্ণ কাশি কেসে মদের পাত্র এক চুমুকে শেষ করলেন।

তিনি বলতে লাগলেন, এমনি হলেই স্ত্রী যদি পাশেও না থাকে, তবু স্বামী শান্তিতে ঘুমোতে পারে অথবা স্ত্রী যখন ঘুমে তখন উদ্বেগহীন ভাবে পড়ার ঘরে বসে থাকতে পারে।

হায়, এই হচ্ছে দাম্পত্য সুখের সেরা রহস্য! চাতুরী করে মন, হৃদয় আর নারীর ইচ্ছাকে নিজের সঙ্গে বেঁধে রাখা—আর তাতেই আনন্দ করা, গৌরব করা এই তো সুখ! ধরুন যদি মেয়েটি সব টের পায়।

তারিফ করতে যাবে কেন? খুড়োমশাই বললেন, তার দরকার নেই।

আলেকজান্দার বললে, কাকা, আপনি অফিস ঘরে উদ্বেগহীন হয়ে বসে আছেন, আর কাকিমা ঘুমোচ্ছেন—এই ব্যাপার থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এই লোকটি—

চুপ! হাত নেড়ে বারণ করলেন খুড়োমশাই! আমার স্ত্রী ঘুমোচ্ছেন, ভালই হয়েছে—নাহলে জান তো—

ঠিক এমন সময় পড়ার ঘরের দরজাটা খুলে গেল আস্তে কিন্তু কাউকে দেখা গেলনা।

আর স্ত্রী-হলঘর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল—কখনও জানতেও দেবে না যে সে তার স্বামীর এই চমৎকার শৃংখলার কথা বোঝে ও নিজের একটা পদ্ধতিতে সে চলে এবং এক বোতল মদ নিয়ে বসে তা নিয়ে বকবক্ করে না।

দুজন আছুরে ভাই দরজার দিকে ছুটে গেলেন, হলে দ্রুত পদক্ষেপ আর ঘাঘরার খস খস শব্দ শোনা গেল—তারপরে সব স্তব্ধ।

খুড়ো আর ভাইপো পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন।

কাকা? একটু থেমে ভাইপো বললে।

ও কিছু না, ভ্রু কুঁচকে বললেন পিওত্র ইভানীচ—আমার বড়াই করা উচিত হয়নি। শোনো আলেকজান্দার বিয়ে কোরোনা, যদি বা কর,

বোকা মেয়েকে বিয়ে করবে। কখনো চতুর মেয়েকে তুমি সামলাতে পারবেনা! তাতে বেশী চতুরতা দরকার।

একটু ভেবে নিল খুড়োমশাই, তারপর হঠাৎ কপাল চাপড়ালেন। বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, উনি যে তোমার এই দেরী করে আসাটা টের পাবেন ভাবতেও পারিনি। পাশের ঘরে দুজন পুরুষ মানুষ বসে গোপন কথা বললে কি আর কোনো মেয়ের চোখে ঘুম আসে! সে নিশ্চয়ই ওর দাসীকে পাঠাবে, নয়তো নিজেই আসবে। আগে বুঝতে না পারাটা বোকামিই হয়েছে। এ তোমার আর অভিশপ্ত লেকাইট মদের দোষ! আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে! বিশ বছরের মেয়ের কাছ থাকে এই শিক্ষা পেতে হল।

কাকা, আপনি কি ভয় পেয়েছেন?

ভয়? একটুও না। আমি ভুল করেছি—মাথা খারাপ করলে চলবেনা। একটা উপায় ঠাওরাতেই হবে। আবার ভাবতে বসলেন। একটু থেমে বললেন, উনি বড়াই করে গেলেন। ওঁর কি পদ্ধতি থাকতে পারে? ওর কোনো পদ্ধতি থাকতে পারে না। ওঁর বয়েস কম। বিরক্ত হয়েছেন বলেই ওকথা বললেন। উনি মাতৃমূর্তি দেখেছেন, এখন থেকে আরো চতুর হবেন। মেয়েদের স্বভাব আমি জানি, দেখা যাক।

বিজয়ীর হাসি হাসলেন, তাঁর কপালের বলিরেখা মিলিয়ে গেল।

এবার ভিন্ন উপায় গ্রহণ করতে হবে, বললেন, আগেকার উপায় চলবে না। এখন আমাকে—হঠাৎ থেমে পড়ে উদ্বিগ্নভাবে দরজার দিকে তাকালেন।

বললেন, যাক, যা হবার হবেই, এবার তোমার কথাটা নিয়ে পড়া যাক আলেকজান্দার, কি যেন আমরা বলছিলাম? ও-হাঁ—তুমি বলছিলে, মেয়েটিকে খুন করার ইচ্ছা হয়েছিল—কি যেন মেয়েটির নাম?

আলেকজান্দার গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, আমি এর জন্য তাকে খুবই ঘৃণা করি।

দেখছ তো? এরই মধ্যে, তোমার অর্ধেক অসুখ সেরে গেছে। কিন্তু এটা কি সত্যি কথা? এখনো তুমি বোধ হয় রেগে আছ। যাকগে,

তাতে কি—ওকে ঘৃণা করতে থাক, এই অবস্থায় এইটেই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। আমি আর একটা কিছু প্রস্তাব বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আর বলবনা।

ঈশ্বরের দোহাই, বলুন! আলেকজান্দার বললে, আমার ভিতরে আর বিচারবুদ্ধির কণা মাত্র নেই। আমি ভুগছি, আমি মরে যাচ্ছি—আমাকে কিছু আপনার নিরুত্তাপ বিচারবুদ্ধি ধার দিন। এমন কিছু বলুন, যাতে আমার আহত হৃদয় শান্তি পায়।

যদি তা করি, তুমি আবার তার কাছে ছুটে যাবে!

কি যে বলেন! এর পরেও—

মানুষ এর চেয়ে খারাপ ব্যবহার পেলেও যায়। তুমি কি আমাকে কথা দেবে, যে তুমি কখনও যাবে না?

যদি আপনার ইচ্ছে হয়, আমি শপথ করব।

না—কথা চাই—সেটাই শ্রেয়।

কথা দিলাম।

বেশ, তাহলে আমরা ঠিক করলাম—কাউন্টের কোন দোষ নেই।

বেশ, তারপর?

'তোমার'—সেই যে কি তার নাম—সে কি করেছে।

নাদিয়া, আলেকজান্দার অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল—নাদিয়া তো কিছুই করেনি?

নিশ্চয়ই না! কি সে করেছে আমাকে বল দেখি! তোমার তাকে ঘৃণা করার কোন কারণ নাই।

সে কিছুই করে নি? না খুড়ো, এ একটু বেশী বলা হচ্ছে। বলুন, কাউন্ট...জানত না · তবু... কিন্তু নাদিয়া? তাহলে দোষ কার? আমার?

অনেকটা তাই বটে, সত্যি কথা বলতে গেলে কাউকেই দোষ দেওয়া যায় না, বল তাকে কেন তুমি ঘৃণা কর?

নীচ কাজের জন্ম।

সেটা কি?

আমার এই মহান অসীম আবেগের বদলে সে আমাকে দিয়েছে অকৃতজ্ঞতা।

কি জন্ত সে কৃতজ্ঞ হবে? তার নিজের জন্ত কি তুমি তাকে ভাল বেসেছিলে? তুমি তার উপকার করতে চেয়েছিলে—তাই কি? তাহলে ওর যার সঙ্গে প্রেমে পড়লেই পারতে।

আলেকজান্দার তাঁর দিকে তাকালে, সে কিছু বলার পেল না।

তোমার অনুভূতির সকল শক্তি ওকে দেখানো উচিত হয়নি। পুরুষ যখন সব কথা বলে ফেলে, মেয়েরা জুড়িয়ে যায়। ওর হাবভাব বুঝে তোমার কাজ করা উচিত ছিল,ওর পায়ে ল্যাপকুকুরের মতো লুটিয়ে পড়া ঠিক হয়নি। যে ব্যবসায় অংশীদার তার চরিত্রকে কি কেউ উপেক্ষা করতে পারে? তোমার প্রথমেই আবিষ্কার করা উচিত ছিল—ওর কাছে এর বেশি আশা করা চলে না। সে তোমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত রোমান্স করেছে, কাউন্টের সঙ্গেও অমনি করবে, হয়ত আরো কারো সঙ্গেও করবে। ওর কাছে এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না। এই ওর ক্ষমতার সীমারেখা। আর কিছু নেই ওর। আর তুমি কি ভেবেছিলে ঈশ্বরই জানেন।

কেন সে আর একজনকে ভালবাসবে? আলেকজান্দার বিষণ্ণভাবে বাধা দিলে।

বটে! এই তাহলে ব্যাপার, সে আরেকজনকে ভালবেসেছে! চমৎকার প্রশ্ন! ওরে বর্বর। তুমি কেন ওকে ভাল বেসেছিলে? এস, এবার এই মুহূর্তে প্রেম বাতিল করে দাও।

সেটা কি আমার উপর নির্ভর করে?

আর কাউন্টের সঙ্গে প্রেমে পড়া কি তার উপর নির্ভর করে? তুমি বল, অনুভূতি দাবিয়ে রাখতে নেই—কিন্তু যখনই নিজে আঘাত পেলে অমনি জিজ্ঞেস করছ কেন সে অপরকে ভালবাসল? সে কেন মরে গেল, ওর প্রেম মন থেকে সরে গেল কি করে? এসব প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়া যায়? প্রেমের এক সময়ে না এক সময়ে মৃত্যু হবেই—চিরদিন সমান চলতে পারে না।

পারে, পারে! আমার হৃদয়ের সে শক্তি আমি অনুভব করি—আমি চিরন্তন প্রেম নিয়ে ভালবাসতে পারতাম।

হাঁ, কেউ যদি তোমাকে সত্যিকারের ভালবাসত, তুমি অমনি ছুটে পালাতে। তোমরা সবাই অমনি—আমি তোমাদের চিনি।

যদি তার ভালবাসা শেষ হয়ে গিয়েই থাকে, আলেকজান্দার বললে তাহলেও এমন ভাবে হবে কেন?

তাতে কি এসে গেল? তুমি ভালবাসা পেয়েছিলে, সুখী হয়েছিলে—এই তো সব।

ও অন্যের কাছে নিজেকে সঁপে দিলে! আলেকজান্দার ম্লান হয়ে গেল।

তুমি কি চাইতে অপরকে ভালবাসত, আবার তোমার উপর ভালবাসা আছে তার প্রতিশ্রুতিও দিত? এখন বলতো তার কি করা উচিত ছিল, কি জন্য তাকে দোষ দেব?

আমি এর শোধ নেব! আলেকজান্দার বললে।

তুমি অকৃতজ্ঞ, ইভানীচ বললেন। এ সব ভাল নয়; একটি মেয়ে তোমার সঙ্গে যত খারাপ ব্যবহারই করুক, যতই প্রতারণা করুক, বা উদাসীন হোক—কবিরা যা বলেন—সেই ছলনাও করুক তুমি প্রকৃতিকে দোষী করতে পার। ইচ্ছে হয়তো দার্শনিক ভাবধারায় ডুবে যেতে পার, পৃথিবীকে, জীবনকে বা যাকে খুশি অভিশাপ দিতে পার, কিন্তু কাজে বা কথায় একটি মেয়েকে আঘাত করতে যেয়ো না। মেয়েদের বিরুদ্ধে শুধু একটি হাতিয়ার চালাতে হবে, সেটা হল তাদের প্রশ্রয় দেওয়া, নয়তো ভুলে যাওয়া। ভদ্রলোকে এর চেয়ে বেশী করতে পারে না। মনে করতো দেড় বছর আগে তোমার সুখের জন্য সবাইকে কেমন বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছিলে, আনন্দে কি যে করবে ভাবতে পারনি। আঠারো মাসের নিরবচ্ছিন্ন সুখ পেয়েছিলে। যাই-ই বল না কেন, তুমি অকৃতজ্ঞ।

কাকা, আমাদের কাছে প্রেমের মত পবিত্র কিছু নেই! প্রেম ছাড়া জীবন জীবনই নয়!

আঃ পিওত্র ইভানীচ চটে গেলেন, তুমি আমাকে বিরক্ত করে তুলেছ।

আলেকজান্দার বললে, নাদেঙ্কাকে আমি পূজা করতাম। কারো সুখকে আমি ঈর্ষ্যা করতাম না। সারাজীবন নাদেঙ্কাকে নিয়ে কাটাব এই স্বপ্নই দেখেছিলাম, আর এখন?…কোথায় সেই বিরাট মহান আবেগ যার স্বপ্ন দেখেছিলাম? সে তো এখন এক দীর্ঘনিঃশ্বাস, নাটকীয় দৃশ্য, ঈর্ষ্যা, মিথ্যা আর ছলনার এক লিলিপুটীয় প্রহসনে পরিণত হ'ল, হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর।

যে জিনিসের অস্তিত্ব নেই সেটা কল্পনা কর কেন? তোমাকে বলিনি,

সব সময়ে তুমি চেয়েছ কল্পিত জীবন কাটাতে? তোমার মতে মানুষের একমাত্র পেশাই হল প্রেমিক, স্বামী বা পিতা হওয়া—তুমি আর কিছু জানবে না। কিন্তু এগুলো তো আছেই—তাছাড়া মানুষ হচ্ছে দেশের নাগরিক—সমাজে তার মর্যাদা আছে, করবার মতো কাজ আছে—সে লেখক, জমিদার, সৈনিক, সরকারী হোমরা-চোমরা বা শিল্পপতি যাই-ই হোক না কেন…আর তোমার কাছে এসব তো ভালবাসা আর বন্ধুত্বে ঢাকা পড়ে গেছে। কি এক স্বর্গে তুমি আছ! নভেল মগজে ঠেসে, গ্রামে মাসীর কথা শুনে, সেই ভাবধারাগুলো এখানে নিয়ে এসেছ। এখন আবার 'মহান-আবেগ' আবিষ্কার করলে!

হাঁ—সে তো মহানই।

থাক, ঢের হয়েছে; সত্যিই কি মহান আবেগ বলে কিছু আছে?

কি?

আছে কিনা বল? আবেগ মানে কি কোনো অনুভূতি বা উৎসাহ বা অনুরাগ বা এমন একটা অবস্থা, যখন আর বিচার-বুদ্ধি দিয়ে কোন কাজ হয় না? সেখানে মহত্ত্ব কোথায় জিজ্ঞেস করি? নিছক পাগলামিতে কোনো মনুষ্যত্ব নেই। তুমি শুধু একটা দিকই দেখবে কেন? আমি এখন প্রেমের কথা বলছি। অন্য দিকে চাও—দেখবে প্রেম খারাপ জিনিস নয়। সেই সব সুখের দিনের কথা মনে কর, যখন তুমি আমার কান কালা করে দিয়েছিলে—

উঃ আমাকে সেকথা মনে করিয়ে দেবেন না, মনে করিয়ে দেবেন না! আলেকজান্দার ক্ষিপ্তের মত হাত নেড়ে বললে, আপনার এরকম কথা বলা ঠিকই, আপনি যাকে ভালবাসেন তার সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত; আমার মত অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন দেখার বড় ইচ্ছে ছিল।

কে—আমি। আমি কাজ করে ভুলতে চাইতাম। কাল আমার সঙ্গে চল!

আলেকজান্দার বিমর্ষ হয়ে বললে, আপনার আর আমার মত কখনো মিলবে না। আপনার জীবন সম্পর্কে মত আমাকে সান্ত্বনা দেয় না, বরং আমার বিতৃষ্ণা জাগায়। আমি দুঃখে ডুবে আছি—আমার হৃদয় স্থির হয়ে

গেছে। একদিন প্রেমই আমাকে এই হিম-শীতলতা থেকে রক্ষা করেছে। এখন প্রেম চলে গেছে, আমার বুকে এখন শুধু দুঃখ। আমি ভীত ও নিঃস্ব আমার—

কাজ নিয়ে মেতে থাক।

কাকা, সেকথা সত্য। আপনি এবং আপনার মত মানুষরাই এমনি যুক্তি দেখাতে পারে। আপনি স্বভাবতঃই শীতল, আপনার আত্মায় আবেগ আসতে পারে না…

আর তুমি ভাবছ, তোমার আত্মা সাহসী! কাল ছিলে সপ্তমস্বর্গে—আর সামান্য এইটুকুতেই একেবারে পতন হ'ল। তুমি দুঃখ সইতে পার না।

বাহবা, বাহবা! আলেকজান্দার ক্ষীণ স্বরে বললে, নিজের মত সে সমর্থন করতে পারছে না, আপনি যেন রেলের উপর দিয়ে চলা ইঞ্জিনের মতো ভাবেন, অনুভব করেন আর কথা বলেন স্থিরভাবে সহজভাবে।

সেটা তো খুব খারাপ নয়। পথের বাইরে ছিট্‌কে পড়ে একটা নর্দমায় গিয়ে পড়ার চেয়ে তো ভাল—যেমন তুমি করেছ—আর উঠতেই পারছ না। বাপ্, বাপ্! বাষ্প তো মানবতার পক্ষে এক সম্মান। এই আবিষ্কারে এমন এক সূত্র আছে যা তোমাকে আমাকে মানুষ করে তুলেছে। পশুও দুঃখে মারা যেতে পারে। এমন অনেক কুকুরের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে যারা প্রভুর কবরের উপর মরে পড়ে আছে যা বহুদিন বিচ্ছেদের পরে মিলনের আনন্দেও মারা গেছে। ওতে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে! তুমি নিজেকে হয়তো একজন উঁচুদরের মানুষ, এক অসামান্য মানুষ বলে ভাব—

পিওত্র ইভানীচ ভাইপোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলেন, ওকি! তুমি নিশ্চয়ই কাঁদছ না? তিনি বলে উঠলেন, তার মুখখানি লাল হয়ে উঠল।

আলেকজান্দার নিরুত্তর, তার খুড়োর শেষ যুক্তি পায়ের তলা থেকে একেবারে মাটি সরিয়ে নিলে। এর বিরুদ্ধে বলার আর কিছুই নাই, শুধু এখনকার এই অনুভূতি প্রভাবিত করল ওর মন। তার মনে পড়ল তার হারানো সুখের কথা—চোখের জল ঝরঝর ধারে গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, পিওত্র ইভানীচ বলে উঠলেন। তুমি কি পুরুষ! দোহাই ঈশ্বরের, অন্য কোথাও গিয়ে কাঁদো।

বাবা, আপনার যৌবনের দিনগুলির কথা মনে করুন; আলেকজান্দার ফুঁপিয়ে উঠল। নিয়তি মানুষকে যে চরম অপমান হানতে পারে, আপনি কি তা শান্তভাবে সইতে পারতেন? দেড় বছর এমন জীবন কাটাবার পর হঠাৎ সব চলে গেল! আর কিছুই রইল না। সেই একনিষ্ঠা কোথায় গেল—রইল চাতুরী, গোপনতা, উদাসীনতা; হা ঈশ্বর—এর চেয়ে কি বড় যন্ত্রণা আছে? অন্যকে বলা সহজ—তুমি প্রতারিত হয়েছ, কিন্তু তা অনুভব করা কি সহজ? উঃ সে কি বদলে গেছে। কাউন্টের জন্য সে নিজেকে সাজাত! আমি কখনো গেলে সে ম্লান হয়ে যেত—কথা বলতে পারত না, মিছে কথা বলত—ওঃ ওঃ

চোখের জল আরো প্রবলবেগে বইতে লাগল।

সে বললে, যদি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম ঘটনাচক্রে আমি তাকে হারিয়েছি, বাধ্য হয়ে সে এমন কাজ করেছে·· অথবা সে মারা গেছে ···তা সহ্য করাও বুঝি সহজ হত····কিন্তু না, না—এ যে ভয়ঙ্কর, অসহ্য! চোরের হাত থেকে তাকে তো মুক্ত করার উপায় নেই। আপনি আমাকে আমার হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করেছেন, আমি কি করব? আমাকে শিখিয়ে দিন। আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, আমি দুঃখ পাচ্ছি—ব্যথা, মনস্তাপ। আমি মরব, নিজেকে গুলী করব!

টেবিলের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে দুহাতে মাথা চেপে জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পিতর ইভানীচ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ঘরে একবার কি দুবার পায়চারী করে বেড়ালেন, তারপর আলেকজান্দারের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাথা চুলকোচ্ছেন, কি করবেন বুঝতে পারছেন না।

আলেকজান্দার, একটু মদ খাও—যতদূর সম্ভব সস্নেহে বলা সম্ভব বললেন—হয়তো এটা—

আলেকজান্দার যে তাঁর কথা শুনেছে তার একমাত্র চিহ্ন দেখা দিল মাথা আর কাঁধের প্রচণ্ড আন্দোলন। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পিতর ইভানীচ ভ্রূকুটি করে হতাশভাবে হাত নাড়লেন, তারপর ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

আলেকজান্দারকে নিয়ে আমি কি করব? তিনি তার স্ত্রীকে বললেন,

ওখানে বসে কাঁদছে—ঘরে থাকা সম্ভব হল না। আমাকে একেবারে ঘাবড়িয়ে তুলেছে।

আর তুমি কিনা ওকে ফেলে চলে এলে? তিনি শুধালেন, আহা বেচারী! আমি ওর কাছে যাব।

কিছু করতে পারবে না—এ ওর স্বভাব। ঠিক ওর মাসীর মত। তিনি তো একটি ছিঁচকাঁদুনী মেয়ে। আমি ওর সঙ্গে তর্ক করছিলাম।

শুধুই তর্ক করলে?

ওকে বোঝালাম। ও আমার মতে সায় দিলে।

তা নিশ্চয়ই পেরেছ। তুমি ভারি চালাক—ভারি ধূর্ত—তিনি বললেন।

ঈশ্বরকে তার জন্যে ধন্যবাদ! আমার তো ঐটেই সবচেয়ে দরকারী বলে মনে হয়।

তুমি তো তাই ভাবছ, কিন্তু ও যে কাঁদছে।

আমার এটা দোষ নয়, ওকে সান্ত্বনা দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

কি করলে?

ঢের, ঢের! একঘন্টা ধরে এক নাগাড়ে বকবক করেছি—আমার গলা তো একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল। সব সেই প্রেমের মতবাদ নিয়ে—সব বিশদ ব্যাখ্যা করলাম। টাকা দিতে চাইলাম—সাপার—একটু মদ খেতেও বললাম—

আর সে কেঁদেই চলল?

হাউ হাউ করে কান্না! ক্রমেই আরো খারাপ দিকে যাচ্ছিল।

অবাক কাণ্ড! আমি ওর কাছে যাই। কি করতে পারি দেখি ইতিমধ্যে তোমার নতুন উপায়টিও ভেবে রাখতে পার।

সেটা আবার কি?

কিন্তু তিনি ছায়ার মত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

আলেকজান্দার তখনো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। কে যেন এসে তার কাঁধ ছুঁল। সে মাথা তুললে। তার সুমুখে একটি সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে। তার পরনে ড্রেসিং গাউন আর সুন্দর এক টুপি।

কাকী—সে চেঁচিয়ে উঠল।

তিনি ওর পাশে বসে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েরাই অমনি

তাকাতে পারেন, তারপরে নিজের রুমাল দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দিয়ে কপালে চুমু খেলেন। ওঁর হাতের উপর আলেকজান্দার তার ঠোঁট চেপে ধরল। বহুক্ষণ চলল আলাপ।

ঘন্টাখানেক পরে সে বেরিয়ে এল। তখনো ভাবগম্ভীর, কিন্তু মুখে হাসি। বহু নিদ্রাহীন রাতের পরে সে শান্তিতে এই প্রথম ঘুমোল। কাকী তাঁর ঘরে চলে এলেন। চোখ তাঁর লাল। পিতর ইভানীচ বহুক্ষণ ধরে নাক ডাকাচ্ছেন।